অতিপ্রাকৃত কাহিনি

প্রেতাত্মার ছায়া

আফজাল হোসেন

সেবা প্রকাশনী

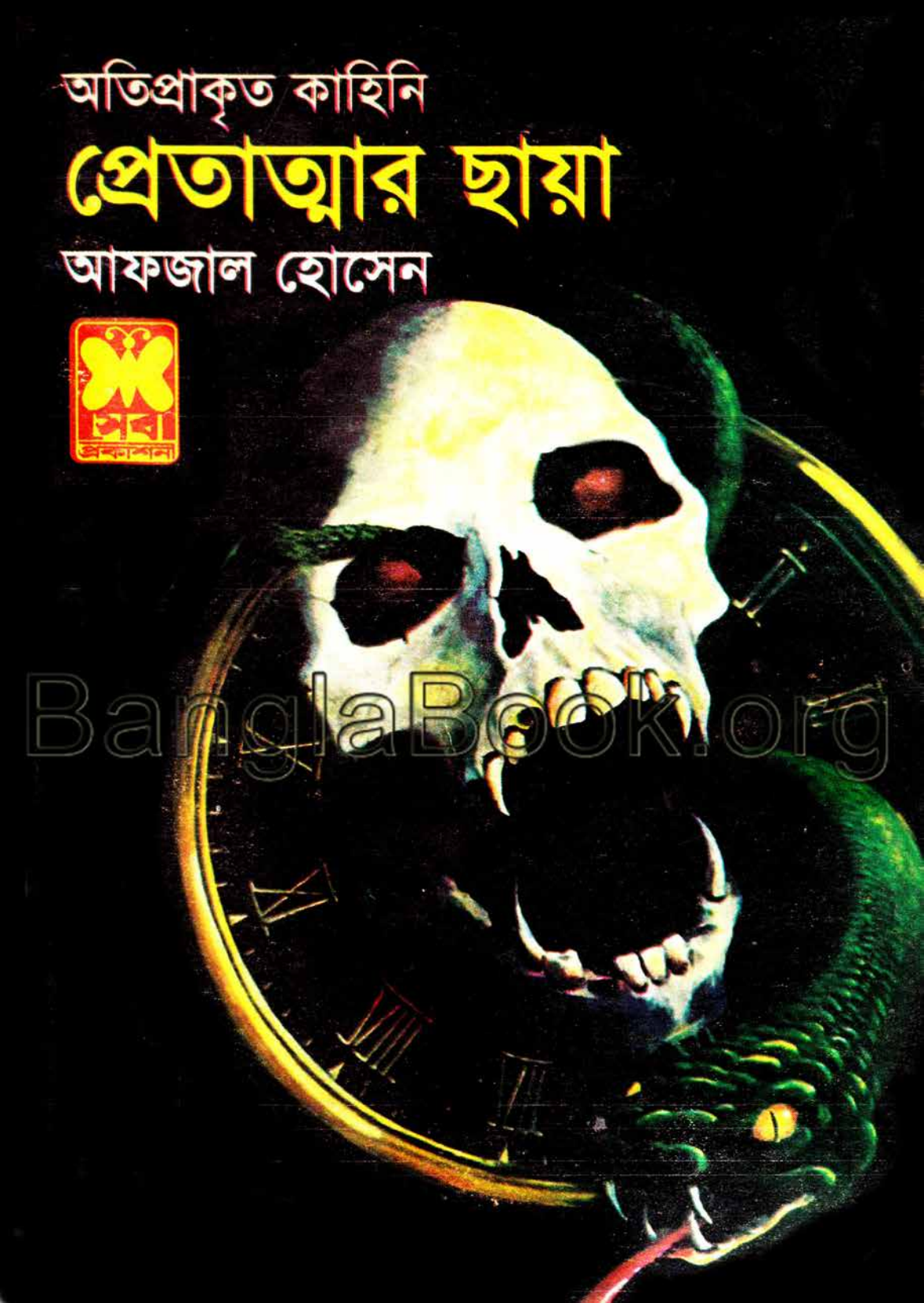

BanglaBook.org

অতিপ্রাকৃত কাহিনি

প্রেতাত্মার ছায়া

আফজাল হোসেন

এ সময়ের 'রহস্যপত্রিকা'র সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক আফজাল হোসেনের ২০১২ অমর একুশে বই মেলায় প্রকাশিত অতিপ্রাকৃত কাহিনি 'অপার্থিব প্রেয়সী' সঙ্কলনটির ব্যাপক সাফল্যের পর সেই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হলো 'প্রেতাত্মার ছায়া।'

এই সঙ্কলনের প্রতিটি কাহিনি বেড়ে উঠেছে আমাদের আশপাশের চেনা-জানা পরিবেশকে ঘিরে, কিন্তু গল্পগুলো অদেখা ভুবনের—যে ভুবন গা শিরশির করা ভয়, অচেনা রোমাঞ্চ আর অলৌকিকতায় ভরপুর।

নিখাদ মৌলিক, নতুন স্বাদের এই অতিপ্রাকৃত গল্পগুলোর জগতে সববয়সী রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে আমন্ত্রণ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

PRETATMAR CHHAYA
A Collection of Supernatural stories
By:Afzal Husain

সেবা প্রকাশনী

নিরানব্বই টাকা

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেন

এই মহান মানুষটির দেখা পাবার সৌভাগ্য এখন পর্যন্ত আমার হয়নি। তবে একদিন স্বপ্নে আমি তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। স্বপ্নটা এমন ছিল—সুবিশাল এক দিঘিতে বড়শি ফেলে, ফাতনার দিকে তাকিয়ে, দিঘির পাড়ের দূর্বা ঘাসের উপর বসে আছি। মাথার উপর আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। দিঘির জলে সেই আকাশের প্রতিচ্ছায়া। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু কানের পাশে দমকা বাতাসের ফিসফিসানি।

হঠাৎ বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ক্রমশ বৃষ্টি বাড়তে লাগল। ফাতনা থেকে চোখ তুলে আমার থেকে সামান্য দূরে তাকিয়ে দেখি—বয়স্ক একজন লোক বসে আছেন, আমারই মত বড়শি ফেলে বড়শির ফাতনার দিকে তাকিয়ে। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা তাঁর। গায়ে সাদা ফতুয়া। অদূরে ইট বিছানো রাস্তার উপরে দাঁড়ানো জলপাই রঙের টয়োটা করোলা দেখে বুঝতে পারলাম গাড়িটি তাঁর অপেক্ষায়। আমি ঝড়-বৃষ্টির শব্দকে হার মানিয়ে গলা চড়িয়ে তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম, 'বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন? আপনি বয়স্ক মানুষ, অসুখ করবে যে!'

তিনি নির্বিকার। আমি বা 'বৃষ্টি' কাউকেই পাত্তা দিচ্ছেন না। আমি চেঁচিয়ে আবার তাড়া দিলাম...এবারে তিনি ফাতনার দিকে তাকানো অবস্থায়ই ভুরু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিচ্ছু হবে না আমার। আমি হচ্ছি চিরযুবা মাসুদ রানা।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচি

ভূজঙ্গ বিভীষিকা	৫
গুডরোবোঙ্গা	৩৬
লাশের সঙ্গে বাস	৬৯
মৃত্যুছবি	৮৬
কালু ফকির	৯৪
অতিমানব	১০৫
হ্রিলা	১২৯
অশুভ এক রাতে	১৩৯
তিথি	১৪৯
অসমাপ্ত রহস্য	১৫৪
ভয়ানক সমাপ্তি	১৬৯
দ্বৈত	১৮৫
কবরস্থানের পাহারাদার	২১৯
স্বপ্নপুরুষ	২২৫
অমীমাংসিত	২৩৬
বাসর	২৪২
বৃক্ষ মানব	২৭৪
প্রেতাত্মার ছায়া	২৮১
নীল নির্জন	২৯২

ভুজঙ্গ বিভীষিকা

এক

অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। মেঘ মুক্ত আকাশে জোনাকির মত হাজার তারার মেলা।

সজীব আর তুলি অন্ধকার ছাদে পাশাপাশি বসে আছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। লোডশেডিং। ঘরের ভিতরে খুব গরম লাগছিল তাই তারা ছাদে উঠে এসেছে। ছাদে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে।

সজীব তুলির হাত দুটো তার কোলের মাঝে তুলে নিয়েছে। মখমলের মত কোমল আর নরম তুলতুলে হাত। লম্বা-লম্বা পেলব আঙুল। কিছুটা উষ্ণতা। সব মিলিয়ে অন্য রকমের এক অনুভূতি।

হাত ধরে বসে থাকার মাঝেও যে এত আবেশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কখনও ভাবেনি সজীব। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তুলির হাতের স্পর্শ, বাতাসে মেয়েলি মিষ্টি গন্ধ, গহনার রিনিঝিনি, নতুন শাড়ির মৃদু খসখস...সব কিছু প্রতি মুহূর্তে সজীবকে বিভোর করে দিচ্ছে।

মাত্র তিন দিন আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। প্রেমের বিয়ে নয়, রীতিমত দেখে-শুনে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। তিন দিন আগেও তারা একে অপরকে চিনত না, জানত না। কী অদ্ভুত! আজ তারা কত কাছে! কত আপন একে অপরের!

সজীবের খুব ইচ্ছে করছে বিয়ের আগে তুলি কী করত না করত, তা জানতে। তুলির ভাললাগা, খারাপলাগা সবকিছু জানতে। বিয়ের আগে সে কি কারও সাথে প্রেম করত? এমন রূপবতী মেয়ে যে অনেক ছেলেরই নজর কেড়েছে সেটা তো স্বাভাবিক। আর আজকালকার মেয়েরাও তো প্রেম করার জন্য পেখম মেলে বসে থাকে। তাই বলে নতুন বউকে কী করে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে, তুমি বিয়ের আগে কারও সাথে প্রেম করেছ কিনা?

BanglaBook.org

অবশ্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্যভাবে জিজ্ঞেস করা যায়।

'আচ্ছা, তুলি, তুমি কোন্ কলেজে পড়া-শুনা করেছ?'

তুলি খুব কম কথা বলে। গোনা-গোনা দু-একটা। কিছু জিজ্ঞেস করলে নিচু স্বরে জবাব দেয়। হয়তো নববধূ বলে লজ্জায়। এমনিতেও বোধহয় বেশ লাজুক ধরনের মেয়ে।

তুলি সংকুচিত ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল, 'বেগম রোকেয়া গার্লস কলেজে।'

'কলেজে তোমার কোনও বান্ধবী ছিল না? বিয়ের সময় তোমার কোনও বান্ধবীকে দেখলাম না?'

'না, আমার কোনও বান্ধবী নেই।'

'তা হলে কলেজে কি তুমি একা-একাই যাওয়া-আসা করতে?'

'না, আমার মা সব সময় আমার সঙ্গে থাকত।'

'তোমার মা সব সময়ই তোমার সঙ্গে থাকতেন?'

'হুঁ।'

'শুধু কলেজে যাওয়া নয়, ধরো কোচিং সেন্টারে যাওয়া, টুকিটাকি কেনাকাটা করতে যাওয়া বা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কি তোমার মা তোমার সঙ্গে থাকতেন?'

'হুঁ, সব সময়। মা আমাকে কখনও একা ছাড়ত না।'

'এমনটা তোমার মা কেন করতেন? তিনি কি তোমাকে নিয়ে কোনও ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন?'

'মা আমাকে খুব ভালবাসে। ভালবাসার টানে।'

'তাই বলে মেয়ের স্বাধীনতায় এমনভাবে হস্তক্ষেপ?'

'অল্প বয়সে বিধবা হওয়া আমার মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান। আমি ছাড়া মায়ের আপন বলতে আর কেউ নেই। আমাকে অবলম্বন করেই মায়ের বেঁচে থাকা। তাই মা আমাকে কখনও চোখের আড়াল হতে দিতে চাইত না। সব সময় সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। কিছুক্ষণের জন্যেও আমি চোখের আড়াল হলে মা অস্থির হয়ে উঠত।'

'এখন তোমার মায়ের কষ্ট হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।'

BanglaBook.org

'তা হলে তোমাকে বিয়ে দিলেন কেন?'

'বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না বলে।'

সজীবের মনের ভিতর সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে সন্দিহান গলায় বলল, 'কী এমন কারণ যে তিনি তোমাকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন?'

সজীবের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তুলি পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল। সজীবের কোলের মাঝের তার হাত দুটো সজীবের হাত সজোরে চেপে ধরে ফিসফিস করে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'চলো আমরা ঘরে ফিরে যাই।'

সজীব অবাক হওয়া গলায় বলল, 'হঠাৎ কী হলো তোমার! তুমি কি কোনও কারণে ভয় পাচ্ছ? তোমার হাত-টাত দেখি কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

তুলি ফিসফিস করে কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমার খুব ভয় লাগছে। চলো ছাদ থেকে নেমে আমরা ঘরে যাই।'

সজীব আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে তুলিকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে, জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার এত কাছে থাকতেও তুমি ভয় পাচ্ছ?'

তুলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আকস্মিক তুলির এমন আচরণে সজীব কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল। হতভম্ব ভাবটা সামলে উৎকণ্ঠার সাথে বলল, 'তুমি এমন করছ কেন? কী হলো তোমার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

তুলি কিছু না বলে ফুঁপিয়েই যাচ্ছে।

সজীব নরম গলায় বলল, 'তোমার মায়ের কথা মনে পড়েছে?'

তুলি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'না।'

তা হলে?! সজীবের মনে আবার সন্দেহ হানা দিল। তুলি কি তার প্রেমিকের কথা মনে করে কাঁদছে?

সজীব ইতস্তত গলায় বলল, 'তোমার কি কারও সাথে প্রেম-ট্রেম ছিল নাকি?'

ফোঁপানো বন্ধ করে তুলি দৃঢ় গলায় বলল, 'না, আমি ওকে ঘৃণা করি।'

'তুমি কাকে ঘৃণা করো?!'

আরও জোরে-শোরে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে তুলি এলোমেলো কিছু কথা

BanglaBook.org

বলল, 'আমি জানি তুমি বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করো আমার কোনও দোষ নেই। ওটা কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ছে না। ওটার হাত থেকে মুক্তির জন্যই মা আমাকে এত জলদি বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওটা আমাকে রেহাই দেয়নি।' গলার স্বর নিচু করে, 'চলো আমরা ঘরে চলে যাই। ওটা আমাদের দেখছে। কেমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।'

সজীব ব্যাকুল হয়ে বলল, 'আমি কী বিশ্বাস করব না? কে তোমার পিছু ছাড়ছে না? কে আমাদের দেখছে? আবোল-তাবোল এসব কী বলছ?!'

সজীবের প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে গুনগুন করে কাঁদতে লাগল তুলি।

দুই

সজীব একটা নামকরা বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার। নয়টা-পাঁচটা অফিস। কাগজে-কলমে নয়টা-পাঁচটা হলেও প্রায়ই অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতে রাত সাড়ে নয়টা-দশটা বেজে যায়।

মাসের শেষ দিক বলে অফিসে খুব কাজের চাপ যাচ্ছে। রাত তিনটা। সারাদিনের ক্লান্ত সজীব গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমের ঘোরে বিছানার বাম পাশে তার হাত যেতেই, চমকে উঠে ঘুম ভেঙে গেল। কারণ বিছানার বাম পাশটা খালি। বিছানার বাম পাশে তার স্ত্রী তুলির থাকার কথা ছিল।

অন্ধকারে বিছানার বাম পাশটা হাতড়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো সজীব–তুলি বিছানায় নেই। মাঝে-মাঝে তুলি এভাবে রুমের আলো না জ্বেলে রুমের সাথে লাগোয়া টয়লেটে যায়। আলো জ্বাললে সজীবের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে।

বিয়ের পর তিনটা মাস কেটে গেল। যতই দিন যাচ্ছে তুলির প্রতি সজীবের আকর্ষণ আরও বাড়ছে। সত্যি কথা বলতে কী, সে তুলির প্রেমে পড়েছে। সবাই প্রেমে পড়ে বিয়ের আগে, সে প্রেমে পড়েছে বিয়ের পরে নিজের স্ত্রীর। আজকাল তার খুব ইচ্ছে করে অফিস-টফিস বাদ দিয়ে

BanglaBook.org

সারাক্ষণ তুলির আশপাশে ঘুরঘুর করতে, তুলির হাত ধরে বসে থাকতে, তুলির রেশমি-কোমল চুলের গন্ধ নিতে,... বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। এমন কথা লোকে জানলে তাকে 'বউ পাগল' পুরুষ ভাববে। অফিসে শত ব্যস্ততার মাঝেও সারাক্ষণ মনের ভিতরে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে তুলির মিষ্টি মুখটা। একটু সময়-সুযোগ পেলেই তুলির কাছে ফোন করে। ফোনে তুলির গলার স্বর আরও ভাল লাগে। এমন কী ঘুমের মধ্যেও তার সমস্ত চেতনা জুড়ে থাকে তুলি। এই যেমন এখন ঘুমের মাঝেও বিছানায় তার পাশে তুলির অস্তিত্ব টের না পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

আশ্চর্য! তুলি কোথায় গেল? টয়লেটে গেলে তো এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। টয়লেটে কেউ রয়েছে এমন তো কোনও শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

সজীব বিছানা থেকে উঠে লাল রঙের ডিম লাইট জ্বালল। ঘুম থেকে উঠে বেশি পাওয়ারের লাইট জ্বাললে চোখ কড়কড় করে। টয়লেটের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল—না, টয়লেটে তুলি নেই। রুমের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ। তুলি যে রুমের বাইরে গেছে এমনটাও না। তা হলে রুমের সাথে লাগোয়া বারান্দায়? বারান্দায় এসে দেখল, বারান্দায়ও তুলি নেই। তা হলে গেল কোথায়? সজীব রুমের ভিতরে ঢুকে, গলা উঁচিয়ে, 'তুলি...তুলি...কোথায় তুমি?...' বলে কয়েকবার ডাকল।

খাটের নীচ থেকে তুলির ফিসফিসে কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল, 'এই যে আমি এখানে।'

সজীব সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে খাটের নীচে উঁকি দিল। খাটের নীচে তুলিকে সজীব যে অবস্থায় দেখতে পেল তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। খাটের নীচে তুলি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার ঘন কালো চুলগুলো মুখের উপরে ছড়িয়ে রয়েছে।

সজীব বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে কোনওক্রমে বলল, 'তুমি ওখানে কী করছ?!'

তুলি মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা চুলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চোখ তুলে সজীবের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বড়-বড় ভয়ার্ত চোখ। চোখে পলক না ফেলে ফিসফিস করে টেনে-টেনে বলল, 'ওটা আমাকে দেখছিল, তাই লুকিয়েছি।'

BanglaBook.org

'কে তোমাকে দেখছিল?!'

আঙুল তুলে বারান্দার দিকে দেখিয়ে তুলি বলল, 'ওই যে, ওটা এখন ওখানে।'

সজীব ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। কেউ নেই সেখানে।

কিছুটা চটে যাওয়া গলায় সজীব বলল, 'কই ওখানে তো কেউ নেই।'

'তুমি দেখতে পাচ্ছ না। সবার চোখে ওটা ধরা দেয় না।'

'ওটা কী? কে সে?'

তুলির কোনও জবাব নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সজীব বলল, 'ঠিক আছে, এখন তুমি খাটের নীচ থেকে বের হয়ে এসো। আমি আছি, কোনও ভয় নেই তোমার।'

হামাগুড়ি দিয়ে তুলি খাটের নীচ থেকে বের হতে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে সজীব কিছুটা শিউরে উঠল। লাল ডিম লাইটের আলোতে উলঙ্গ তুলিকে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায় কেমন অন্য রকম লাগছে।

তুলি খাটের নীচ থেকে বের হয়ে বিছানার উপরে বসল। জড়সড় ভঙ্গিতে। তবে তার উলঙ্গ অবস্থার জন্য তাকে মোটেও লজ্জিত মনে হচ্ছে না।

সজীব বিরক্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করতে লাগল, 'হঠাৎ হঠাৎ তুমি কী দেখে এত ভয় পাও? কাকে দেখে? কীসের ভয়ে তুমি এমন উদ্ভট আচরণ করো?'

তুলি প্রশ্নগুলোর কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নুইয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল।

সজীব আবার প্রশ্ন করতে লাগল, 'বলছ না কেন, তুমি কী দেখতে পাও? কাকে দেখতে পাও? কাকে?' গলার স্বর নরম করে, 'এভাবে চুপ মেরে থাকলে আমি জানব কী করে? আমি না তোমার স্বামী, তোমার সম্পর্কে সব কিছু জানার অধিকার কি আমার নেই?'

কোনও জবাব নেই। তুলি আগের মতই মাথা নুইয়ে বসে রইল।

সজীব আবার অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তুমি উলঙ্গ হয়েছ কেন?' প্রশ্নটা করতে-করতে আশপাশে চোখ বোলাতে লাগল তুলির শরীর ঢেকে দেবার মত একটা কাপড়ের সন্ধানে।

BanglaBook.org

তুলি মাথা নোয়ানো অবস্থায়ই কৈফিয়তের মত করে বলল, 'আমি নিজে ইচ্ছে করে উলঙ্গ হইনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, ওটা আমার গায়ের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'

সজীব প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সেই "ওটা" কে সেটাই তো জানতে চাচ্ছি।'

তুলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সজীব বিছানার পাশ থেকে, তুলির গা থেকে খুলে রাখা আলুথালু হয়ে পড়ে থাকা সুতির শাড়িটা তুলে এনে, তুলির গায়ে জড়িয়ে দিতে-দিতে সান্ত্বনামাখা বিভিন্ন কথা বলতে লাগল।

শাড়িটা পুরোপুরি গায়ে জড়ানোর পর সজীব গভীর মমতায় তুলিকে জড়িয়ে ধরে চমকে উঠল। তুলির গা ভীষণ গরম!

সজীব উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'তোমার গা তো দেখছি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! আর সেই তুমি এতক্ষণ ধরে কাপড়-চোপড় খুলে বসেছিলে!'

তুলি চোখ মুছতে-মুছতে অভিমানী গলায় বলল, 'আমি মরে গেলেই ভাল হয়।'

সজীব তুলির ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে ধরে আবেগ জর্জরিত গলায় বলল, 'এমন কথা আর কখনও বলবে না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি! খুউব! খুউব বেশি ভালবাসি! এর চেয়ে বেশি ভালবাসা হয় না!'

সারা রাত ধরে সজীব তুলির শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকে। কপালে জলপট্টি দেয়। মাথায় পানি দিতে-দিতে চুলের ভিতরে বিলি কেটে দেয়। ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে দেয়। এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে, ঘরে থাকা একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়।

কপালে, মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে শেষ রাতের দিকে তুলি ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সাথে ঘাম দিয়ে জ্বরও ছেড়ে যায়। সজীবের চোখও লেগে আসে। তুলির পাশে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে, একটা হাত তুলির গায়ে তুলে দিয়ে।

ঘুমানোর কিছুক্ষণ পর থেকেই বিশ্রী-বিশ্রী স্বপ্ন দেখতে থাকে সজীব। স্বপ্নে দেখে—কুচকুচে কালো রঙের অজগরের চেয়েও বিশাল একটা সাপ

BanglaBook.org

তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। সে যেন সাপটার বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সাপটা তাকে পেঁচিয়ে ধরে টানতে-টানতে জলাশয়ের দিকে নেমে যাচ্ছে। পানিতে নামার পর দেখা গেল, সাপটা রূপ বদলে বিশাল এক কুমিরে পরিণত হয়েছে। কুমিরটা তাকে খেয়ে ফেলতে চাইছে...

তিন

সজীবদের বাড়িওয়ালা নিয়ামত চাচা খুবই সহজ-সরল নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের উপরে। বিপত্নীক। দুই ছেলে। ছেলেরা সুইটজারল্যাণ্ড থাকে। তারা সেখানেই সেটেল্ড।

দোতলা বাড়ির দোতলায় থাকে সজীবরা আর নীচতলায় থাকেন নিয়ামত চাচা নিজে। নিয়ামত চাচার দেখা-শুনার জন্য চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সী একটা কাজের ছেলে আছে। ছেলেটার নাম শুক্কুর। শুক্রবারে জন্মেছে বলে তার বাপ-মা তার নাম রেখেছে শুক্কুর।

নিয়ামত চাচার ঘরের বাজার-সদাই করা, ওষুধ-পত্র আনা, রান্না-বান্না, কাপড়-চোপড় ধোয়া, ঘর মোছা...অর্থাৎ ঘরের যাবতীয় কাজ শুক্কুর করে। মাঝে-মাঝে সজীবদেরও কিছু-কিছু ফুট-ফরমাশ পালন করে যেমন মাঝে-মাঝে সজীবের সিগারেট ফুরিয়ে গেলে শুক্কুরকে দিয়ে সিগারেট আনায়। তুলিও মাঝে-মাঝে সজীব বাড়িতে না থাকা অবস্থায় চায়ের পাতা, চিনি, লবণ, গরম মশল্লা, সাবান...বা এই জাতীয় তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনায়। শুক্কুর হাসি মুখে এইসব কাজ করে দেয়। শুক্কুরের মনে মনে ধারণা—তুলি ভাবীজান আসলে মানুষ নয়। পরীস্থানের কোনও পরী। কোনও একদিন দেখা যাবে ফরফর করে আকাশে উড়ছে। মাঝে-মাঝে সেই তুলি ভাবীজানের কিছু ফুট-ফরমাশ পালন করতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করে।

সজীব এবং তুলি উভয়ের কাছেই নিয়ামত চাচা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন

BanglaBook.org

লোক। তারা তাদের মনে নিয়ামত চাচাকে বাবার আসনে বসিয়েছে। তুলির বাবা তার শিশুকালেই মারা গেছে। বাবার স্মৃতি বলে তার কাছে কিছুই নেই। সে বাবার আদর বঞ্চিত একটা মেয়ে। তাই নিয়ামত চাচার 'মা' বলে ডাক, আদর মাখা নানা ধরনের কথা, বিভিন্ন উপদেশ তার খুব ভাল লাগে। বাবার কথা মনে পড়ে যায়। চোখ ভিজে ওঠে।

ওদিকে সজীবেরও পরিণত বয়সেই মারা যাওয়া তার বাবার কথা মনে পড়ে নিয়ামত চাচাকে দেখলে। সে তার বাবার চেহারার সাথে কোথায় যেন নিয়ামত চাচার চেহারার মিল খুঁজে পায়। এ ছাড়া সজীবের বিয়েটাও নিয়ামত চাচাই বাবার দায়িত্ব নিয়ে করিয়েছেন।

সজীবের মা থাকেন গ্রামে তাঁর বড় ভাইয়ের সাথে। সজীবের মা চাইছিলেন তাঁর বোনের মেয়েকে সজীবের বউ করে আনতে। গ্রাম্য, আনস্মার্ট, অশিক্ষিত একটা মেয়ে। সেই বিয়েতে সজীব রাজি হয় না। মাকে না জানিয়েই হুট করে সে তুলিকে বিয়ে করে ফেলে। এই কারণে মা তার উপর খুব খেপে আছেন। তিনি এখন আর সজীবের সঙ্গে কথা বলেন না। বিয়ের পরে তুলিকে নিয়ে গ্রামে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তার মা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেন।

সজীব আর তুলির বিয়ের ঘটকালিটা মূলত নিয়ামত চাচা করেছেন। বিয়ে করার অনেক আগে থেকেই সজীব নিয়ামত চাচার বাড়িতে ভাড়া আছে। তখন থেকেই তিনি সজীবকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করেন। কার কাছ থেকে যেন নিয়ামত চাচা একদিন খবর পান, বিধবা এক মহিলার খুবই রূপবতী একটা মেয়ে আছে। মহিলা মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইছেন। নিয়ামত চাচা খোঁজ-খবর শুরু করেন। মেয়ে দেখতে যান। তুলিকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়। পরীর মত একটা মেয়ে! একদিন সজীবকে সাথে নিয়ে গিয়ে তুলিকে দেখান। সজীবের তো তুলির রূপের ঝলক দেখে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এভাবেই নিয়ামত চাচা গার্ডিয়ানের দায়িত্ব নিয়ে শেষ পর্যন্ত সজীবকে বিয়ে করান।

নিয়ামত চাচার দুই ছেলেই সুইস মেয়ে বিয়ে করেছে। তাঁর কত ইচ্ছে ছিল নিজে পছন্দ করে মেয়ে দেখে ছেলেদের বিয়ে করাবেন। সেই ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। তাই তিনি সজীবকে বিয়ে করিয়ে কিছুটা হলেও দুধের

BanglaBook.org

স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছেন। সজীবের মায়ের অনুমতি না নিয়ে সজীবকে বিয়ে করানোয় মাঝে-মাঝে তাঁর মনে খুব অপরাধ বোধ জাগে। পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মত অধিকার নিয়ে বিয়ে করানোটা বোধহয় তাঁর ঠিক হয়নি। পরের ছেলের প্রতি এত অধিকার তাঁর নেই।

অপরাধ বোধ থেকে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—তিনি তাঁর এই বাড়িটা সজীবকে লিখে দেবেন। শুধু যে অপরাধ বোধ থেকেই এই সিদ্ধান্ত তা নয়। তাঁর ছেলেরা সুইটজারল্যাণ্ডের ইমিগ্র্যাণ্ট। কখনও যে তারা দেশে ফিরে আসবে তেমন কোনও আশা নেই। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যাবে সরকারি চাকরি করে তিলে-তিলে পয়সা জমিয়ে বানানো তাঁর এই এত শখের বাড়িটা পরিত্যক্ত ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে, নয়তো বা কোন বদ লোক জবর দখল করে নেবে, নয়তো বা তাঁর ছেলেরা বিদেশে বসেই কোনও ডেভেলপারের কাছে বিক্রি করে দেবে। ডেভেলপাররা তাঁর এত শখের বাড়িটা ভেঙে-গুঁড়িয়ে বহুতল ভবন বানাবে। না, ওসব হতে দেওয়া যাবে না। বাড়িটা এমন কারও হাতে দিয়ে যাবেন, যে বাড়িটা রক্ষা করবে। তিনি থাকবেন না কিন্তু তাঁর বানানো বাড়িটা বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সব দিক বিবেচনা করে এই বাড়ির একমাত্র যোগ্য অধিকারী সজীব। অনেক দিন ধরে তিনি ছেলেটাকে দেখে আসছেন। তিনি লোক চিনতে ভুল করেননি।

সজীব প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়ার সময় তৈরি হয়ে নীচতলায় তাঁর কাছে আসে। তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করে। তাঁর কোনও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কিনা জিজ্ঞেস করে। কোনও ওষুধপত্র আনতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করে। 'না, বাবা, কিছু লাগবে না,' বললেও অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটা এটা-ওটা কিছু একটা নিয়েই আসে। তিনি একদিন মাত্র কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ফল খেতে তিনি পছন্দ করেন। এরপর থেকে হয় আপেল, না হয় কমলা, না হয় আঙুর, না হয় বেদানা...কিছু একটা নিয়েই আসবে।

তুলিও ভাল-মন্দ কিছু রান্না করলে তাঁর জন্য নিয়ে আসে। বেশি করে আনে যাতে তাঁর খাওয়ার পরে শুক্কুরও খেতে পারে। সামান্য কলার মোচার

BanglaBook.org

ভাজিও তাঁকে রেখে খায় না। বলতে গেলে প্রতি দিনই কিছু না কিছু দোতলা থেকে নীচতলায় আসছে।

সজীব এবং তুলির ব্যবহারে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। এমনও না তারা এসব করছে তিনি বাড়ি লিখে দেবেন, এ কথা জেনে বাড়ির লোভে। বাড়িটা যে তিনি সজীবকে লিখে দেবেন এ পরিকল্পনা তিনি মনে-মনেই রেখেছেন। এখন পর্যন্ত কাউকে জানাননি।

প্রতি দিনকার মত অফিসে যাবার আগে সজীব এসেছে নিয়ামত চাচার কাছে।

নিয়ামত চাচা সজীবকে দেখেই ব্যাকুল গলায় বললেন, 'একী, বাবা, তোমার মুখ অমন শুকনো-শুকনো লাগছে কেন? চোখ দুটোও সামান্য লাল। রাতে ভাল ঘুম হয়নি? শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

সজীব ক্লান্ত গলায় বলল, 'চাচা, আমি ভালই আছি। কাল রাতে হঠাৎ তুলির গায়ে খুব জ্বর উঠেছিল। তাই রাতে ঠিক মত ঘুমাতে পারিনি।'

'আমাদের ডাকলে না কেন তখন?'

'আপনি বয়স্ক মানুষ, আপনার ঘুম নষ্ট করতে চাইনি।'

'এখন কী অবস্থা?'

'না, এখন সুস্থ। শেষ রাতের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। ওভাবে হঠাৎ করে কেন যে জ্বর উঠেছিল বুঝতে পারছি না।'

'ভর দুপুরে রোদের মধ্যে বসে থাকলে জ্বর তো উঠবেই।'

'বুঝলাম না, চাচা, ভর দুপুরে রোদের মধ্যে বসে থাকে মানে?'

'তুমি কিছু জানো না?'

'চাচা, খুলে বলুন তো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কয়েক দিন ধরেই তোমাকে বলব-বলব করেও বলা হয়ে ওঠেনি। তার আগে বলো তো তুমি কি কখনও তুলিকে নিয়ে আমাদের বাড়ির পাশের ওই ফিশারী অফিসের ভিতরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, এক দিন বিকেলে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফিশারী অফিসের ভিতরটা তো কত সুন্দর! কতখানি জায়গা জুড়ে। নিরিবিলি। পাঁচটা পুকুর। পুকুর পাড়ে ফাঁকা-ফাঁকা করে লাগানো বড়-বড় নারিকেল গাছ। দূর্বা ঘাস।

BanglaBook.org

ঝিরঝিরে বাতাস। আমার খুব ভাল লাগে! তাই ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'বিকেলে বেড়াতে যাওয়া ভিন্ন কথা, তাই বলে ভর দুপুরবেলা! কিছু দিন ধরে আমি লক্ষ করছি, তুলি প্রায় দিনই ভর দুপুরবেলা ফিশারী অফিসের খোলা মাঠের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তো আমি বুঝতেও পারিনি সে কোথায় যাচ্ছে। যাবার সময় পিছন থেকে ডাকলেও কোনও সাড়া দেয় না। কোনও ভ্রূক্ষেপই করে না। কেমন ঘোরলাগা মানুষের মত চলে যায়। দু-তিন দিন এমনটা ঘটার পরে, আমি পিছন-পিছন শুক্কুরকে যেতে বলি। শুক্কুর পিছু নিয়ে দেখতে পায় সে সোজা ফিশারী অফিসের ভিতরে ঢুকে, উত্তর দিকের পাশাপাশি পুকুর দুটোর পাড় ধরে হেঁটে-হেঁটে হ্যাচারি ঘরের পাশ ঘেঁষে পশ্চিম দিকের বড় পুকুরটার পাড় ধরে হাঁটতে-হাঁটতে দক্ষিণ প্রান্তের খোলা জায়গাটা যেখানে শীতের সময় বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো চাষ করা হয়, সেখানটায় গিয়ে বসে থাকে। শুক্কুর তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "ভাবীজান, রৌদের মইধ্যে বইয়া রইছেন ক্যান?" শুক্কুরকে দেখে শুক্কুরের দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন সে শুক্কুরকে চেনেই না। চাহনির মধ্যে কিছু একটা ছিল, শুক্কুর তার চাহনির ধরন দেখে ভয় পায়। ভয় পেয়ে শুক্কুর আর কোনও কিছু না বলে চলে আসে। এখন পোনা উৎপাদনের সিজন না বলে ফিশারী অফিস বলতে গেলে একেবারে জনশূন্য। নিরিবিলি জায়গা, কোনও দুষ্ট লোকের নজরে পড়ে আবার কোনও অঘটন না ঘটে। তুমি ওকে বারণ করে দিয়ো।'

সঞ্জীব শংকিত গলায় বলল, 'এত বড় একটা ব্যাপার, আপনি আমাকে আগে কেন জানাননি?'

'তুমি এতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। ও কিছু না। আমার মনে হয় তুলির মাথায় সামান্য ছিট আছে। বেশি রূপবতী মেয়েদের অনেকের মাথায়ই কিছুটা ছিট থাকে।'

'আমারও মনে হয় ওর কিছু মানসিক সমস্যা আছে। মাঝে-মাঝে কেমন উদ্ভট আচরণ করে। ভয়ে কুঁকড়ে যায়। উল্টা-পাল্টা আবোল-তাবোল কথা বলে।'

'অত ভেবো না তো। তোমাদের একটা ছেলে-মেয়ে হোক দেখবে সব

BanglaBook.org

ঠিক হয়ে যাবে। এখন অফিসে যাও। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সজীব চিন্তিত মুখে অফিসের দিকে রওনা দিল।

চার

সন্ধ্যা সাতটা।

সজীব অফিস থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফাইল-পত্রগুলো গোছগাছ করে রাখছে। এমন সময় পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখে–ডিসপ্লেতে ভাসছে ইংরেজি অক্ষরে নিয়ামত চাচা। ফোনটা রিসিভ করল–

'হ্যালো, চাচা, বলুন।'

ওপাশ থেকে নিয়ামত চাচার ভারাক্রান্ত গলার স্বর, 'বাবা, তোমার অফিস ছুটি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এই তো এখনই আমি অফিস থেকে বের হব। আপনার গলার স্বর এমন লাগছে কেন?'

'অফিস থেকে বের হয়ে সরাসরি বাড়িতে এসে পড়ো। বাড়িতে একটা ঝামেলা হয়েছে।'

সজীব উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'ফোনে এত কিছু বলা যাবে না। তুমি জলদি বাড়িতে চলে এসো। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

সজীব দুরু-দুরু বুকে একটা অটোরিকশা নিয়ে বাড়ির সামনে এসে নামল। বাড়ির সামনে নেমেই তার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। বাড়ির সামনে পুলিশের একটা পিকআপ দাঁড়ানো। বাড়ির ভিতরে পুলিশ আর অনেক লোকজন। লোকজনগুলো নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় শলাপরামর্শ করছে।

লোকজন ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকে সজীব দেখতে পায় নীচতলার খোলা বারান্দায় চাদর মুড়ি দেয়া একটা লাশ শোয়ানো। সেই লাশ ঘিরেই

BanglaBook.org

লোকজনের ভিড়। লাশের পাশে বসে তুলির মা বিলাপ করতে-করতে কাঁদছেন। একটু দূরে শুক্কুর হাউমাউ করে কাঁদছে। বারান্দার অন্য পাশে চেয়ারে নিয়ামত চাচা, পুলিশের ওসি আরও বেশ কয়েকজন বয়স্ক লোক বসে আছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সজীবকে এগুতে দেখে আলোচনা থামিয়ে সবাই সজীবের দিকে চোখ তুলে তাকান।

সজীবকে দেখতে পেয়ে শুক্কুর চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'ভাইজান, ভাবীজান আর নাই, আমাগো তুলি ভাবীজান আর নাই...ভাবীজান মইরা গেছে...ভাবীজান আর কোনও দিন কতা কইবে না...'

সজীবকে দেখতে পেয়ে তুলির মাও ভেজা চোখ তুলে সজীবের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে- কাঁদতে বলতে লাগল, 'সজীব, বাবা, তুমি এতক্ষণে এসেছ, এদিকে তো সব শেষ!!! আমার বুকের ধন আর নেই! আমার সোনা ময়নাটারে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, তুমি কেন ওকে সব সময় চোখে-চোখে রাখলে না?!'

লাশের মাথার কাছে বসে থাকা পুলিশের এক কনস্টেবল লাশের মুখের উপর থেকে চাদরটা সরাল সজীবকে দেখানোর জন্য। এলোমেলো এক রাশ চুলের মাঝে তুলির নিথর মুখটা পড়ে আছে। মুখখানা কেমন নীল হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটোও কালচে রং ধারণ করেছে।

সজীবের কানের দু-পাশ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সে যেন অতল গহীনে তলিয়ে যাচ্ছে। তার বোধ শক্তি যেন ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। সে কি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে? নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন! এটা সত্যি হতে পারে না! যে মানুষটার কপালে আজ সকালেও সে চুমু খেয়ে অফিসে গিয়েছে, সে ওভাবে মরে পড়ে থাকতে পারে না!!!

নিয়ামত চাচা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সজীবকে জড়িয়ে ধরলেন। অমনি সজীব হাউমাউ করে বাচ্চাদের মত কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, 'এমনটা কী করে হলো, চাচা? কী করে??? আজ সকালেও তো ওকে দিব্যি সুস্থ দেখে গিয়েছি!'

নিয়ামত চাচা সজীবের পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'সব

BanglaBook.org

বলছি, বাবা, তার আগে তুমি নিজেকে একটু সামলে নাও।'

প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়ামত চাচা মাগরিবের নামাজ পড়ে ওঠার পর-পরই তুলি তাঁর জন্যে চা নিয়ে আসে। আজও তিনি নামাজ শেষে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তুলি আসছে না দেখে এক পর্যায়ে শুক্কুরকে তুলির খোঁজে দোতলায় পাঠান। শুক্কুর দোতলায় তুলির খোঁজ নিয়ে এসে জানায়, তুলি ঘরে নেই। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই ভর সন্ধ্যায় মেয়েটা গেল কোথায়? হঠাৎ খেয়াল হয়, ফিশারী অফিসের ভিতরে গেল নাকি? সঙ্গে-সঙ্গে শুক্কুরের হাতে টর্চ লাইট দিয়ে শুক্কুরকে ফিশারী অফিসের ভিতরে তুলির খোঁজে পাঠান। একটু পরেই শুক্কুর ছুটে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে, 'ভাবীজান ফিশারীর মাঠের মইধ্যে ফিট হইয়া পইরা রইছে। মুখ দিয়া ফ্যানা বাইরাতেছে।' এ কথা শোনার পর তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে শুক্কুরের সাথে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে ফিশারী অফিসের ভিতরে যান। তাঁদেরকে ওভাবে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে দেখে রাস্তা থেকে এলাকার আরও চার-পাঁচজন লোক জুটে যায়। সবাই মিলে ধরাধরি করে তুলিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। একজন ডাক্তার ডাকেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঘোষণা করেন–সি ইজ ডেড। ডাক্তার মৃত্যুর কারণ বলে উল্লেখ করেন–বিষক্রিয়া। ডেড বডির নীলাভ শরীর, কালচে হয়ে যাওয়া ঠোঁট, ঠোঁটের পাশ বেয়ে গড়ানো ফেনা...এসব আলামত দেখে ডাক্তার আরও বলেন, পটাশিয়াম সায়ানাইডের মত কোনও মারাত্মক বিষের প্রভাবে বোধহয় মৃত্যু ঘটেছে। কোনও বিষাক্ত সাপের কামড়েও মৃত্যু ঘটতে পারে। তাঁর জানা মতে, গোখরো জাতীয় সাপের বিষে পটাশিয়াম সায়ানাইড থাকে। তবে ডেড বডির উন্মুক্ত কোনও স্থানে সাপের কামড়ের চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেম করলেই মৃত্যুর আসল কারণ বের হয়ে যাবে। পুলিশ ডাকতে বলে ডাক্তার চলে যান।

নিয়ামত চাচা স্থানীয় থানায়, তুলির মাকে আর সজীবকে ফোন করেন। সজীব অফিস থেকে ফেরার আগ পর্যন্ত ঘটনা মোটামুটি এই।

পুলিশের ওসি সাহেব চাইছেন পোস্টমর্টেম করার জন্য লাশ নিয়ে যেতে।

BanglaBook.org

অপঘাতে মারা যাওয়া লাশের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। এই মৃত্যু কি আত্মহত্যা, নাকি খুন, নাকি সাপের কামড়ে–এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে হলে পোস্টমর্টেম করতেই হবে। কিন্তু পোস্টমর্টেম করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তুলির মা। তিনি চাইছেন না তাঁর মেয়ের মৃতদেহটা নিয়ে পুলিশ টানা-হ্যাঁচড়া করুক, পোস্টমর্টেম করার নামে কাটা-ছেঁড়া করুক। তিনি তা সইতে পারবেন না। তিনি হাত জোড় করে সজীবকে অনুরোধ করেছেন, পুলিশ যেন কিছুতেই তাঁর মেয়ের লাশ নিতে না পারে। ওসব থানা-পুলিশ করে কি আর তাঁর মেয়েকে ফেরত পাওয়া যাবে? তিনি মেনে নিয়েছেন তাঁর মেয়ের মৃত্যু সাপের কামড়েই হয়েছে। কেউ তাকে খুন করেনি।

শেষ পর্যন্ত পোস্টমর্টেম না করেই তুলির লাশ স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। কবরস্থানটা নিয়ামত চাচার বাড়ির কাছেই।

পাঁচ

তুলির আকস্মিক মৃত্যুতে সজীব একেবারে ভেঙে পড়েছে। সে অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে নিয়েছে। বিষণ্ন মনে সে সারাক্ষণ ঘরের ভিতরে বসে থাকে। বসে-বসে তুলির মৃত্যুর কারণ নিয়ে ভাবে, তুলির স্মৃতি রোমন্থন করে, তুলি কেন হঠাৎ-হঠাৎ ভয় পেত তা নিয়ে ভাবে।

সজীবের নাওয়া-খাওয়া কোনও দিকেই কোনও খেয়াল নেই। একটার পর একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটের গন্ধে ঘর গুমোট হয়ে থাকে। নিয়ামত চাচা এসে অনেক সাধাসাধি করে খেতে বসান। খেতে বসেও খাবার সামনে নিয়ে বিষাদগ্রস্ত মুখে বসে থাকে। নিয়ামত চাচার পীড়াপীড়িতে দু-এক নলা মুখে তুলে খাবার রেখে উঠে পড়ে।

মাঝে-মাঝে দুপুরবেলা সজীব ফিশারী অফিসের ভিতরে যায়। ফিশারী অফিসের ভিতরে গিয়ে তুলি যে জায়গাটায় বসে থাকত, যেখানে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেসব জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। ঘুরেঘুরে আশপাশে

BanglaBook.org

কোন সাপের গর্ত আছে কিনা খুঁজে দেখে। প্রায় সবারই অভিমত, তুলির মৃত্যু সাপের কামড়ে হয়েছে। তাই সে সেই ঘাতক সাপটাকে খুঁজে ফেরে। এখন পর্যন্ত কোনও সাপের গর্তের দেখা মেলেনি। তবুও সজীব প্রায়ই ওখানটায় যায়। অন্তত অনুভব করার চেষ্টা করে, তুলি কেন ভর দুপুরবেলা ওখানে গিয়ে রোদের মধ্যে বসে থাকত।

সজীব ফিশারী অফিসের হ্যাচারি ঘরের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে, পশ্চিম দিকের বড় পুকুরটার পাড় ধরে দক্ষিণ প্রান্তের খোলা জায়গাটা, যেখানে তুলিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেদিকে মুখ করতেই দেখতে পেল–কালো রঙের ড্রেস পরা একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার কাছাকাছি পৌঁছে সজীবের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। সেই সাথে প্রচণ্ড বিস্ময় বোধও হলো। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সী একটা মেয়ে। বাড়ন্ত শরীরে প্রথম যৌবনের ছোঁয়া। পিঠ পর্যন্ত লম্বা চুল। মুখের আদলটা ঠিক যেন তুলির মত। তুলির সাথে চেহারার মিল দেখেই সজীবের বুক ধক্ করে ওঠে। আর বিস্ময় বোধ হয় মেয়েটা সূর্যের দিকে মুখ করে, হাঁটু মুড়ে বসে আছে দেখে। কারণ মেয়েটা বসে আছে ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে তুলিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

আশপাশে কোনও দিকেই মেয়েটার কোনও খেয়াল নেই। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সে যেন ধ্যানে মগ্ন। সজীব যে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে সেদিকে তার কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। চোখেও পলক পড়ছে না।

সজীব বলল, 'এই, মেয়ে, কে তুমি? রোদের দিকে তাকিয়ে বসে আছ কেন? তোমার চোখ তো নষ্ট হয়ে যাবে।'

সজীবের কথা বোধহয় মেয়েটার কানে পৌঁছল না। সে এক চুলও নড়ল না। সে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনই রইল। সে যেন পাথরের মূর্তি।

সজীব গলার স্বর কিছুটা উঁচু করে আবার বলল, 'এই, মেয়ে, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? এই ভর দুপুরবেলা রোদের মধ্যে বসে আছ কেন?'

অবস্থা তথৈবচ। মেয়েটা কি বধির নাকি?

সজীব আলতো হাতে মেয়েটাকে একটা ধাক্কা দিল। অমনি মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে সজীবের দিকে তাকাল। সজীবের বুকের ভিতরটা আবার ধক্ করে উঠল। সেই চোখ! সেই চাহনি! যেন তুলির চোখ জোড়াই মেয়েটার

BanglaBook.org

চোখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কি কোনও ভুল হচ্ছে? এমনটাও তো হতে পারে, সে সারাক্ষণ তুলির কথা ভাবছে বলে, মেয়েটার মাঝেও সে তুলিকে দেখতে পাচ্ছে।

মেয়েটা কিছু না বলে কিছুক্ষণ অপলক চোখে সজীবের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে চলে যেতে লাগল।

সজীব অবাক হয়ে পিছন থেকে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখতে লাগল। মেয়েটা খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। ধবধবে ফর্সা দুটো পা।

রাত দশটা।

নিয়ামত চাচা সজীবকে নিয়ে খেতে বসেছেন। খাবার পরিবেশন করছে শুক্কুর। আয়োজন তেমন কিছু নয়। চিকন চালের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, তেলে ভাজা শুকনো মরিচ দিয়ে বানানো লালচে রঙের আলু ভর্তা, কুচো চিংড়ির বড়া, ধনে পাতা দেওয়া ডিম ভাজি আর মসুর ডালের চচ্চড়ি।

নিয়ামত চাচা তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছেন। খেতে-খেতে এক পর্যায়ে সজীবের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সজীব খাচ্ছে না, সে ভাতের প্লেটের দিকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে আঙুল দিয়ে ভাত নাড়াচাড়া করছে।

নিয়ামত চাচা খাওয়া থামিয়ে বললেন, 'কী হলো, সজীব, খাচ্ছ না কেন? এই কদিনে তোমার চেহারার কি হাল হয়েছে তুমি তা জানো?'

নিয়ামত চাচার কথায় সজীব যেন সম্বিত ফিরে পেল। সে বিষণ্ন মুখে বলল, 'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'খেতে ইচ্ছে না করলেও তোমাকে খেতে হবে। তোমাকে বাঁচতে হবে। যে চলে গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। কারও জন্যই পৃথিবী থেমে থাকে না। সারাদিন মন খারাপ করে ঘরের ভিতরে বসে থাকার চেয়ে কাল থেকে অফিসে যাওয়া ধরো। জীবনে আবার ছন্দ ফিরে আসুক। আমি খোঁজ-খবর শুরু করেছি। তোমাকে আবার বিয়ে করাব। এবারে তুলির চেয়েও সুন্দরী মেয়ে তোমার বউ করে আনব।'

সজীব কিছু না বলে চুপ করে রইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার চোখে নিরুৎসাহী দৃষ্টি।

নিয়ামত চাচা ভাতের নলা মুখে দিয়ে চিবাতে-চিবাতে আবার বলতে

BanglaBook.org

লাগলেন, 'বউ মরে গেলে পুরুষ মানুষের এমনভাবে ভেঙে পড়া মানায় না। আবার বিয়ে করে, সংসার শুরু করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। এবারে না হয় তোমার মায়ের পছন্দের তোমার খালাতো বোনকেই বিয়ে করো। গ্রামের মেয়েরা স্বামীর অনেক খেদমত করে।'

সজীব প্লেটের এঁটো ভাতের ভিতরেই হাত ধুয়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, 'চাচা, আমার খাওয়া শেষ। কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা কাল আবার শুনব। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি দোতলায় আমার রুমে যাচ্ছি।'

সজীব চলে গেল। নিয়ামত চাচা কিছুটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সজীব ছেলেটা তাঁর সাথে এমন আচরণ এর আগে কখনও করেনি। তুলির মৃত্যুতে ছেলেটার মন-মানসিকতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি সবই বোঝেন। তুলির জন্য তাঁর নিজেরও খুব খারাপ লাগে। তাই বলে সেই খারাপ লাগাকে প্রশ্রয় দিয়ে বসে থাকলে তো হবে না। ছেলেটাকে ধৈর্য সহকারে বোঝাতে হবে।

সজীব তার রুমে ঢুকে, রুমের সাথে লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে, বারান্দার গ্রিলের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বিষণ্ন মুখে পর-পর তিনটা সিগারেট ধরিয়ে টানল। তার মনের ভিতরে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে নিয়ামত চাচার তাকে আবার 'বিয়ে করতে' বলা কথাটা। কথাটা তার মনের ভিতরে কাঁটার মত বিঁধছে। বলতে গেলে এখনও ঘরের বাতাসে তুলির গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়, এখনও ঘরের চার দেয়ালে তুলির হাসির শব্দের, কান্নার শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, এখনও সজীবের পুরো শরীর জুড়ে তুলির স্পর্শ, উত্তাপ, আবেগ মেশানো নিবিড় ছোঁয়া অনুভূত হয়... আর সে কিনা এরই মধ্যে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাবছে! বিয়ের আগে তার কারও সাথে প্রেম করা হয়নি, তুলিই তার জীবনের প্রথম প্রেম। প্রথম প্রেমের কথা কি এত সহজে ভোলা যায়? কোন দিনও ভোলা যায় না! সে আর কোনও দিনও বিয়ে করবে না! মনের আসনে তুলির জায়গায় সে অন্য কাউকে আর বসাতে পারবে না!

বারান্দা থেকে সজীব রুমের ভিতরে ঢুকল। আলনা থেকে তুলির কয়েকটা কাপড় নামিয়ে এনে বিছানায় বসল। কাপড়গুলো মুখে, গালে,

BanglaBook.org

নাকে ঘষতে-ঘষতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাপড়গুলো থেকে তীব্রভাবে তুলির শরীরের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

এক পর্যায়ে তুলির কাপড়গুলো জড়িয়ে ধরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতের দিকে সজীবের ঘুম-ভেঙে গেল। ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কেউ যেন কথা বলছে। কাঁপা- কাঁপা গলায় টেনে-টেনে। মেয়েলি কণ্ঠ। কিছুটা যেন তুলির গলার স্বরের মত। ঘুম ভাঙার পর পরই ডিম লাইটের আলোতে যেন দেখতেও পেল—মাথার পিছন থেকে মেয়ে মানুষের অবয়বের মত কালো একটা ছায়া চট করে সরে গেল।

মেয়েলি স্বরটা কী বলেছে ঘুম ভাঙার পরে সজীবের তা স্পষ্ট মনে পড়ছে না। ছাড়া-ছাড়া ভাবে যা তার খেয়াল আছে, তা হলো—'তুমি ওই মেয়েটাকে এড়িয়ে চলবে, ওকে পাত্তা দেবে না, ওর কাছে ঘেঁষবে না... ও দেহধারী কেউ নয়। ও যে-কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। ও তোমাকে শেষ করে দেবে। ওকে পাত্তা দিয়ো না... ও তোমাকেও মেরে ফেলবে...'

সজীবের মন বলছে, সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নে ঘটেছে। স্বপ্ন ছাড়া এর কোনও ব্যাখ্যা হয় না। ঘুম ভাঙার পর-পর কালো একটা ছায়া যে সরে গিয়েছে, ওটাও স্বপ্নেই ঘটেছে। এখন মনে হচ্ছে ঘুম ভাঙার পরে দেখেছে।

স্বপ্নে কালো ছায়াটা তাকে সাবধান করতে চাইছে। বার-বার বলেছে, 'ওই মেয়েটাকে এড়িয়ে চলবে...ওকে পাত্তা দেবে না...' কোন্ মেয়েটাকে সে এড়িয়ে চলবে? কোন্ মেয়েটাকে? কে সে? কেন এড়িয়ে চলবে? কার কথা বলেছে?...ধুর, নিছক একটা স্বপ্ন নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই।

পুবের আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হতে লাগল। সেই সাথে সজীবের মন থেকে মুছে যেতে লাগল স্বপ্নের আবেশ।

সূর্য উঠি-উঠি করছে। রাস্তা-ঘাট একেবারে ফাঁকা। ভোরের সতেজ হাওয়া আর পাখির কিচির-মিচির ডাকে চারদিক আমোদিত। মাঝে-মাঝে অচেনা ফুলের সৌরভ। সজীব লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলছে নিকটস্থ কবরস্থানের দিকে। সেই কবরস্থানেই চির-নিদ্রায় শায়িত আছে তুলি। ভোরের এই নির্জনতায় তুলির কবরের পাশে গিয়ে সে বসে থাকবে। তুলি মারা যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই সে এমনটাই করছে। আগে সকালে ঘুম ভাঙার পর তুলির স্নিগ্ধ-কোমল ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত আর

BanglaBook.org

এখন সেই তুলিরই নিস্তব্ধ কবরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

কবরস্থানের ভিতরের সারি-সারি কবরের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া কংক্রিটের বাঁধানো রাস্তা ধরে তুলির কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সজীব। কিছুটা দূর থেকেই সজীবের চোখে পড়ল, তুলির কবরের উপর কালো ড্রেস পরা একটা মেয়ে উবু হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে মেয়েটা যেন কবরের উপর কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। কাছাকাছি পৌঁছবার পর সজীব মেয়েটাকে চিনতে পারল। সেই মেয়েটা, কাল যাকে ফিশারী অফিসের ভিতরে রোদের দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখেছে।

মেয়েটা একই অবস্থায় কবরের উপর কান পেতে উবু হয়ে রয়েছে। সজীবের অস্তিত্বের কোনও তোয়াক্কা করছে না।

সজীব অবাক হওয়া গলায় বলল, 'এই, মেয়ে, কে তুমি? কী করছ তুমি?'

মেয়েটার কোনও ভাবান্তর হলো না। সে একই ভঙ্গিতে উবু হয়ে রইল। সজীবের মনে পড়ল, কালও মেয়েটা কোনও জবাব দেয়নি। এমন ভঙ্গি করেছে মনে হয়েছে বধির। আজও সেই একই অবস্থা।

সজীব মেয়েটার পিঠে হাত রাখল। সঙ্গে- সঙ্গে মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। গতকালের মত সজীব চমকে উঠল। ঠিক যেন তুলির ছোট বোন! একই চেহারার আদল, একই ফর্সা গায়ের রঙ, একই রেশমি চুল, একই তীক্ষ্ণ নাক, একই ভাসা-ভাসা হরিণী চোখ...সবকিছু মিলে যাচ্ছে!!!

সজীব মেয়েটার দু-কাঁধ চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, 'এই, মেয়ে, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?...আজ তোমাকে বলতেই হবে। তুমি কি বোবা? কথা বলতে জানো না?'

মেয়েটা স্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, 'শুধু চেহারায়ই মিল নয়, আপনার স্ত্রীর মত আমারও বুকের মাঝখানে একটা লাল তিল রয়েছে। দেখবেন আমার বুকের তিলটা? দেখে অনেক মজা পাবেন। তিল দেখার সাথে বুকও দেখতে পাবেন। কিশোরী মেয়েদের বুক দেখার মজাই আলাদা।'

সজীব বেশ হকচকিয়ে গেল। পরিপক্বের মত এ-কী বলছে মেয়েটা! মেয়েটার গলার স্বরটাও কেমন রুক্ষ! কিশোরী মেয়েদের মত কোমল নয়।

BanglaBook.org

আর মেয়েটা জানলই বা কী করে তুলির বুকের মাঝখানে একটা লাল তিল ছিল! তার চেয়েও বড় কথা মেয়েটা সজীবের মাইণ্ড রিডিং করেছে। সজীব যে তুলির সঙ্গে মেয়েটার চেহারার মিল পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তা মেয়েটা বুঝে ফেলেছে।

সজীব নিজেকে সামলে কোনওক্রমে বলল, 'তুমি কে, সেটা আগে বলো।'

মেয়েটা কোনও জবাব দিল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রহস্যময় ভঙ্গিতে মুচকি হাসি দিল। সজীব যেন খুবই হাস্যকর একটা প্রশ্ন করেছে।

'তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কোত্থেকে এসেছ?' মরিয়া হয়ে আবার প্রশ্ন করল সজীব।

এবারেও একই প্রতি-উত্তর। মুচকি হাসি। সেই হাসির মধ্যে কেমন অহংকারী ভাব।

মেয়েটা চলে যাচ্ছে। খালি পায়ে পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে। মেয়েটার পায়ের দিকে তাকিয়ে সজীব শিউরে উঠল। মেয়েটার প্রতি পায়ে ছয়টা করে আঙুল। প্রতিটা আঙুলের একই গড়ন। বৃদ্ধাঙুল বা কনিষ্ঠা আঙুল বলে কোন ভিন্নতা নেই। বেঁটে-বেঁটে একই রকমের ছয়টি আঙুল। আঙুলগুলো আবার দুটি-দুটি করে জোড়া লাগানো। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল, হাতের আঙুলেরও একই অবস্থা।

মেয়েটার হাত-পায়ের আঙুলের ব্যতিক্রম দেখতে-দেখতে হঠাৎ সজীবের মনে হলো, মেয়েটার মুখের ভিতরটাও স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। দাঁত, জিভ, চোয়াল, অন্য রকমের। তাই তো মেয়েটা ঠোঁট টিপে-টিপে হেসেছে আর সহজে কোনও কথা বলতেও চায় না। যাতে তার অস্বাভাবিক দাঁত, জিভ, চোয়াল দেখা না যায়।

BanglaBook.org

ছয়

সজীব তুলির মা তহুরা বেগমের কাছে এসেছে। ভদ্রমহিলার বয়স বোধহয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। মেয়ে মারা যাওয়ার পর এই ক'দিনে তাঁর চেহারার যে হাল হয়েছে, তাতে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বয়স ষাটেরও অনেক উপরে।

তহুরা বেগম ছোট্ট একটা বাসা নিয়ে থাকেন। তাঁর দেখা-শোনার জন্য বিশ-বাইশ বছর বয়সী একটা কাজের মেয়ে আছে।

সজীব তহুরা বেগমের সামনে বসার ঘরে বসে আছে। বসার ঘরের চার দেয়াল জুড়ে তুলির বিভিন্ন বয়সের বড়-বড় বাঁধানো ফটো ঝোলানো। এর মধ্যে দুটি ফটো তুলির কিশোরী বয়সের। সেই ফটো দুটিতে তুলির যে চেহারা ফুটে আছে তা হুবহু সেই অদ্ভুত মেয়েটার চেহারা।

সজীব ফটো থেকে চোখ নামিয়ে তহুরা বেগমকে বলল, 'আজ আমি আপনার কাছে এসেছি তুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে। বিয়ের দু-তিন দিন পর থেকেই দেখেছি তুলি অকারণে হঠাৎ-হঠাৎ খুব ভয় পেত। ভয়ে অস্থির হয়ে উঠত। আবোল-তাবোল বকত। এমনটা সে কেন করত?'

তহুরা বেগম ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, 'কেন, তুলি তোমাকে কিছু বলেনি?'

'না, ও তেমন কিছুই বলত না। ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে শুধু একটা কথাই বলত, "ওটা আমাকে দেখছে।" আমি জিজ্ঞেস করতাম, "কে তোমাকে দেখছে?" ও চুপ করে থাকত। শত অনুরোধেও আর কিছুই বলত না।'

'সব কিছু জানলে তুমি ওকে ভুল বুঝতে পারো, এই ভেবেই হয়তো ও তোমাকে কিছু বলেনি।'

'আপনি এখন সব বলুন। এখন তো আর ভুল বোঝাবুঝির কিছুই নেই। তুলিই যেখানে নেই!'

তহুরা বেগম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে

BanglaBook.org

লাগলেন, 'শুরু থেকেই তোমাকে সব কিছু খুলে বলি। তুলি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। ফাইনাল পরীক্ষার পর স্কুল থেকে একটা পিকনিকের আয়োজন করা হয়। পিকনিক স্পট নির্ধারণ করা হয় বাজিতপুরের দেড়শো বছরের পুরানো জমিদার বাড়ি। পিকনিকে ছাত্রীদের সাথে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাবেন। ইচ্ছে করলে ছাত্রীদের গার্ডিয়ানরাও যেতে পারবেন। আমার একটা মাত্র মেয়ে, একা ছাড়তে ভয় লাগে, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমিও তুলির সঙ্গে যাব।

'নির্দিষ্ট দিনে দল বেঁধে, সবাই মিলে বাজিতপুরের জমিদার বাড়ি পৌঁছে যাই। বিশাল এলাকা নিয়ে জমিদার বাড়িটা। বাড়ির পিছনে একটা বিরাট দিঘি। দিঘির দুই পাড়ে বাঁধানো চওড়া ঘাটলা। বাড়ির ডান পাশে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের অনেক ভিতরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া রঙমহল।

'প্রাসাদের কামরাগুলো, কুয়া, দিঘি, দিঘির ঘাটলা, দিঘির চার পাড়, জঙ্গল, রঙমহল, চেনা-অচেনা বড়-বড় সব গাছ...ছোট-ছোট দল করে ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকি। মেয়েরা কেউ বুনো ফুল তুলছে, কেউ প্রজাপতির পিছনে ছুটছে, কেউ-কেউ দিঘির ঘাটলার সিঁড়িতে বসে গল্প করছে, গান গাইছে, কেউ আবার রান্না-বান্নার তদারকি করছে...হঠাৎ খেয়াল করি তুলিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি প্রায় কেঁদে ফেলি। সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে তুলিকে পাওয়া যায়– রঙমহলের পিছনে ঝোপ-ঝাড়, বড়-বড় ঘাসের ভিতরে অজ্ঞান অবস্থায়। ওর পাজামার দুই উরুর মাঝখানটায় টাটকা রক্তের দাগ। 'আমি তো কেঁদে-কেটে অস্থির। ওর চোখে-মুখে পানি ছিটানোর এক পর্যায়ে ওর জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই ওকে জেরা শুরু করি, কী ঘটেছে বলার জন্য। ও কিছুটা ধাতস্থ হবার পরে বলে, ও একটা রঙিন প্রজাপতির পিছন-পিছন ছুটতে-ছুটতে রঙমহলের পিছনে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে দেখতে পায়, হাঁটু অবধি লম্বা ঘন ঘাসের ভিতর থেকে কুচকুচে কালো রঙের, লম্বাটে মুখের অদ্ভুত একটা লোক হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে। কাছাকাছি পৌঁছবার পর বুঝতে পারে, ওটার মুখটাই শুধু কিছুটা মানুষের মত, গলার নীচ থেকে বাকিটা অজগরের চেয়েও বিশাল আকৃতির সাপের মত। আর ওটা হামাগুড়ি

BanglaBook.org

দিয়ে আসছে না, আসছে সড়সড়িয়ে অতি দ্রুত কিলবিল করে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু বুঝে উঠবার আগেই মুহূর্তের মধ্যে ওটা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে। ও জ্ঞান হারায়।

'ওর এই কথা কেউ বিশ্বাস করে না। এমনকী আমিও না। স্কুলের এক শিক্ষিকা বলেন, "আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে এই রকম–আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে ওর যৌনাঙ্গের সতীচ্ছদ পর্দা ফেটে যায়। তীব্র ব্যথায় আর রক্ত দেখে আতংকে ও অজ্ঞান হয়ে যায়। সাপের মত মানুষের ব্যাপারটা অজ্ঞান অবস্থায় ওর আতংকিত মস্তিষ্কের একটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

'এই ঘটনার পর থেকেই তুলি হঠাৎ-হঠাৎ ভয় পেতে শুরু করে। ও নাকি সেই অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখতে পায়। যেটার মুখটা কিছুটা মানুষের মত, শরীরের বাকি অংশ সাপের মত। ওটা নাকি ওর দিকে অঙ্গারের মত লাল চোখ দিয়ে পলকহীন তাকিয়ে থাকে। ও ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। আমি কিছুই দেখতে পাই না। আমি ওকে বোঝাই, "তুই যা দেখছিস ভুল দেখছিস। সেদিনের পর থেকে তোর মনে ভয়টা গেঁথে গেছে। তাই ওইসব হাবিজাবি দেখিস। ওসব নিয়ে একদম ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

'দেখতে-দেখতে তিন-চার বছর কেটে যায়। তুলি এস.এস.সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু ওর ভয় রোগটা থেকেই যায়। ও প্রায়ই বলে, "ঘুমের মধ্যে ওটা এসে আমাকে পেঁচিয়ে ধরে। আমার সমস্ত শরীর ভীষণ ব্যথা করছে।" আমি ওর কথায় পাত্তা দেই না। নিশ্চয়ই উল্টা-পাল্টা স্বপ্ন দেখেছে।

'হঠাৎ তুলির বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। মাথা ঘোরা, বমি, বমি-বমি ভাব, পেটে ব্যথা, দুর্বলতা...আমি তেমন গুরুত্ব দেই না। আমি আমার নিজের সাজেশনে মাথা ঘোরার, পেটে ব্যথার, বমি না আসার ওষুধ কিনে খাওয়াতে থাকি। দুই-তিন মাস কেটে যায়, দিনে-দিনে অসুখের প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। শেষমেশ একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, "আপনার মেয়ে প্রেগন্যান্ট।" ডাক্তারের কথায় আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এ-কী বলছে! কুমারী মেয়ে গর্ভবতী!

'আমি ওর ওপর প্রচণ্ড রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে-

BanglaBook.org

করতে জিজ্ঞেস করি, "হারামজাদী, বল তুই কার সাথে অকাজ করে পেট বাধিয়েছিস?" ও প্রতিবারই কাঁদতে- কাঁদতে একই কথা বলে, "আমি কিছু করিনি, মা... আমি কিচ্ছু করিনি। ওই অদ্ভুত সাপটাই আমার সর্বনাশ করেছে।"

'আমি ওর কথা বিন্দু মাত্র বিশ্বাস করি না। চুলের মুঠি ধরে টানতে-টানতে অ্যাবরশন করাতে নিয়ে যাই। অ্যাবরশন করে যেটা বের হয় তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেটা মোটেই মানুষের ভ্রুণ নয়, বিশাল আকৃতির কোনও সাপের অপরিণত ভ্রুণ। ডাক্তার-নার্স সবাই যুগপৎ অবাক হয়ে যায়।

'আমার অবস্থা তখন পাগলপ্রায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার! আমার মেয়ের পেটে সাপের বাচ্চা হয়েছে!!!

'যেহেতু সেই জমিদার বাড়ি থেকেই ঘটনার সূত্রপাত, তাই জমিদার বাড়িটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু করি। জানতে পারি, জমিদার বাড়িটা ছিল জমিদার আদিত্যনারায়ণ রায় চৌধুরীর। লোকটা ছিল যেমন মদ্যপ তেমন লম্পট চরিত্রের। জনশ্রুতি আছে একবার এক বেদেনী জমিদার মহলে আসে সাপের খেলা দেখাতে। সাপের খেলা দেখে জমিদার আদিত্য নারায়ণ যতটা না মুগ্ধ হয় তার চেয়ে বেশি মুগ্ধ হয় বেদেনীর রূপ যৌবন দেখে। বেদেনীকে বন্দি করে নিয়ে যায় তার বাগান বাড়িতে। সেখানে সারা রাত ধরে পর্যায়ক্রমে মেয়েটাকে ধর্ষণ করে। ভোরবেলা গলা টিপে মেয়েটাকে হত্যা করে, লাশ নদীতে ফেলে দেয়। ওই বেদেনীর বাবা ছিলেন তাদের বেদে গোষ্ঠীর সর্দার। সেই সর্দার তন্ত্র-মন্ত্র, কালো জাদুও জানতেন। মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বেদে সর্দার জমিদারের ওপর কালো জাদুর প্রয়োগ শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জমিদারের ওপর কালো জাদুর প্রভাব পড়ে। জমিদার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, সেই সাথে মতিভ্রম, সমস্ত শরীরে চুলকানি, জ্বালা-পোড়া। চুলকাতে-চুলকাতে শরীরের চামড়া শুকনো খসখসে হয়ে উঠে যায়। দিনের পর দিন কিছুই খেতে পারে না। শুকিয়ে তার শরীরটা সাপের মত লতিয়ে যেতে থাকে। গা থেকেও সাপের গায়ের গন্ধের মত তীব্র আঁশটে গন্ধ

BanglaBook.org

আসে। জিভ কালো হয়ে সরু আকৃতি নেয়। ধীরে-ধীরে জিভের ডগা মাঝখান থেকে চিরে দু-ভাগ হয়ে যায়। এক অমাবস্যার রাতের পর থেকে রুগ্ন-মৃতপ্রায় জমিদারকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। চিরতরে গায়েব হয়ে যায়। জমিদার গায়েব হওয়ার পর বিনা কারণে হঠাৎ-হঠাৎ জমিদার বাড়ির একের পর এক লোক মারা যেতে থাকে। মারা যাওয়া প্রতিটা লাশ দেখেই মনে হয় কোনও বিষধর সাপের কামড়ে মারা গেছে, কিন্তু কোনও লাশের গায়েই সাপের ছোবলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। ধীরে-ধীরে জমিদার বাড়ির সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই সাথে নিশ্চিহ্ন হয় বাড়ির ব্যাঙ, ইঁদুর, পাখি...আর দিঘির সমস্ত মাছ।

'সাত-আট বছর আগেও নাকি গ্রামের এক লোক তার হারানো ছাগল খুঁজতে জমিদার বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখে, কুচকুচে কালো রঙের অজগরের চেয়েও বিশাল একটা সাপ তার ছাগলটাকে পেঁচিয়ে ধরে টানতে-টানতে দিঘির জলে নেমে যাচ্ছে।'

এতক্ষণ ধরে তহুরা বেগমের বলা কথাগুলো সজীব যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনল। তহুরা বেগমের বলা থামতেই সজীব বলে উঠল, 'সবকিছু পর্যালোচনা করে কি এটাই দাঁড়াচ্ছে, দেড়শো বছর আগের সেই সাপুড়ে সর্দারের কালো জাদুর প্রভাবে জমিদার আদিত্য নারায়ণ রায় চৌধুরী সাপ হয়ে গিয়েছিলেন! এবং সেই অদ্ভুত সাপটা এখনও টিকে আছে! আর সেই অদ্ভুত সাপটাই তুলির উপরে ভর করেছিল! কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? সাপ কীভাবে মানুষের ওপরে ভর করে? আমি জানতাম ভূত-প্রেত, জিন-পরী নাকি মাঝে- মাঝে মানুষের উপর ভর করে, তাই বলে সাপও!'

তহুরা বেগম ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে, খালি গ্লাসটা টেবিলের উপরে রেখে বললেন, 'আমি জৈন্তাপুর গ্রামের নাম করা এক ওঝার কাছে গিয়েছিলাম। ওঝাকে সব ঘটনা বলে, তোমার মত আমিও ওঝাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। ওঝা বলেন, যে সাপ একশো বছরের বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকে সেই সাপ ভূত-প্রেত, জিন-পরীর মতই প্রচণ্ড রকমের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, মানুষকে সম্মোহন করতে পারে, মানুষের ওপর ভর করতে পারে...এ ছাড়া এমনিতেও তো ওটা কোনও

BanglaBook.org

সাধারণ সাপ নয়। ওটা সাপুড়ে সর্দারের কালো জাদুর প্রভাবে মানুষ থেকে রূপান্তর হওয়া সাপ।'

'আরেকটা ব্যাপার, তুলির ভাষ্য মতে এবং সাত-আট বছর আগে ছাগল খুঁজতে যাওয়া গ্রামের সেই লোকের বর্ণনায়—সাপটা নাকি অজগরের চেয়েও বিশাল আকৃতির। আবার ধারণা করা হচ্ছে ওই সাপের ছোবলেই জমিদার বাড়ির অনেক লোকের মৃত্যু ঘটেছে এমনকী তুলিরও। কিন্তু আমার জানা মতে, বিশাল আকৃতির সাপ বিষধর হয় না।'

'তুমি কি এটা জানো না, সরীসৃপ প্রাণী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে? মানুষ থেকে রূপান্তর হওয়া দেড়শো বছর বয়সী সাপের অজগরের চেয়েও বিশাল আকৃতি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আর একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ওই সাপটার ছোবলে কেউই মারা যায়নি। কারণ কারও গায়েই সাপের ছোবলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এমনকী তুলির গায়েও নয়। ওই সাপটা বোধহয় বিষ প্রয়োগে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে। এমনও হতে পারে, ওটা যে কোনও উপায়ে বাতাসে বিষ ছড়িয়ে দেয়। তখন আশপাশে যে মানুষ থাকে সে সেই বিষাক্ত বাতাস গ্রহণ করে বিষ-ক্রিয়ায় মারা যায়।'

সাত

ভর দুপুরবেলা। সজীব ফিশারী অফিসের দক্ষিণ প্রান্তের খোলা দিকটায় যাচ্ছে। চারদিক কেমন খাঁ-খাঁ করছে। ফিশারী অফিসের সমস্ত কম্পাউণ্ড যেন জনমানব শূন্য।

দক্ষিণ প্রান্তের খোলা জায়গাটায় তুলির মত চেহারার সেই অদ্ভুত মেয়েটা দূর্বা ঘাসের উপরে, হাঁটু মুড়ে, রোদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যেন সে রোদ পোহাচ্ছে। সজীব গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়াতেই সজীবের নাকে ধাক্কা মারল তীব্র আঁশটে গন্ধ।

আগের মতই মেয়েটা সজীবের উপস্থিতির তোয়াক্কা না করে অনড় হয়ে

BanglaBook.org

বসে রইল। সজীব আচমকা আক্রোশের সাথে সজোরে মেয়েটার গায়ে একটা ধাক্কা দিল। আক্রোশের কারণ, এই মেয়েটা কে সে তা বুঝতে পেরেছে।

মেয়েটা ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে সজীবের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। সজীব হুংকার দিয়ে বলে উঠল, 'তুই যতই তুলির কিশোরী বয়সের চেহারার ভেক ধরে থাকিস, তোকে এখন আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি।'

মেয়েটা চোখে-মুখে ক্রূর হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে, হিসহিস করে বলল, 'তাই নাকি? চিনে ফেলেছিস আমাকে? তা হলে তো তোর আর রক্ষা নেই।'

সজীব প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় ধুপ করে একটা লাথি বসাল। মেয়েটা হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থা থেকে উল্টে পড়ল। উল্টে পড়ে তার চোখ দুটো ধকধক করতে লাগল। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে খলবলিয়ে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে তার মুখের ভিতর থেকে কালো রঙের সূচাল, ডগা চেরা, লম্বা লকলকে জিভটা বাইরে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সেই সাথে তার শারীরিক পরিবর্তনও শুরু হয়ে গেল। মুখটা লম্বাটে হয়ে যেতে লাগল। হাত দুটো শরীরের সাথে মিশে গেল। পা দুটো মিশে গিয়ে লম্বা হয়ে লেজের আকৃতি নিতে লাগল। মাথার চুল আর গায়ের কালো পোশাক শরীরের সাথে সেঁটে গিয়ে তেলতেলে, পিচ্ছিল, চকচকে কালো রঙের চামড়ায় রূপ নিতে লাগল।

দেখতে-দেখতে কুচকুচে কালো রঙের বিশাল এক সাপে পরিণত হলো। ফণা তোলার ভঙ্গিতে মাথা তুলে সজীবের মুখোমুখি দাঁড়াল। বিশাল মুখটা হাঁ করে মেলে ধরল। ডগা চেরা কালো জিভটা চোয়াল বেয়ে শূন্যে লকলক করছে আর উপরে সূচাল, ফাঁপা, শ্বদন্ত দুটো দেখা যাচ্ছে। শ্বদন্ত দুটোর ভিতর থেকে পানির মত বর্ণহীন তরল বেরিয়ে এসে, ফোঁটা হয়ে ঝুলে রইল। হাই তোলার মত করে সবেগে ফোঁস-ফোঁস করে ভিতর থেকে শ্বাস ছাড়তে লাগল। নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় হোক বা বেগের কারণেই হোক শ্বদন্ত দুটোর নীচে ঝুলে থাকা তরল, কুয়াশার মত ধোঁয়াটে হয়ে সজীবের দিকে উড়ে যেতে লাগল।

সজীবের মাথাটা ভীষণ ঝিম-ঝিম করছে। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত

BanglaBook.org

লাগছে। সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। চোখের পর্দা ভারী হয়ে আসছে।

সজীব ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল। অমনি বিশাল আকৃতির সাপটা সজোরে সজীবকে পেঁচিয়ে ধরে টানতে-টানতে বড় পুকুরটায় নেমে যেতে লাগল।

পরিশিষ্ট

সজীবকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নিয়ামত চাচা সজীবের নামে স্থানীয় থানায় মিসিং ডায়েরী করেন। পুলিশ বেশ কিছু দিন ধরে খোঁজাখুঁজি চালায়। কিন্তু সজীবের কোন হদিসই পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হাল ছেড়ে দেয়।

কয়েক মাস পরে নিয়ামত চাচা তাঁর অতি শখের বাড়িটা ছেড়ে সুইটজারল্যাণ্ডে তাঁর ছেলেদের কাছে চলে যান। বৃদ্ধ বয়সে একা-একা থাকা সম্ভব নয়। অসুখ-বিসুখ করলে দেখা-শোনার জন্য পাশে আপনজন কাউকে দরকার।

এ বছর ফিশারী অফিসটার হ্যাচারিতে প্রায় দশ লক্ষ রেণু পোনা উৎপাদন করে পুকুরগুলোতে মজুদ করা হয়। পরবর্তীতে পুকুরগুলোতে জাল ফেলে দেখা যায় দশ লক্ষ পোনার একটি পোনাও নেই।

পোনাগুলো কীভাবে গায়েব হয়েছে এর উপযুক্ত কোনও কারণ দেখাতে না পারায় উপরমহল দায়িত্বরত অফিসারকে সাসপেণ্ড করেছে। তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হয়ে এসেছে তরুণ এক অফিসার।

তরুণ অফিসার তার নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে ফিশারী অফিসের কোয়ার্টারে উঠেছে। অত্যন্ত আনন্দময় তাদের নতুন সংসার জীবন। তবে মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ তার স্ত্রী প্রচণ্ড ভয় পায়। ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তখন অফিসার উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো তোমার? হঠাৎ এমন ভয় পাচ্ছ কেন?' তার স্ত্রী কাঁপা-কাঁপা গলায় কোনক্রমে বলে, 'ওই যে ওখানে অন্ধকারে কালো মত অদ্ভুত কী যেন একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে! মুখটা যেন কিছুটা মানুষের মত কিন্তু গলার নীচ থেকে বাকিটা সাপের মত

BanglaBook.org

লকলকে! যেন সর্পমানব! ওটা আমার দিকে কেমন ধকধকে চোখে তাকিয়ে রয়েছে!!!'

অফিসার তার স্ত্রীর নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। সর্পমানব তার চোখে ধরা দেয় না, অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গুডরোবোঙ্গা

এক

মনু মিয়ার মেজাজ তুঙ্গে। মেজাজ খারাপ নিয়েই তিনি ভাত খেতে বসেছেন। মনু মিয়ার বাড়িতে দামি ডাইনিং টেবিল-চেয়ার রয়েছে, কিন্তু তিনি কখনও সেই টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন না মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে, মাদুরের উপরে আসন করে বসে তিনি খাবার খান। সুন্নতি তরিকা পালন করেন।

ভাত খেতে বসেও মনু মিয়ার মেজাজ আরও এক ধাপ চটেছে। তিনি ঝুরঝুরে ভাত খেতে পছন্দ করেন, কিন্তু আজকের ভাত গলাগলা। সালুনের পদ দেখেও মেজাজ খারাপ হয়েছে। বেগুন ভর্তা, ইলিশ মাছ দিয়ে লাল শাক রান্না, আর মসুর ডাল।

বেগুন ভর্তা খাওয়ার পর তাঁর মুখ চুলকাচ্ছে আর ইলিশ মাছ দিয়ে লাল শাক রান্না সালুন তো পাতে নেবারই জো নেই। কারণ লাল শাকের ভিতরে ইলিশ মাছ ভেঙেচুরে মাছের কাঁটা সমস্ত সালুন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সালুন খেলে নির্ঘাত গলায় কাঁটা বিঁধবে।

বেগুন ভর্তা দিয়ে খাওয়া শেষ করেই তিনি ডালের বাটি টেনে ডাল নিলেন। ডাল দিয়ে খেতে গিয়েও মেজাজ খারাপ হলো। ডালে লবণ হয়নি, পানসে পানসে লাগছে। কাঁচা লবণ পাতে নিয়ে যে খাবেন সে উপায়ও নেই। তাঁর হাই প্রেশারের সমস্যা আছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, ভুলেও যেন কাঁচা লবণ না খান।

দুপরের ভাতের সাথে লেবু খাওয়া তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। আজ লেবু কেটেও দেওয়া হয়নি। এমন না যে ঘরে লেবু নেই। তাঁর বাড়িতেই

BanglaBook.org

দুটো বড় বড় কাগজি লেবুর গাছ আছে। গাছ দুটিতে এবার জাঁকিয়ে লেবু হয়েছে।

মনু মিয়ার স্ত্রী আম্বিয়া বেগম পাশে বসে হাত পাখা নাড়তে নাড়তে শীতল চোখে ডাল দিয়ে অনিচ্ছা সহকারে তাঁর খাওয়া দেখছেন। কী বদমাইশ মেয়ে-ছেলে! স্বামী খেতে পারছে না দেখেও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই! চট করে যে একটা ডিম ভেজে এনে দেবে, তা নয়। বসে বসে হাত পাখা নেড়ে বাতাস করে দরদ দেখাচ্ছে। ওরে হারামজাদী, দেখছিস না মাথার উপরে যে ফ্যান ঘুরছে?

মনু মিয়া খাওয়ার সময় কখনও কথা বলেন না। সুন্নতি তরিকা মেনে চলেন। তিনি নিঃশব্দে পানসে ডাল দিয়েই ভাত মেখে মেখে গিলছেন আর মনে মনে আম্বিয়া বেগমের চোদ্দ গুষ্ঠী উদ্ধার করছেন।

মনু মিয়া বদমেজাজি রগচটা স্বভাবের মানুষ বলে তাঁর আশপাশে কখনও তাঁর ছেলে-মেয়েরা থাকে না। তিনি যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন তারা দূরে দূরে পালিয়ে থাকে।

মনু মিয়ার সাথে একত্রে পরিবারের কারও খেতে বসা তো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তিনি সব সময় একা খেতে বসেন। তাঁর সামনে ভাত-তরকারি বেড়ে দেওয়া হয়, তিনি নিজে নিজেই নিয়ে খান। কেউ তাঁকে খাওয়াতে গেলেও তিনি রাগ করেন। কারণ দেখা গেল, তিনি ভাজা মাছ দিয়ে আরাম করে খাচ্ছেন, যে খাওয়াচ্ছে সে ভাজা মাছের মধ্যে ঝোলের সালুন দিয়ে দিল। অমনি ভাতের থালা ছুঁড়ে মেরে তিনি উঠে পড়েন।

মনু মিয়ার খাওয়ার সময় তাই আম্বিয়া বেগম নিঃশব্দে তাঁর পাশে বসে থাকেন। কিছুই বলেন না। কী বলতে আবার কী বলবেন, অমনি ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে উঠে যাবেন। ত্রিশ বছরের সংসার জীবনে তিনি তাঁর স্বামীকে হাড়ে হাড়ে চিনেছেন।

মনু মিয়ার খাওয়ার সময় আম্বিয়া বেগম ছাড়াও তাঁর আশপাশে আর একজন থাকে, সে হচ্ছে–হাবু। হাবু মনু মিয়াদের বাড়ির কামলা। হাবু নিঃশব্দে ঘরের এক কোনায় মাথা নুইয়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ বাড়িতে হাবুর আগমনটা অতি নাটকীয়ভাবে। এক রাতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে মনু মিয়া বাইরে বের হয়ে

BanglaBook.org

দেখতে পান তাঁদের খোলা বারন্দায় ফর্সা রঙের দশ-এগারো বছর বয়সী একটা বাচ্চা ছেলে উলঙ্গ অবস্থায় কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পাশেই তাঁদের বাড়ির পোষা কুকুরটাও কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমানো। কুকুরটার নাম কালিয়া। কুকুরটার গায়ের রং মিশমিশে কালো বলেই অমন নাম রাখা হয়েছে। মোটাসোটা বিশালদেহী একটা পুরুষ কুকুর। কুকুরটার দেহের গড়ন যেমন বলিষ্ঠ তেমন তেজী স্বভাবের। অপরিচিত কেউ বাড়িতে ঢুকলে হামলে পড়ে। পাঁচটা লোককে কামড়েছে। কিন্তু এই ছেলেটাকে পাশে নিয়ে আরামে ঘুমাচ্ছে! মনু মিয়ার কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগে।

মনু মিয়া ছেলেটাকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য উঁচু গলায় ডাকলেন, 'ওই নেংটু হারামজাদা, মামা বাড়ির বারান্দায় আরাম করে ঘুমাচ্ছিস?'

মনু মিয়ার ডাকে ছেলেটার কোনও ভাবান্তর হলো না। নড়েচড়েও উঠল না। সে নির্বিকার ভাবে কুণ্ডলি পাকানো অবস্থায় ঘুমিয়েই যাচ্ছে। তবে কালিয়া জেগে উঠল। সে ভীত চোখে মনিবের দিকে তাকাল। বাড়ির সবার মত কালিয়াও মনু মিয়াকে খুব ভয় পায়।

কালিয়াকে জেগে উঠতে দেখে মনু মিয়া কালিয়াকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওই কুত্তা হারামজাদা, নেংটুকে পাশে নিয়ে তো দিব্যি ঘুমাচ্ছিস! তোর দোস্ত লাগে নাকি? নেংটু হারামজাদার পাছায় একটা কামড় বসিয়ে দে।'

কালিয়া কুঁই কুঁই করে এক জাতীয় শব্দ করল। বোধহয় কুকুরের ভাষায় সে বলল, 'ছেলেটাকে সে কামড়াবে না।'

মনু মিয়ার মেজাজ চড়ে গেল। তিনি ঘুমন্ত ছেলেটাকে কষে একটা লাথি মারলেন। লাথিটা লাগল ছেলেটার পিঠে। লাথি খেয়ে ছেলেটা ধড়মড় করে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে বসল। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে চারদিক দেখতে লাগল।

আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটল তখন। ছেলেটাকে লাথি মারার সঙ্গে-সঙ্গে কালিয়া লেজ শক্ত করে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে মনু মিয়ার দিকে তেড়ে এল। মনু মিয়া ভয় পেয়ে পিছনে সরে গেলেন। শেষ মুহূর্তে কালিয়া আর মনু মিয়াকে কামড় দিল না।

মনু মিয়া হতভম্ব। কালিয়া জীবনেও তাঁর সাথে এমন আচরণ করেনি।

BanglaBook.org

কালিয়া তাঁকে খুবই সমীহ করে। তিনি কালিয়াকেও মাঝে-মধ্যে লাথি মারেন। লাথি খেয়ে কালিয়া নীরবে দূরে সরে যায়। এমনটা কোনওদিনও করেনি।

কালিয়া যেভাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে মনু মিয়ার দিকে তেড়ে এসেছিল, তাতে মনে হলো সে মনু মিয়াকে হুমকী দিয়েছে, আর কখনও ছেলেটাকে মারলে, সে কামড় বসিয়ে দেবে।

মনু মিয়া হতভম্ব হয়ে আরও একটা ব্যাপার দেখলেন। কালিয়া ছেলেটার পিঠ চেটে দিচ্ছে। ছেলেটার পিঠের যে স্থানে লাথিটা লেগেছিল সেই জায়গাটা।

মনু মিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন, কালিয়াকে আর বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না। হারামজাদা মনিবের সাথে বেয়াদবি করেছে। আজ রাতেই হারামজাদাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে হবে।

মনু মিয়ার ইচ্ছে ছিল তিনি ছেলেটার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করে, কান ধরে টেনে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। হারামজাদা কোত্থেকে এসেছে কে জানে! কুত্তার সাথে পিরিত জমিয়েছে! ছেলেটা এই গ্রামের নয় তা বোঝা যাচ্ছে। কারণ এমন সুন্দর চেহারার ছেলে এই গ্রামে একটাও নেই।

মনু মিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে আপনমনে বললেন, 'কুত্তার সাথে দোস্তি করেছে হারামাজাদা নেংটু! হারামজাদাকে কুত্তার গু চাটাতে হবে।'

বাড়ি থেকে বের হবার আগে মনু মিয়া তাঁর স্ত্রী আম্বিয়া বেগমকে আদেশ করে গেলেন, কালিয়া বা নেংটু হারামজাদাকে যেন কোনও কিছু খেতে দেয়া না হয়। যদি তাঁর কথা অমান্য করে কিছু খেতে দেয়, তা হলে তিনি আম্বিয়া বেগমকে তালাক দেবেন।

আম্বিয়া বেগম তাঁর স্বামীর আদেশ অমান্য করলেন। তিনি মাংসের ঝোল দিয়ে মাখানো এক থালা ভাত কালিয়ার সামনে দিলেন। তিনি কালিয়াকে খুব ভালবাসেন। নিজ সন্তানের মত। কত ছোট অবস্থা থেকে কালিয়াকে তিনি লালন-পালন করেছেন! মিশমিশে কালো স্পঞ্জের বলের মত ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল। ক্ষুধা পেলেই কুঁই কুঁই করে কাঁদত। বাটিতে করে দুধ খেতে দিতে হত। সেই কালিয়াকে তিনি না খাইয়ে রাখবেন এটা

BanglaBook.org

হতে পারে না।

আশ্চর্য! কালিয়ার সামনে দেয়া ভাত কালিয়া ছুঁয়েও দেখছে না। সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ভেউ ভেউ করে নেংটা ছেলেটাকে ডাকছে।

ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে কালিয়ার পাশে গিয়ে বসল। কালিয়া ভাতের থালা দেখিয়ে কীভাবে খেতে হয় সেই ভঙ্গি করল। কালিয়ার কাছ থেকে শেখা পদ্ধতি অনুযায়ী ছেলেটা কুকুরের মত জিভ দিয়ে চেটে চেটে থালা থেকে ভাত তুলে খেতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে আম্বিয়া বেগম থ হয়ে গেলেন। কোত্থেকে এসেছে ছেলেটা? দশ-এগারো বছর বয়সী একটা ছেলে কীভাবে খেতে হয় জানে না, এ কেমন কথা! হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, দুনিয়া সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই ছেলেটার।

আম্বিয়া বেগম ছেলেটাকে টেনে নিজের কাছে আনলেন। উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, তোর নাম কী?'

ছেলেটা কিছুই বলল না। সে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আম্বিয়া বেগম আবার নাম জিজ্ঞেস করলেন। এবারে ছেলেটা মুখ খুলল। সে হুবহু আম্বিয়া বেগমের গলার স্বর নকল করে বলল, 'এই, তোর নাম কী?'

আম্বিয়া বেগম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বড়-বড় চোখ করে বললেন, 'এই, তুই কোত্থেকে এসেছিস?'

এবারেও ছেলেটা হুবহু আম্বিয়া বেগমের গলার স্বর নকল করে, 'এই, তুই কোত্থেকে এসেছিস?' বলে উঠল।

আম্বিয়া বেগম বুঝে উঠতে পারলেন না, তিনি কী করবেন। তিনি যা বলছেন ছেলেটাও তাই বলছে। এই নির্বোধ গাধাটা কোত্থেকে এসেছে কে জানে!

এমন সময় আম্বিয়া বেগমের মেয়ে লাইলি এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। লাইলির বয়স তখন সাত বছর।

লাইলি আহ্লাদি গলায় বলল, 'মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।'

অমনি ছেলেটাও লাইলির মত করে বলে উঠল, 'মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।'

BanglaBook.org

লাইলি খেপে উঠল, সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মা, দেখছ ও আমাকে ভেঙাচ্ছে।'

ছেলেটা আবার লাইলির বলা কথা লাইলির স্বরে বলে উঠল।

এবারে লাইলি চটে গিয়ে বলল, 'এই নেংটু তোর সাদা কেঁচোর মত নুনুটা কিন্তু টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

মেয়ের কথা শুনে আম্বিয়া বেগম জিভে কামড় দিয়ে বললেন, 'ছিহ্, মা, নোংরা কথা বলে না।' সেই সাথে আম্বিয়া বেগমের খেয়াল হলো, ছেলেটা অমন উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ঠিক নয়। তিনি লাইলিকে বললেন, 'যা তো, মা, ঘর থেকে মিজানের একটা প্যান্ট নিয়ে আয়।'

মিজান হচ্ছে আম্বিয়া বেগমের ছেলের নাম। মিজানের বয়সও তখন দশ-এগারো ছিল। এই ছেলেটার বয়সীই।

রাতে মনু মিয়া দু-পিস বিষ মাখানো পাউরুটি নিয়ে ফিরলেন। তাঁর উদ্দেশ্য রুটি দুটো তিনি কালিয়াকে খাওয়াবেন। হারামজাদা কুত্তা মনিবের সাথে বেয়াদবি করেছে! এবার ঠেলা সামলা।

পরিচয়হীন সেই ছেলেটা এবং কালিয়া যথারীতি বারান্দায়। ছেলেটার পরনে এখন একটা কালো রঙের হাফ প্যান্ট দেখা যাচ্ছে। কালিয়ার গায়ের উপর মাথা রেখে ছেলেটা শুয়ে আছে। একটু পর পর কালিয়া মাথা ঘুরিয়ে ছেলেটার মাথা-কপাল চেটে দিচ্ছে।

মনু মিয়া বিষ মাখানো রুটি দুটো কালিয়ার সামনে রাখলেন আর মনে মনে বললেন, 'নে, হারামজাদা, বিষ মাখানো পাউরুটি খা। ভাল করে খা। কাইল সকালের মধ্যে মইর‍্যা চ্যাগাইয়া পড়ে থাকবিনে। তহন বুঝবি মনু মিয়া কী জিনিস।'

আশ্চর্য! কালিয়া রুটি ছুঁয়েও দেখল না। ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে এসে, পশুর মত মুখ দিয়ে রুটি দুটো তুলে খেয়ে ফেলল।

মনু মিয়া সারা রাত দু-চোখ এক করতে পারলেন না। চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। কাল সকালে দেখা যাবে ছেলেটা মরে পড়ে আছে। কার না কার ছেলে। থানা-পুলিশ হবে। বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য করবে। শেষ পর্যন্ত কিনা অপরিচিত একটা ছেলেকে বিষ খাইয়ে খুনের দায়ে তাঁর ফাঁসিই হয়!

BanglaBook.org

সকালে দেখা যায় ছেলেটা দিব্যি আছে। বিষের কোনও প্রভাবই তার উপর পড়েনি। সে কালিয়ার সাথে খেলছে। কালিয়ার লেজ মুখ দিয়ে আলতো ভাবে কামড়ে ধরছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। কালিয়াও ছেলেটার পরনের প্যান্ট কামড়ে ধরছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে।

এরপর থেকে মনু মিয়া কালিয়া বা ছেলেটাকে নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করেননি।

মনু মিয়ার স্ত্রী আম্বিয়া বেগম ধীরে ধীরে শিখিয়ে-পড়িয়ে ছেলেটাকে সভ্য করে তোলেন। হাবাগোবা ধরনের বলে ছেলেটার নাম রাখেন হাবু। বাড়ির সব কাজে আম্বিয়া বেগমকে হাবু সাহায্য করে। হাবাগোবা গোবেচারা হলে হবে কী, যে কোনও কাজ তাকে একবার শিখিয়ে দিলে খুব সুন্দর ভাবে করতে পারে। তাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয় সেটাই সে নির্দ্বিধায় করে ফেলে। কাজ না থাকলে আম্বিয়া বেগমের আশপাশে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আম্বিয়া বেগম শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁকে যেন মামী বলে ডাকে আর মনু মিয়াকে মামা।

এই বাড়িতে হাবুর বারোটি বছর কেটে গেল। হাবুর বয়স এখন তেইশ-চব্বিশ বছর। সুদর্শন এক যুবক সে এখন। ছেঁড়া, ময়লা জামা কাপড়েও তার সুপুরুষ চেহারা একটুও ফিকে হয় না।

হাবু কোথা থেকে এসেছে? কীভাবে এসেছে? তার বাবা-মা কে? এসব প্রশ্ন এত দিনে চাপা পড়ে গিয়েছে। প্রথমে হাবুকে আশ্রয় দেয়া সেই কালিয়া নামের কুকুরটা আজ আর নেই। বয়সের ভারে বুড়ো হয়ে সেই কুকুরটা তিন-চার বছর আগে মারা গেছে।

লবণহীন পানসে ডাল দিয়েই অনিচ্ছা সহকারে ভাত খেয়ে উঠলেন মনু মিয়া। থালাটাও চেটে-পুটে খেলেন। থালা চেটে-পুটে খাওয়াও সুন্নত।

আম্বিয়া বেগম বেশি করে জর্দা দেওয়া এক খিলি পান দিলেন মনু মিয়ার হাতে। ভাত খেয়ে ওঠার পর মনু মিয়া বেশি করে জর্দা দেওয়া পান খান। তাঁর মেজাজ আগের অবস্থায়ই আছে। পান খেয়ে মেজাজ কিছুটা ঠাণ্ডা হলেও হতে পারে।

মনু মিয়া পান চিবুতে চিবুতে মুখ খুললেন, 'ইলিশ মাছ ভেঙেচুরে লাল

BanglaBook.org

শাক দিয়ে রান্না করা শিখেছ তোমার কোন ভাতার বাড়ি থেকে?'

আম্বিয়া বেগম কিছুই বললেন না। মনু মিয়া ভাতের থালার মধ্যে পানের পিক ফেলে আবার বললেন, 'যে ডাল রানছ, মুতের পানিতেও এর চেয়ে নুন বেশি থাকে। ঘরে নুন নাই আগে কইলেই তো হইত, ডালের হাঁড়িতে মুতে দিতাম।'

আম্বিয়া বেগম এবারেও কিছু বললেন না। তাঁর স্বামীর আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর ধারণা আছে। এটা নতুন কিছু নয়। ত্রিশ বছরের সংসার জীবনে এমন বাজে কথা অনেক শুনেছেন।

'আজকে যে লেবু কেটেও দিলা না! গাছ ভর্তি লেবু রাখছো তোমার কোন নাগরের লইগ্যা?'

সমস্ত কথাবার্তা হাবুর সামনেই হচ্ছে। হাবু এতক্ষণ মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, লেবুর কথা শুনে মাথা তুলে ভীত গলায় বলল, 'মামা, এখন গিয়া দৌড় দিয়া গাছ থেকে দুটা লেবু লইয়া আসি।'

মনু মিয়া গর্জে উঠলেন, 'হারামজাদা, লেবু কি এখন তোর পুটকিতে ঢুকামু?'

আম্বিয়া বেগম ঝাঁজের সাথে বলে উঠলেন, 'দুই দিন পর মেয়ের বিয়া। শ্বশুর হইতেছেন। একটু ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারেন না? হাবুরে এই মাত্র আপনি এটা কী বললেন?'

'তয় ভদ্র ভাষায়ই কই–নবাবজাদা হাবু, লেবু কি এখন তোমার পায়ু পথে প্রবেশ করাব?'

আম্বিয়া বেগম হাবুর দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, 'হাবু, তুই এখান থেকে যা তো।'

হাবু আম্বিয়া বেগমের নির্দেশ পেয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

মনু মিয়া পানের ছিবড়া থালার মধ্যে ফেলেন, থালার মধ্যেই কুলি করে ফেললেন। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'শ্বশুর আর হইছি! তোমার মেয়ের বিয়া তো ভাইঙ্গা গেছে।'

মনু মিয়ার মেয়ে লাইলির বিয়ে ঠিক হয়েছিল বরিশাল জজ কোর্টের এক উকিল ছেলের সাথে। ভাল পরিবার। ভাল বংশ। উকিল হিসেবেও ছেলের বেশ নাম-ডাক আছে। পান-চিনি হয়ে গেছে। আগামী শুক্রবার

BanglaBook.org

বিয়ের দিনও ধার্য করা হয়েছিল। আজ বুধবার। মাত্র একদিন বাকি। আজ বেলা বারোটার দিকে সেই ছেলে, লোক মারফত একটা চিঠি পাঠায় মনু মিয়ার হাতে। চিঠিতে লেখা–

জনাব,

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিশেষ এক কারণবশত আপনার কন্যার সাথে আমার বিবাহ ভেঙে দিলাম। এই বিবাহ না হওয়া আমার এবং আপনার কন্যা উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক। নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আপনার স্নেহ ধন্য

এ্যাডভোকেট কামরুল হোসেন

মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্যই মনু মিয়ার মেজাজ আজ বেশি গরম। বিয়ের বাজার-সদাইও করা হয়ে গেছে। বড় একটা ষাঁড়, তিনটা খাসি কেনা হয়েছে। মুরগির আড়তে তিনশ' মুরগিরও অর্ডার দেওয়া হয়েছে। ডেকোরেটর-এ বুকিং দেওয়া হয়েছে। আলাউদ্দিন বাবুর্চিকেও বুকিং করা হয়েছে। আলাউদ্দিন বাবুর্চির রান্নার কোনও জুড়ি নেই। আশপাশের দশ গ্রামেও তার মত বাবুর্চি আর একটাও নেই। তার রান্না একবার খেলে সেই স্বাদ আর সারা জীবনেও ভোলা যায় না।

গণ্য-মান্য লোকজনদের দাওয়াত দেয়াও হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় বিয়ে ভেঙে গেছে এও কি সহ্য করা যায়?

BanglaBook.org

দুই

মনু মিয়ার ছেলে মিজান মজে আছে বাঁশি নিয়ে। তার সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান বাঁশিতে। সে বংশীবাদক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর।

মিজান পর পর তিনবার এস.এস.সি পরীক্ষায় ফেল করার পর লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে তাকে দিয়ে লেখা-পড়া হবে না। লেখা-পড়া ছেড়ে দেবার পর তার বাবা মনু মিয়া তাকে বলেছিলেন তাঁর

সাথে ব্যবসায় লেগে পড়তে।

মনু মিয়ার অনেক ধরনের ব্যবসা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইটের ভাটা। মনু মিয়ার 'মনু ব্রিক ফিল্ড' নামে একটা ইটের ভাটা আছে। পাঁচটা মাছের ঘের আছে। এর মধ্যে দুটো গলদা চিংড়ির ঘের। বত্রিশ বিঘা জমি জুড়ে একটা পেয়ারা বাগান। ফরিয়াপট্টি বাজারে একটা সুপারির আড়ৎ। পটুয়াখালি শহরে একটা কসমেটিকস্-এর দোকান। এ ছাড়া নিজ গ্রামে কাঠ চেরাইয়ের একটা সমিল, একটা রাইস মিল, একটা সারের দোকান আর গ্রামের বাজারে একটা সিনেমা ঘর। সিনেমা ঘর ব্যাপারটা হচ্ছে, বাজারের ভিতরে স্কুল ঘরের মত লম্বা ঘর আছে। সেই ঘরের ভিতরে দিবা-রাত্রী সিনেমা হলের মত বাংলা-হিন্দি বিভিন্ন সিনেমা ডি.ভি.ডি'তে ছেড়ে ছত্রিশ ইঞ্চি টিভিতে দেখানো হয়। গ্রামের লোকজন টিকিট কেটে সেই সব ছবি দেখে। খুব জমজমাট ব্যবসা। সারা দিন আর সন্ধ্যা রাতের চেয়ে গভীর রাতে দর্শক বেশি হয়। কারণ গভীর রাতে দেখানো হয় নিষিদ্ধ পর্নোগ্রাফি।

মিজান তার বাবার কোনও ব্যবসায়ের সাথেই নিজেকে জড়ায়নি। সে তার বাবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ পেয়েছে। চেহারা, আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে সে যেমন তার বাবার চেয়ে আলাদা, তেমন মন-মানসিকতার দিক দিয়েও ভিন্ন।

মনু মিয়া লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারার এক লোক। তাঁর চেহারা দেখলেই কেমন ভয় ভয় লাগে। এমন একটা লোকের নাম যে কেন 'মনু' রাখা হয়েছিল, সেটাই এক রহস্য।

আর মিজান বেঁটে-খাটো রোগা-পাতলা একটা ছেলে। চেহারায় ভাল মানুষী ছাপ।

মনু মিয়া বদ মেজাজি তেজী স্বভাবের মানুষ। আর মিজান সহজ-সরল নরম মনের মানুষ।

মোদ্দা কথা পিতা-পুত্রের মধ্যে কোনও দিক দিয়েই কোনও মিল নেই।

মিজান বাঁশি বাজানো শিখছে তাদের পাশের গ্রাম বাছেতপুরের বংশীবাদক ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানির কাছে।

BanglaBook.org

ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানি অত্যন্ত বৃদ্ধ রোগা এক লোক। মাথায় একটি চুলও আর অবশিষ্ট নেই। বেলের মত চকচকে ছোট্ট একটা মাথা। শুকনো আমশির মত মুখখানা। গাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে। চোয়াল, চিবুক, গলার কণ্ঠা বিচ্ছিরি ভাবে দেখা যায়। সমস্ত শরীরের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। খালি গায়ে হাঁটু তুলে যখন বসে তখন হাঁটু দুটো আর মাথা মিলে, দেখে মনে হয়–তিন মাথাওয়ালা কোনও আজব প্রাণী।

ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানি থাকেন জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে। এক কালে তাঁর অনেক নাম-ডাক ছিল। এখন আর কেউ তাঁর খোঁজও রাখে না। তিনি বিয়ে থা-ও করেননি। একা একা জঙ্গলের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে পড়ে থাকেন। শরীর ভাল লাগলে বাঁশি বাজান। আগের মত এখন আর তিনি বাঁশির সুরও তুলতে পারেন না। আগে তিনি অনেক ধরনের সুর তুলতে পারতেন। একটা সুর আছে–পূর্ণিমার গভীর রাতে গায়ে আতর মেখে ঠিক মত তুলতে পারলে, আকাশ থেকে পরীরা নেমে আসে। আর একটা সুর আছে–সেই সুর শোনার জন্য বিভিন্ন পশু-পাখি এসে ভিড় করে। আরও একটা সুর আছে ঠিক মত তুলতে পারলে, ধীরে-ধীরে আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি নামে।

চান্দ শাহ দেওয়ানির বয়স কালে বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষকরা ছুটে আসত, বৃষ্টি নামানোর সুর বাজানোর জন্য তাকে নিয়ে যেতে। অনেক দিন খরার পর যখন খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হত তখন কৃষকরা এসে তাকে হাতে-পায়ে ধরত।

চান্দ শাহ দেওয়ানি খেতের পাশে বসে সারা দিন-রাত বাঁশি বাজাত। এক সময় আকাশ কালো হয়ে মেঘে ছেয়ে যেত। বৃষ্টি নামত। সেই সব দিন এখন আর নেই। খরা দেখা দিলে এখন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। চান্দ শাহ দেওয়ানির যে বৃষ্টি নামাবার ক্ষমতা ছিল, এটাই এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না।

আজকাল মিজানের আর বাড়িতে থাকা হয় না। সে দিন-রাত তার ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানির কাছেই পড়ে থাকে। বুড়ো মানুষ, সেবা-যত্নের প্রয়োজন হয়।

BanglaBook.org

রাতে ভাত খাওয়ার জন্য একবার মিজান বাড়িতে আসে। তার মা আম্বিয়া বেগম তার জন্য ভাত বেড়ে রেখে বসে থাকেন। মিজান পালিয়ে রান্নাঘরে বসে চুপিসারে ভাত খেয়েই আবার কেটে পড়ে। কারণ তার বাবা মনু মিয়ার সামনে পড়লে তুলকালাম কাণ্ড ঘটবে। মনু মিয়া আজকাল মিজানকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

ভাত খেয়ে ফেরার সময় মিজান তার ওস্তাদের জন্য এক ফ্লাস্ক দুধ, টিফিন কেরিয়ারের বাটির এক বাটি ভাত আর কলা, পাটালি গুড় নিয়ে যায়। তার ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানি একাহারি। সারা দিনে-রাতে তিনি একবার খান। তা-ও মাছ মাংস, তেল-ঝাল নয়, শুধু দুধভাত। কলা, পাটালি গুড় দিয়ে চটকে তিনি দুধভাত খান।

কিছু দিন ধরে মিজান নিজেও ওস্তাদের মত এক বেলা খাওয়ার চেষ্টা করছে। সারাদিন উপোস দেয়ার অনেক উপকার আছে। তাতে শরীর ও মন উভয়ই শুদ্ধ হয়। মনের ভিতরের লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ, দেমাগ-অহংকার বিনাশ হয়। শরীর কেমন তুলোর মত হালকা ফুরফুরে মনে হয়। তখন মনকে কেন্দ্রিভূত করে একাগ্রাচিত্রে সাধনায় নিবিষ্ট হওয়া যায়।

রাত প্রায় বারোটা। অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। মিজান বাড়িতে গিয়ে চুপিসারে খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতিদিনকার মত তার ওস্তাদের জন্য ফ্লাস্কে দুধ, বাটিতে গরম ভাত আর কলা, পাটালি গুড় নিয়ে জঙ্গলের পথে ওস্তাদের কুঁড়েঘরের দিকে এগুচ্ছে। তার সাথে আজকে আর একটা জিনিস বেশি রয়েছে। তা হলো—একটা খাসি ছাগল। লাইলির বিয়ে উপলক্ষ্যে যে তিনটা খাসি কেনা হয়েছিল তা থেকে সে একটা খাসি চুরি করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। খাসিটা বিশেষ একটা কাজে ব্যবহার হবে।

ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানির বাঁশি বাজিয়ে পরী আনা, বাঁশির সুরে পশু-পাখি জীব-জন্তুর ভিড় জমানো, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানো ছাড়াও গুপ্ত কিছু ক্ষমতা রয়েছে। সেই সব ক্ষমতা তিনি সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন করেন না। সেই সব ক্ষমতা প্রদর্শন করতে অনেক বাধাও আছে। অনেক নিয়ম-কানুন রক্ষা করতে হয়।

কুচকুচে কালো রঙের মন্ত্রপূত একটা বাঁশি আছে, কৃষ্ণপক্ষের রাতের

BanglaBook.org

এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে সেই বাঁশিতে বিশেষ একটা সুর তুললে আশপাশের মৃত আত্মারা ছুটে আসে। কালো রঙের সেই বাঁশিটা বাজিয়ে মৃত আত্মা আনতে হলে খুব সতর্কতার সাথে কিছু নিয়ম কানুন পালন করতে হয়। যেমন গায়ে থাকবে ধবধবে সাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেলাইবিহীন একটা কাপড়। গায়ের সেই কাপড়টা জোগাড় করতে হবে কবর দেওয়া কোনও লাশের গা থেকে চুরি করে। মৃত লাশের মত গায়ে মাখতে হবে আতর, লোবান ও কর্পূর। স্থান নির্ধারণেও সতর্ক হতে হবে। লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে একটা নির্জন ঘর। ঘরটা হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সারা ঘরে ছিটাতে হবে গোলাপ জল। ঘরের চার কোনায় জ্বলবে আগরবাতি। ঘরে ঘি-করঞ্জা তেল দিয়ে একটা মাত্র মাটির প্রদীপ জ্বলবে। যখন আত্মারা চলে আসবে তখন মাটির প্রদীপের আলো দপদপ করতে করতে নিভে যাবে।

আর একটা বাঁশি আছে মানুষের ঊরুর হাড়ের তৈরি। এটাও মন্ত্রপূত বাঁশি। বাঁশিটা ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানি পেয়েছিলেন এক সাঁওতাল সর্দারের কাছ থেকে।

মানুষের ঊরুর হাড়ের সেই বাঁশিটা অমাবস্যার রাতে, ঘর অন্ধকার করে, উলঙ্গ হয়ে পদ্মাসন অবস্থায় বাজালে এক ধরনের অতি ক্ষমতাবান অপদেবতারা চলে আসে। এই অপদেবতারা দেখতে বামনদের মত। কাছ থেকে এদেরকে দেখলে মনে হয় দুই-তিন বছরের কোনও বাচ্চার কাঁধে একটা ভয়ঙ্কর মাথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগুনের অঙ্গারের মত ভুরুহীন গনগনে লাল চোখ। কুঁচকানো ভাঁজ ভাঁজ সমস্ত মুখের চামড়া। নাকের স্থানটায় থ্যাবড়ানো মাংসপিণ্ড। কুচকুচে কালো, লম্বা লকলকে জিভ। কাঁচির আলের মত তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। সাত আঙুলবিশিষ্ট সুচালো নখযুক্ত ছোট ছোট হাত। পিঠের উপরে কুঁজোর মত। বানরের পায়ের মত ঘন লোমযুক্ত পা।

এই বামন অপদেবতারা খুবই ভয়ানক। এরা কারও উপরে ক্ষেপে গেলে তার বংশ নির্বংশ করে ফেলে। এদের তুষ্টির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়। এরা একবার এলে কোনও না কোনও প্রাণীর প্রাণ নিয়ে ফেরত যায়। তাই এদেরকে ডাকার আগে আশপাশে ছাগল, ভেড়া বা এই জাতীয়

BanglaBook.org

কোনও জন্তু বেঁধে রাখতে হয়। তা না হলে যে তাদেরকে ডাকে, তার বা তার নিকট আত্মীয় বা তার সন্তানের জীবন নিয়ে নেয়।

এই বামন অপদেবতাদের বশে রাখতে পারলে, এদেরকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যায়। যেমন–গুপ্তধনের খোঁজ বের করা যায়, শত্রুকে মেরে ফেলা যায়, কাউকে ভয় দেখিয়ে পাগল বানিয়ে ফেলা যায়...এ ছাড়া ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা আর ক্ষমতা অর্জনে এদের সাহায্যের তো জুড়ি নেই।

এই বামন অপদেবতাদের সাঁওতালরা প্রচণ্ড ক্ষমতার আধার বলে মনে করে। অপদেবতারা তাদের কাছে পরিচিত 'গুডরোবোঙ্গা' নামে। কিছু কিছু সাঁওতাল পরিবার গুডরোবোঙ্গাদের পূজা-অর্চনা করে আসছে বংশপরম্পরায়। যুগ যুগ ধরে সেই সব পরিবারের গুডরোবোঙ্গারা থাকছে পরিবারের সদস্যদের মত হয়ে। সেই সব সাঁওতাল পরিবারের নিজেদেরও অনেক খেসারত দিতে হয়। দেখা যায় গুডরোবোঙ্গারা তাদের সন্তান খেয়ে ফেলছে। অর্থাৎ সন্তানের মৃত্যু হয়।

গুডরোবোঙ্গা নামের অপদেবতাদের দিয়ে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা অর্জনের কোনও ইচ্ছেই নেই মিজানের। শুধুই কৌতূহল। তার খুব ইচ্ছে নিজের চোখে একবারের জন্য হলেও গুডরোবোঙ্গা নামের বামন অপদেবতাদের দেখবে।

উরুর হাড়ের বাঁশিটা বাজিয়ে গুডরোবোঙ্গাদের ডেকে আনতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না মিজানের ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানি। এতে নাকি অনেক ধরনের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে। অনেক পীড়াপীড়ি করে হাতে-পায়ে ধরে ওস্তাদকে রাজি করিয়েছে মিজান।

আজ অমাবস্যার রাত। আজ রাতেই উরুর হাড়ের বাঁশিটা বাজিয়ে গুডরোবোঙ্গাদের ডেকে আনা হবে। সেই জন্যই মিজান বাড়ি থেকে খাসিটা চুরি করে এনেছে। খাসিটার প্রাণ নিয়ে গুডরোবোঙ্গারা তৃপ্ত হবে।

BanglaBook.org

তিন

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই মনু মিয়া ভীষণ চেঁচামেচি করছেন। হাবু তাঁর সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লাইলির বিয়ে উপলক্ষে কেনা তিনটা খাসির একটা চুরি হয়ে গেছে। মনু মিয়ার বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে নিয়ে যায় এত বড় বুকের পাটা কার?

মনু মিয়া আশপাশের বাড়ির বিভিন্ন জনকে সন্দেহ করছেন। আশপাশের বাড়ির লোকজন শুনতে পায়, গলার স্বর তেমন ভাবে উঁচু করে তিনি হুংকার দিচ্ছেন, 'কোন হারামির বাচ্চায় আমার খাসি চুরি করে নিছে? হারামির বাচ্চার মায়রে...হারামির বাচ্চারে ধরতে পারলে, হারামির বাচ্চার পুটকির ভিতরে পাঁচ হাত লম্বা কাঁচা বাঁশ ভরমু। বাঁশ যখন চেরতে-চেরতে ঢুকবে তহন বুঝবে মজা...চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার খাসি ফেরত না দিলে গ্রামসুদ্ধ সবাইকে জেলের ঘানি টানামু...'

অনর্গল বিভিন্ন আজেবাজে গালি-গালাজ করেই যাচ্ছেন মনু মিয়া।

মনু মিয়ার স্ত্রী আম্বিয়া বেগম এসে বললেন, 'অনেক গালি-গালাজ করছেন। এখন একটু থামেন। সামান্য একটা খাসিই তো চুরি গেছে। তাতে মানুষ এমন ষাঁড়ের মত চেঁচায় নাকি?'

আম্বিয়া বেগমের কথা শুনে মনু মিয়া যেন আরও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, 'আরে বজ্জাত মাগি, তুই বুঝবি কী? খাসিটা তো কেউ আমারে মাগনা দেয় নাই, নগদ টাকা দিয়া কিন্যা আনছি। টাকা তো আর ঘরে বইসা তুই মুরগির ডিম পাড়ার মত পাড়স না।'

মনু মিয়ার কথা শুনে আম্বিয়া বেগমের চোখে পানি এসে গেল। তিনি চোখ মুছতে-মুছতে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে; এই বয়সেও যদি ছেলে-মেয়ের সামনে অমন আজেবাজে কথা শুনতে হয়! না, আর সহ্য করা যায় না। তিনি আজকেই তাঁর বাপের বাড়ি চলে যাবেন। খাসি চুরি গেছে তাতে কী হয়েছে! পাঁঠাটা তো ঠিকই আছে। না, পাঁঠা

BanglaBook.org

বললেও ভুল হবে, ওই লোকটা পাঁঠার চেয়েও গোঁয়ার।

হাবু অস্ফুট স্বরে বলল, 'মামা, যে খাসি চুরি করে নিছে, সে কাইল সকালের মধ্যেই খাসি ফেরত দিয়ে যাবে।'

মনু মিয়া বললেন, 'হারামজাদা, তুই জানলি কী করে! যে হারামির বাচ্চায় খাসি চুরি করেছে সে কি তোর দুলাভাই?'

হাবু কিছু বলল না। সে মাথা নুইয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অধিকাংশ সময়ই হাবু এভাবে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সময় আম্বিয়া বেগম ঘর থেকে ব্যাগ হাতে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বেরিয়ে, ভাঙা গলায় বললেন, 'হাবু, আমারে একটা ভ্যান ডেকে দে তো। আমি আর এ-বাড়িতে থাকমু না।'

মনু মিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, 'কইলেই হইলো থাকবে না। যাবি কোতায়? বেশ্যা পাড়ায়? এই বয়সে বেশ্যা পাড়ায়ও তোর জায়গা হইবে না।'

আম্বিয়া বেগম ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'আপনার মত ইবলিশের সাথে ঘর করার চেয়ে বেশ্যা পাড়ায় যাওয়াও অনেক ভাল।'

'তা যেখানে খুশি যেতে পারো। তয় একটা কথা মনে রাখবা, এই বাড়ির উঠানের সীমানা পার হইলেই তুমি আর আমার বউ থাকবা না। আর তোমার পেটের পোলা-মাইয়া দুটারেও আমি আর আমার সন্তান হিসাবে স্বীকার করমু না। তহন তোমার পোলা-মাইয়া হইবে বাপের পরিচয়হীন জারজ...'

তুই-তোকারি থেকে এখন 'তুমি' সম্বোধন করছেন মনু মিয়া। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে কিছুটা হলেও তিনি এখন নরম হয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, আম্বিয়া বেগম ছাড়া তাঁর ঘর-সংসার অচল হয়ে যাবে। সত্যি সত্যি যদি আম্বিয়া বেগম চলে যান, তা হলে তাঁকে বিরাট মুসিবতে পড়তে হবে। যে শর্ত দিয়েছেন তাতে বোধহয় কাজ হবে, আম্বিয়া বেগম বাড়ি ছাড়বেন না।

মনু মিয়া শর্ত জুড়ে দিয়ে হনহন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর আম্বিয়া বেগম উঠানে দাঁড়িয়ে, হাত থেকে ব্যাগটা ফেলে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

হাবু ক্রন্দনরত আম্বিয়া বেগমের হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল।

BanglaBook.org

মিজান আছে মহা মুসিবতের মধ্যে। তার ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানি গতরাতে মারা গেছেন।

গতরাতে ওস্তাদ প্রতিদিনকার মতই দুধ, কলা, পাটালি গুড় দিয়ে তৃপ্তি সহকারে ভাঁত খেয়ে উঠলেন। ভাত খেয়ে ওঠার কিছুক্ষণ পর শুরু হলো মন্ত্রপূত উরুর হাড়ের বাঁশিটা বাজিয়ে গুডরোবোঙ্গাদের ডেকে আনার প্রস্তুতি।

ওস্তাদ গলায় শংকা নিয়ে আবার বললেন, 'গুডরোবোঙ্গাদের না ডাকলে হয় না? খুবই ভয়ঙ্কর কাজ। প্রাণহানী ঘটতে পারে।'

মিজান ওস্তাদের পা চেপে ধরে বলল, 'ওস্তাদ, এখন আর না করবেন না। সব জোগাড়যন্ত্র করা হয়ে গেছে। প্রাণহানী ঘটবে ক্যান? খাসিটা তয় আনছি কী করতে? প্রাণহানী ঘটবে তো খাসিটার। আমাগো ভয় কীসের?'

ওস্তাদ অনিচ্ছা সহকারে টিনের ট্রাংকের ভিতর থেকে উরুর হাড়ের বাঁশিটা বের করলেন। বিচ্ছিরি দেখতে বাঁশিটা। কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠল।

খাসিটার গলায় একটা লাল কাপড় পেঁচিয়ে, ঘরের বাইরে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হলো।

মেঝেতে পাটি বিছিয়ে, ঘর অন্ধকার করে, মিজান আর ওস্তাদ পদ্মাসন হয়ে বসল। তারা দুজনই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের গায়ে এক টুকরো সুতাও নেই।

ওস্তাদের হাতে বাঁশি। ওস্তাদ বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন। অন্ধকারের বুক চিরে বাঁশির সুর বেজে উঠল। অদ্ভুত একটা সুর! রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে সুরটায় গা শিরশির করতে লাগল। মনে হলো, এই সুরের সৃষ্টি আমাদের চেনা জগতে নয়, অন্ধকার জগতের কোনও অশুভ সুর।

অশুভ সুরটা বেজে চলছে। ধীরে-ধীরে তীব্র দুর্গন্ধে ভরে গেল চারপাশ। কেমন মাংস পচা গন্ধ। এমন গন্ধ পাওয়া যায় লাশ কাটা ঘরে।

ঘরের চারপাশে ছোট-ছোট পায়ের ধুপধাপ হুটোপুটির শব্দ খাসিটা তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। খাসিটার চিৎকার শুনে মনে হলো, অবোধ জন্তুটা কোনও কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।

হঠাৎ বাঁশির সুর থেমে গেল। শোনা গেল ওস্তাদের চাপা গোঙানির শব্দ। মিজান বুঝতে পারল ওস্তাদের কোনও সমস্যা হয়েছে। অন্ধকার ঘর। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলো জ্বালবার জন্য মিজান দেশলাই খুঁজে পাচ্ছে না। ওস্তাদের গোঙানির শব্দ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে। মিজান উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, 'ওস্তাদ, আপনার কী হইছে? কী হইছে, ওস্তাদ? আপনে ঠিক আছেন তো?'

ওস্তাদের মুখে কোনও জবাব নেই।

দেশলাই খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালাবার পর দেখা গেল, ওস্তাদ অচেতন অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে বের হচ্ছে টাটকা রক্ত। সেই রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর শরীর, মেঝেতে বিছানো, পুরানো জীর্ণ পাটিটা।

ওস্তাদের চেতনা আর ফিরল না। ওস্তাদ মারা গেলেন।

ঘরের চারপাশের হুটোপুটি থেমে গেল। থেমে গেল খাসিটার চিৎকারও। মুহূর্তে নীরবতা গিলে ফেলল চারপাশ।

মিজান বাইরে বেরিয়ে দেখল, খাসিটা দিব্যি ঠিক আছে। শুধু ভয়ে জড়সড় হয়ে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাণহানী হয়েছে ওস্তাদের।

মনু মিয়া বাড়িতে ফিরলেন রাতে। বেশ কয়েক ধরনের ফল নিয়ে এলেন। কমলা, আপেল, আঙুর, বেদানা...ফলগুলো আম্বিয়া বেগমের হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি ফল খেতে পছন্দ করো বলে ফল নিয়ে এলাম।'

আম্বিয়া বেগম ফল হাতে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সকালের ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনি মোটেও ভোলেননি।

মনু মিয়া গা ঘষে-ঘষে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করলেন। চাপ কল চেপে-চেপে পানি উঠিয়ে দিল হাবু।

গোসল সেরে খেতে বসলেন। যথারীতি মাদুর বিছিয়ে। সালুনের পদ তাঁর খুব পছন্দ হলো। ফলি মাছের কোপ্তা, বড় বড় কৈ মাছ মাখা মাখা করে রান্না আর সজনে ডাঁটার ডাল চচ্চড়ি।

প্রত্যেকটা পদই অত্যন্ত সুস্বাদু হয়েছে। না লবণ কম না বেশি, একেবারে ঠিক মত।

BanglaBook.org

মনু মিয়া খুবই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন সকালের ব্যবহারের জন্য আম্বিয়া বেগমের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে ভাল হত।

মনু মিয়ার খাওয়া শেষ হবার পর তাঁর সামনে থেকে এঁটো ভাতের থালা, সালুন-তরকারির বাটিগুলো, পানির জগ-গ্লাস এক এক করে সব সরাল হাবু। আর পানের পিক ফেলার জন্য একটা চিলুমচি এনে সামনে রাখল।

আম্বিয়া বেগম পান বানিয়ে দিলেন। মনু মিয়া পান মুখে দিলেন। তাঁর চেহারায় সুখী সুখী ভাব। আম্বিয়া বেগমের চেহারা থমথমে।

মনু মিয়া হাবুর দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বললেন, 'হাবু, এখন তুই এখান থেকে যা। তোর মামীর সাথে জরুরি আলাপ আছে।'

হাবু মাথা নুইয়ে চলে গেল।

মনু মিয়া আম্বিয়া বেগমের হাত ধরলেন। আম্বিয়া বেগম হাত সরিয়ে নিতে চাইলেন। মনু মিয়া হাত চেপে ধরে বললেন, 'আরে, হাত সরায় ক্যান? হাতের মাপ নিতেছি তো। ভাবছি কাইল তোমার জন্যে পাঁচ ভরি ওজনের একজোড়া চুড়ি বানাতে দিয়া আসমু।' জিভ দিয়ে মুখের পান নেড়েচেড়ে, 'ভাবছ চুড়ি তো তোমার আরও তিন-চার জোড়া আছে, আবার চুড়ি লাগবে কীসের? যার হাতের রান্নায় এত স্বাদ তার হাত ভর্তি থাকবে সোনার চুড়ি। সোনা দিয়া হাত মুড়াইয়া দিতে পারলে ভালা হইত।'

আম্বিয়া বেগম কিছুই বললেন না। তাঁর মুখ আগের মতই ভার হয়ে আছে।

মনু মিয়া আবার বললেন, 'শোন বউ, তুমি মনে করো আমি লোকটা খুবই খারাপ। সব সময় গালি-গালাজ করি, রাগারাগি করি, তোমাগো জন্য কোনও মায়া-দয়াই নাই আমার দিলে। আসলে সত্যটা কি জানো? এই বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা সবই তোমাগো জইন্যে। সারা দিন-রাইত এত কষ্ট করি তো তোমাগো জইন্যেই। তোমরা ছাড়া আমার আর আছে কে? আমি মইরা গেলে তো এই ধন-সম্পদ তোমরাই ভোগ করবা। দেখি আর এক খিলি পান দাও তো। জর্দা কম দিয়ো। ডাক্তার বলছে, হার্টের অবস্থা ভালা না।'

BanglaBook.org

আম্বিয়া বেগম নিঃশব্দে পান বানিয়ে দিলেন। মনু মিয়া পান মুখে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'মেয়ের বিয়া ভাইঙ্গা গেল! পান-চিনি হয়ে গেছে। বিয়ার দিনও ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ার বাজার-সদাইও করা হয়ে গেছে। লোকজন দাওয়াতও দিছি। এমন সময় মেয়ের বিয়া ভাইঙ্গা গেলে কোন্ বাপের মাথা ঠিক থাকে। তুমিই কও, ঠিক থাকে? লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে। আমি চিন্তায় মরি কিন্তু তুমি স্বাভাবিক। কও, মাইয়া কী আমার একলার? এই কারণেই মাথাটা এত দিন গরম ছিল। তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছি। কী কইতে কী কইছি, আমারে ক্ষমা কইর‍্যা দাও।'

মনু মিয়া আম্বিয়া বেগমের হাত চেপে ধরলেন। আম্বিয়া বেগম অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আইজ তয় মাথা ঠাণ্ডা হইল কীভাবে?'

মনু মিয়া হৃষ্টচিত্তে বললেন, 'আরে সেই কথাই তো তোমারে এখন বলমু। হারামজাদা উকিল গেছে তাতে কী হইছে, মনু মিয়ার মেয়ের জন্য কি ছেলের অভাব আছে? আর একটা সম্বন্ধ আসছে। ছেলে পটুয়াখালি থানার দারোগা। অত্যন্ত ভালা বংশের ছেলে। ছেলে দেখতে-শুনতেও সুন্দর। উঁচা-লাম্বা। গায়ের রং পরিষ্কার। কাইল সন্ধ্যায় লাইলিরে দেখতে আসব।'

আম্বিয়া বেগম আবার অস্ফুট স্বরে বললেন, 'এই বিয়াও ভেঙে যাবে।'

মনু মিয়া অবাক হয়ে বললেন, 'কী কও! বিয়া ভাইঙ্গা যাইব ক্যান?'

'যার বিয়া সে নিজেই যদি ভেঙে দেয়, সেই বিয়া টিকবে কীভাবে?'

'খোলাসা কইর‍্যা কও তো, যার বিয়া হেই ভাইঙ্গা দিব মানে?'

'লাইলিই ছেলে পক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বিয়া ভেঙে দেয়।'

মনু মিয়া বিস্ফারিত চোখে, 'ক্যান?'

'লাইলি একজনরে পছন্দ করে।'

'কও কী! হারামজাদি নিজে নিজে একজনরে পছন্দ করছে!!! শুয়ারের বাচ্চা কেডায়?'

আম্বিয়া বেগম চুপ করে রইলেন। মনু মিয়ার মাথা তেতে উঠছে। তিনি ধীরে ধীরে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন।

মনু মিয়া উত্তপ্ত গলায় বললেন, 'চুপ কইরা রইছো ক্যান? কও না ক্যান, হারামজাদি কোন্ শুয়ারের বাচ্চার প্রেমে পড়ছে?'

BanglaBook.org

'আপনেই মেয়েরে ডাক দিয়া জিগান।'

'আমি জিগামু মানে? তুমি জানো না? তাড়াতাড়ি কও। নাইলে কিন্তু এহনই ধুন্ধুমার কাণ্ড হইব!'

আম্বিয়া বেগম মুখ কাঁচুমাচু করে নিচু গলায় বললেন, 'আপনার মেয়ে হাবুরে পছন্দ করে।'

'কী কইলা! হারামজাদি বাড়ির কামলার সাথে পিরিত করে! হারামজাদিরে ঝুঁটি ধইরা এহনই বাড়ি থেইকা বাইর কইরা দিমু। তার আগে হাবু শুয়ারের বাচ্চারে জ্যান্ত মাটি দিমু। শুয়ারের বাচ্চায় ভাব ধরে কিচ্ছু বোঝে না।'

'হাবুর কোনও দোষ নাই। হাবু কিচ্ছু জানেও না। আপনার মেয়েই এক তরফা।'

'হারামজাদিরে ভাল ঘরে বিয়া দিতে চাই আর হারামজাদি! অরে ডাকো তো, এহনই ঝাড়ু দিয়া আচ্ছা মত কয়েকখান দিই। ঝাড়ুর বাড়ি খাইলেই সব পিরিত ভুইলা যাইবে।'

'লাইলির কাছে এক বোতল এনড্রিন আছে। আপনে এই ব্যাপার নিয়া বেশি বাড়াবাড়ি করলে, সে এনড্রিন খেয়ে আত্মহত্যা করবে।'

এনড্রিন, আত্মহত্যা–এ-সব শুনে মনু মিয়া নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেললেন। তিনি আম্বিয়া বেগমকে 'তুমি' থেকে 'তুই' সম্বোধনে নেমে গেলেন।

'ঘটনা এত দূর গড়াইছে! আর হারামজাদি মাগি তুই আমারে সবে মাত্র কও! তোরে আর তোর মাইয়্যারে এক সাথে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ি থেইকা বাইর কইরা দিমু। সোনার চুড়ি! সোনার চুড়ি তোর...তোর যত সোনার গয়না-টয়না আছে, কাইল সকালে সব আমার হাতে দিবি। সোনা-গয়না সব বেইচ্যা, তোর আর তোর মাইয়্যার জন্যে ডাণ্ডাবেড়ি কিন্যা আনমু।'

সারাদিন মিজানের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানিকে দাফন করা হয়েছে জঙ্গলের ভিতরে অনেক দিনের পুরানো পরিত্যক্ত একটা কবরস্থানে। ওস্তাদের কুঁড়ে ঘর থেকে কিছুটা দূরেই কবরস্থানটা।

BanglaBook.org

ওস্তাদকে দাফন-কাফন করতে সারাদিন অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছে মিজানের। এখন সে খুবই ক্লান্ত। রাত বারোটার মত বাজে। রাত দ্বিপ্রহরে তাকে আবার একটা বিশেষ কাজে নেমে পড়তে হবে। খুবই গোপন কাজ। এমন গোপন কাজ, যেন একটা কাক পক্ষীও টের না পায়।

মিজান খাসিটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল ভাত খাওয়ার জন্য আর খাসিটাকে যথাস্থানে রেখে আসতে। ভাত খাওয়া তার হলো না। তবে খাসিটাকে অতি সন্তর্পণে রেখে আসতে পেরেছে। খাসিটা নেবার সময় বাড়ির কেউ যেমন তাকে দেখেনি তেমন রেখে আসবার সময়ও কেউ দেখেনি। খাসিটাকে যে কাজের জন্য নিয়েছিল তা তো পূরণ হলোই না; মাঝখান থেকে ওস্তাদ মারা গেলেন।

আজ সারাদিনে মিজানের পেটে কিছু পড়েনি। খুবই ক্ষুধার্ত সে। ভাত খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন রাতে বাড়ি গিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে রান্নাঘরের দরজায় টুক-টুক করে মৃদু শব্দ করলেই তার মা আম্বিয়া বেগম দরজা খুলে তাকে ভাত খেতে দেন। খেয়ে-দেয়ে সে আবার কেটে পড়ে। কিন্তু আজ তার মা দরজা খুললেন না। দরজা খুলবেনই বা কী করে? তার বাবা মনু মিয়া আজ এখনও সজাগ। তার মায়ের সাথে গজর-গজর করছেন আর মাঝে মাঝে বিকট ভাবে হুংকার দিচ্ছেন।

মিজান জঙ্গলের মধ্যে তার ওস্তাদের কুঁড়ে ঘরে ফিরে এল। ঘরে সামান্য চিড়া-গুড় ছিল। চিড়া-গুড় মাখিয়ে খেয়ে নিল। কিছুটা হলেও পেটটা এখন শান্ত। সে মেঝেতে বিছানো পাটির উপরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। রাত দ্বিপ্রহরে আবার কাজে নেমে পড়বে। ওস্তাদের কবর খুঁড়ে কাফনের কাপড় চুরি করবে। কারণ লাশের গা থেকে চুরি করা কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাতে কালো বাঁশিটা বাজালে মৃত আত্মারা চলে আসবে। ওস্তাদের সাথে থেকে থেকে এত দিনে বাঁশি বাজানোটা সে ভালই আয়ত্ত করেছে। গুডরোবোঙ্গা ডেকে আনতে গিয়ে ওস্তাদ মারা গেছেন, এবার সে আত্মা ডাকবে। এর শেষ দেখে ছাড়বে। একবার যখন ঘোমটা খুলেছে, এখন ভাল ভাবেই খুলবে।

BanglaBook.org

চার

কাঁদতে কাঁদতে লাইলির চোখ-মুখ ফুলে গেছে।

গতরাতে, রাত তিনটার দিকে লাইলির বাবা মনু মিয়া, লাইলিকে চুল ধরে টেনে ঝাড়ু দিয়ে পেটাতে-পেটাতে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। লাইলি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সারা রাত ধরে কাঁদে। অত রাতে একলা মেয়ে মানুষ আর কোথায় যাবে! আর ঘরের ভিতরে তার বাবা সারা রাত ধরে তার মায়ের সাথে গজরান।

সকালে মনু মিয়া বাড়ি থেকে বের হবার পর আম্বিয়া বেগম এসে লাইলিকে ঘরে নেন। ঘরে ঢোকার পরও লাইলি ভীষণ কাঁদতে থাকে। আম্বিয়া বেগম বিভিন্ন ভাবে সান্ত্বনা দিতে চান মেয়েকে। কিন্তু কিছুতেই লাইলির কান্না থামে না।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় লাইলি ঘুমিয়ে পড়ে।

লাইলির ঘুম ভাঙে কুড়াল দিয়ে লাকড়ি কাটার শব্দে। লাইলি ঘরের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তার চুল আলুথালু, চোখ দুটো ফোলা-ফোলা লাল। জানালা দিয়ে সে বাড়ির উঠানের দিকে উদাস চোখে তাকায়। উঠানে হাবু একটা রেইন্ট্রি গাছের গুঁড়ি কুড়াল দিয়ে চিরে লাকড়ি করছে। আশপাশের কোনও কিছুর দিকে হাবুর কোনও খেয়াল নেই। সে যন্ত্রচালিত মানুষের মত লাকড়ি কাটায় ব্যস্ত।

হাবুর লাকড়ি কাটা দেখতে দেখতে লাইলির চোখ আবার ছলছল করে উঠল। ওই-মানুষটার জন্যই এত কাণ্ড ঘটে গেছে, কিন্তু মানুষটা নির্বিকার! মানুষটা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না! ওই-মানুষটাকে লাইলি যে কতটা ভালবাসে তা কী কোনও দিনও বুঝবে না মানুষটা? গতরাতে লাইলির বাবা লাইলিকে ওভাবে চুল ধরে টেনে, ঝাড়ু দিয়ে পেটাতে পেটাতে বাড়ি থেকে বের করে দেবার পরও লাইলি এখনও এ-বাড়িতে পড়ে আছে শুধু ওই-মানুষটার জন্য। মানুষটা বুঝুক আর নাই বুঝুক

BanglaBook.org

মানুষটাকে ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে না। ওই-মানুষটাকে সে পাগলের মত ভাল বাসে।

মানুষটা খালি গায়ে লাকড়ি কাটছে। ঘামে ভিজে উঠেছে মানুষটার সুঠাম ফর্সা দেহখানা। লাইলির খুব ইচ্ছে করছে, ছুটে গিয়ে মানুষটার গায়ের ঘাম তার ওড়না দিয়ে মুছে দিতে।

মনু মিয়া আজ পর্যন্ত কোনও দিনও কোনও কাজ ঠাণ্ডা মাথায় করতে পারেননি। গতরাতে লাইলিকে ওভাবে ঘর থেকে বের করে দেবার জন্য তাঁর নিজের উপর খুব রাগ লাগছে। আম্বিয়া বেগমের সাথে সারা রাত চিৎকার-চেঁচামেচি করাটাও ভুল হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে যা করবেন ঠাণ্ডা মাথায় করবেন। যেন সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।

লাইলির মাথা থেকে হাবুর আছর ছাড়াতে মনু মিয়া একটা নীল নকশা করেছেন। পরিকল্পনা মত কাজটা হলে উভয় দিকই রক্ষা পাবে। পরিকল্পনাটা মাথায় এসেছে ইটের ভাটায় পৌঁছানোর পর, ইটের ভাটার ম্যানেজার ইয়াকুবের পরামর্শে।

ইয়াকুব মনু মিয়ার ইটের ভাটায় অনেক দিন ধরে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে আসছে। মনু মিয়ার অত্যন্ত আস্থাভাজন লোক সে।

কূটবুদ্ধিতে তার মাথা ভর্তি। মনু মিয়া যে কোনও জটিল সমস্যায় পড়লে তার পরামর্শ নেন। তার পরামর্শে মনু মিয়া ব্যবসায় অনেক লাভবান হয়েছেন। তাই তার প্রতি মনু মিয়ার আস্থা আকাশ সমান।

ইয়াকুবের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মত। রোগা-পাতলা চেহারা। গড়পড়তা উচ্চতা। থুতনিতে এক গোছা ফিনফিনে ছাগুলে দাড়ি। ছোট ছোট চোখ। সেই চোখের মধ্যে সব সময় কূটবুদ্ধি খেলা করে। শিয়ালের মত ধূর্ত তার স্বভাব। তাই লোকজনের কাছে সে পাঁতিশিয়াল ইয়াকুব নামে পরিচিত। আর মহিলা মহলে সে পরিচিত শকুন ইয়াকুব নামে। কারণ সে নাকি মেয়ে লোকের বুকের দিকে শকুনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

মনু মিয়া লোক মারফত বাড়িতে আম্বিয়া বেগমের কাছে খবর পাঠিয়েছেন, আজ রাতে তিনি ফিরবেন না। ইটের ভাটায় অনেক কাজ। বিশ-ত্রিশ

BanglaBook.org

হাজার ইটের সরবরাহ দিতে হবে আজ রাতে। ট্রাকে-ট্রলারে বিরতিহীন ইটের চালান যাবে আজ রাতে। আরও পঞ্চাশ হাজার ইটের অর্ডার পেয়েছেন। অর্ডার মাফিক কয়েকশ' শ্রমিক নতুন ইট পোড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে ইটের ভাটায় খুবই সরগরম অবস্থা। ম্যানেজার ইয়াকুবের পক্ষে একা এত দিক সামলানো সম্ভব নয়।

যে লোক আম্বিয়া বেগমের কাছে মনু মিয়ার খবর নিয়ে এসেছে, তার কাছে মনু মিয়া দুটি হাঁস কিনে পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, রাতে হাঁসের মাংস আর চালের আটার রুটি খাবেন। মাংসে যেন ঝাল বেশি হয়। রাতে হাঁসের মাংস আর রুটি টিফিন ক্যারিয়ারে করে হাবুকে দিয়ে পাঠাতে। মাংস আর রুটির পরিমাণ যেন দুই জনে খাওয়ার মত হয়। কারণ তাঁর সাথে ম্যানেজার ইয়াকুবও খাবে।

রাত সাড়ে দশটা।

মনু মিয়া আর ইয়াকুব ইটের ভাটার পাশে মনু মিয়ার বিশ্রাম করার ছোট্ট ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে খেতে বসেছেন। তাঁদের খাবার পরিবেশন করছে হাবু।

ম্যানেজার ইয়াকুব চেহারায় পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে বলল, 'মিয়া ভাই, মাংসের স্বাদ জব্বর হইছে! হাঁসের মাংসের যে এত স্বাদ তা আগে জানতাম না!'

ইয়াকুব মনু মিয়াকে 'মিয়া ভাই' বলে সম্বোধন করে। মনু মিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে ইয়াকুবের কথায় সায় দিলেন, মনু মিয়ার মন আজ বেশ উদ্বিগ্ন। খুবই মারাত্মক একটা কাজ করতে যাচ্ছেন আজ রাতে, এ-নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

ইয়াকুব খেতে খেতে হাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাবু, তুই খেয়ে এসেছিস তো?'

হাবু ছোট্ট করে জবাব দিল, 'জি।'

'তোর চেহারা-সুরত তো মাশাল্লাহ বেশ ভালা হইছে! দেখলে মনে হয় কোনও ভালা ঘরের পোলা...' খেতে খেতে নিজের মনেই হাবুকে উদ্দেশ করে বলল ইয়াকুব।

BanglaBook.org

হাবুকে উদ্দেশ্য করে বলা ইয়াকুবের 'দেখলে মনে হয় কোনও ভালা ঘরের পোলা' কথাটা শুনে মনু মিয়ার মনে ভাবনা জাগল–কী আশ্চর্য ব্যাপার! এত দিন হয়ে গেল এখনও হাবুর কোনও পরিচয় তাঁরা জানেন না! হাবু কোত্থেকে এসেছে? কীভাবে এসেছে? কেমন ঘরের ছেলে? বাপ-মা আছে কি নাই? কিচ্ছু জানেন না তাঁরা!

মনু মিয়া আর ইয়াকুবের খাওয়া শেষ হবার পর হাবু পলিথিন কাগজে মোড়ানো দশ-বারোটি খিলি পান বের করে তাদের সামনে দেয়। খিলি বানানো এই পানও আম্বিয়া বেগম বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইয়াকুব এক সাথে দুই খিলি পান মুখে দিল। পান চিবাতে চিবাতে হাবুকে বলল, 'হাবু, তুই তোর মনিবকে কতটা ভালবাসিস? তোর মনিবের জন্য তুই কী কী করতে পারবি?'

হাবু ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। সে প্রশ্নের মানে বুঝতে পারল না।

'বুঝতে পারছিস না? মিয়া ভাই-ই তো তোর মনিব, মিয়া ভাই বললে তুই কী কী করতে পারবি?'

'উনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

'সাবাশ! তোর মনিব একটা বিরাট বিপদে পড়ছেন। এই বিপদ থাইকা একমাত্র তুই-ই পারোস উদ্ধার করতে।'

'কী বিপদ?'

'কী বিপদ তোর জানার দরকার নাই। উদ্ধার করবি কিনা বল?'

'করমু।'

এতক্ষণ মনু মিয়া চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'ইয়াকুব, হাবুর সাথে এত কিছু বলার কী দরকার?'

'না, মানে, মিয়া ভাই, কথা বলে ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে নেই।'

মধ্য রাতের দিকে ইট ভাটার সমস্ত শ্রমিকরা ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু মনু মিয়া, ইয়াকুব আর তাদের একান্ত অনুগত চার পাঁচজন ষণ্ডা প্রকৃতির শ্রমিক জেগে রইল। তারা সবাই মিলে হাবুর হাত-পা বেঁধে, মুখের ভিতরে গামছা গুঁজে দিয়ে, ইটের ভাটার গনগনে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। মুখের ভিতরে

BanglaBook.org

গামছা গোঁজা থাকার কারণে হাবু টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। অবশ্য মুখ খোলা থাকলেও হাবু কোনও শব্দ করত না। সে তার মনিবের জন্য সবই করতে পারে। গনগনে আগুনের মধ্যে ফেলার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে শুধু তার মনিবের দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল।

পাঁচ

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

কালো বাঁশিটা বাজিয়ে আত্মা ডেকে আনার সমস্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে মিজানের।

আধো আলো আধো অন্ধকার ঘরে মিজান লাশের গা থেকে চুরি করে আনা কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়ে বসেছে। এই কাফনের কাপড়টা সে চুরি করেছে তার ওস্তাদ চান্দ শাহ দেওয়ানির কবর থেকে।

গায়ে আতর, লোবান, কর্পূর মেখেছে। ঘরের চারকোনায় জ্বলছে আগরবাতি। সারা ঘরে ছিটানো হয়েছে গোলাপজল। আতর, লোবান, কর্পূর, আগরবাতি, গোলাপজল সব কিছুর মিশ্র গন্ধে ভরে গেছে সমস্ত ঘর। মিজানের কাছে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সে যেন একটা শব। আর এই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা যেন একটা কবর।

মিজানের সামনে ঘি আর করঞ্জা তেলের মিশ্রণে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের মৃদু আলোতে তার মুখ থমথম করছে। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা চারদিকে। নিস্তব্ধতাকে ভেঙে মিজানের হাতের কালো বাঁশিটা বেজে উঠল। কেমন গা ছমছমানো সুর! যেন অপঘাতে মরে যাওয়া অতৃপ্ত আত্মার মাতম! সুরটা কখনও তীব্র হচ্ছে কখনও ক্ষীণ।

ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠল। মাটির প্রদীপের আলো দপদপ করতে লাগল। সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ল একটা অস্বস্তিকর তীব্র গন্ধ। ঘরের চার কোনায় জ্বালানো আগরবাতির ধোঁয়া একত্রে মিলিত হয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে যেন একটা মুখাবয়বের রূপ নিতে চাইছে।

BanglaBook.org

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল মাটির প্রদীপটা। জমাট অন্ধকারে ডুবে গেল সমস্ত ঘর। মৃদু গোঙানির শব্দ। কেউ যেন তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। মিজান বাঁশি বাজানো থামিয়ে, ভীত গলায় অন্ধকারে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কে?'

শ্লেষ্মা জড়ানো অস্ফুট গলার স্বর। গলা দিয়ে স্বরটা যেন বেরুতেই চাইছে না। অনেক কষ্টে ভাঙা ভাঙা ভাবে, 'আ...মি...আমি...এ... সে...ছি...ক...ষ...টো...খু...উ...ব...কষ্ট...'

গলার স্বরটা শুনেই মিজান বুঝতে পারল, এ কার গলার স্বর। খুবই পরিচিত গলার স্বর। এর পরেও মিজান জিজ্ঞেস করল, 'আপনে কেডা? আপনেরে দেখতে চাই।'

আবার গলার স্বরটা ভাঙা-ভাঙা ভাবে বলল, 'আমি চান্দ শাহ দেওয়ানির আত্মা। আত্মাদের কেউ দেখতে পায় না। আত্মারা অশরীরী। কী জানতে চাস জলদি বল। জীবিত মানুষের সাথে আত্মাদের যোগাযোগ করা খুব কষ্টকর। খুউব কষ্ট!'

মিজান ভয় এবং উত্তেজনা মিশ্রিত গলায় বলল, 'ওস্তাদ, আপনে?! আপনে এসেছেন, ওস্তাদ!'

অশরীরীর গলার স্বর, 'আমি এখন কারও ওস্তাদ নই। শুধুই আত্মা। আত্মারা ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আত্মারা কারও ওস্তাদ হতে পারে না।'

মিজান কাঁপা গলায় বলল, 'আত্মা কী?'

'জীবিত প্রাণীর দেহের মধ্যে যে অদৃশ্য সত্তা বিরাজমান থাকে সেটাই আত্মা। সেই সত্তা যখন দেহত্যাগ করে তখন নিথর দেহটা হয় লাশ, শব, বা মৃতদেহ। দেহের কোনও মূল্যই নেই। আত্মাবিহীন দেহ পচে-গলে নষ্ট হয়ে যায়। দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর।'

'ওস্তাদ, আপনে সেদিন গুডরোবোঙ্গাদের ডাকতে গিয়া বাঁশি বাজাতে বাজাতে ক্যান মইরা গেলেন?'

'আমি সেদিন এমনিতে মারা যাইনি। গুডরোবোঙ্গারা এসেছিল। তারাই আমার দেহ থেকে আত্মা ছিনিয়ে নেয়।'

'এমনডা হবার তো কতা ছিলো না। ঘরের বাইরে একটা খাসি বান্ধা ছিল। গুডরোবোঙ্গারা খাসিটার আত্মা না নিয়া আপনের আত্মা ক্যান নিল?'

'তোর বাবার কারণে। তোর বাবার বশে অতি ক্ষমতাবান এক

BanglaBook.org

গুডরোবোঙ্গা ছিল। সেই ক্ষমতাবান গুডরোবোঙ্গার নির্দেশে সেদিন রাতে আসা গুডরোবোঙ্গারা খাসিটাকে না মেরে আমাকে মেরে ফেলে। যেহেতু খাসিটা ছিল তোর বাবার, তাই তোর বাবার কোনও ক্ষতি হতে দেয়নি সেই ক্ষমতাধর গুডরোবোঙ্গা।'

'কী কন, ওস্তাদ। আব্বার বশে গুডরোবোঙ্গা আইবে কোত্থেকে?'

'তোর তখন বয়স দশ-এগারো। তখন তোর বাবা মনু মিয়াকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে দেখা হওয়া এক নাগা সন্ন্যাসী, কুচকুচে কালো রঙের পাথর বসানো অষ্টধাতুর একটা আংটি দিয়ে বলেছিলেন, আংটিটা ডান হাতের মধ্যমায় ব্যবহার করতে। আংটিটা যতদিন সঙ্গে থাকবে তত দিন তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না, কোনও অমঙ্গল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না, যেই কাজে হাত দেবে সেই কাজেই সফলতা পাবে...'

অশরীরী ওস্তাদের কথা শেষ করতে না দিয়েই মিজান বলল, 'হ্যাঁ, আব্বার হাতে এহনও আংটিটা আছে। তিনি আংটিটা সব সময় অতি যত্নে রাখেন। কখনও হাত ছাড়া করেন না। ওই আংটিটা পরার পর থেকেই আব্বার ব্যবসাপাতির অনেক উন্নতি হয়।'

'তোর বাবার ব্যবসাপাতির উন্নতি ঘটেছে সেটাই শুধু চোখে পড়ল, এটা চোখে পড়ল না–সেই আংটি ব্যবহারের কিছু দিনের মধ্যেই তোদের বাড়িতে দশ-এগারো বছর বয়সী পরিচয়হীন অদ্ভুত একটা ছেলে এসে উঠল। পরবর্তীতে তোর মা ছেলেটার নাম রাখল হাবু। হাবু মানুষ নয়। হাবু অতি ক্ষমতাবান এক গুডরোবোঙ্গা। হাবুকে আংটির ওই কালো পাথরটার মধ্যে বন্দি করেছিল সেই নাগা সন্ন্যাসী।'

'হাবু তো এখনও আমাদের বাড়িতে আছে।'

'না, হাবু আর এখন নেই। তোর বাবার হাতের কালো পাথরটাও এখন আর কালো নেই। আজ রাতে হাবুকে তোর বাবা ইটের ভাটার আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। বশে থাকা গুডরোবোঙ্গাকে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। তবে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অন্যান্য গুডরোবোঙ্গারা আসবে। তারা তোদের পরিবারের প্রত্যেকের উপরে চড়াও হবে। তোদেরকে ধ্বংস করে দেবে।'

'কী কন, ওস্তাদ!!!'

'হ্যাঁ, আজ থেকে তোর বাবার জীবনে, তোদের সকলের জীবনে একের

BanglaBook.org

পর এক দুর্ভোগ নেমে আসবে। এমনকী তোদের সকলের প্রাণহানীও ঘটতে পারে।'

'এ থেকে রক্ষার কোনও উপায় কি নাই?'

'প্রাণ রক্ষার একটা উপায় আছে। তবে সেটা বলতে পারি একটা শর্তে।'

'কী শর্ত?'

'আমাকে কথা দিতে হবে, আজ থেকে তুই আর কোনও দিনও কালো জাদুর চর্চা করবি না। কালো জাদুর চর্চা করা ভাল নয়। এতে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পিশাচ হয়ে যায়। আত্মা ডেকে আনার বাঁশি, গুডরোবোঙ্গা ডেকে আনার বাঁশি, জিন-পরী ডেকে আনার বাঁশি...আর কোনও দিনও বাজাবি না। বাঁশিগুলো এবং তোর গায়ে থাকা আমার কাফনের কাপড়, সব কিছু আমার কবরের ভিতরে পুঁতে ফেলবি।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ, আইজ থেকে আমি আর কালা জাদুর চর্চা করমু না। আপনের শর্ত মোতাবেকই সব কিছু আপনের কবরে পুঁতে ফেলমু। এহন প্রাণ রক্ষার উপায়ডা কন।'

'সঙ্গে সব সময় কাঁচা রসুন আর কিছু সরিষা রাখবি। কাঁচা রসুন আর সরিষার গন্ধ ভূত-প্রেত, জিন-পরী, অপদেবতারা সহ্য করতে পারে না।'

ছয়

মনু মিয়ার ডান হাতের মধ্যমায় এতদিন ধরে ব্যবহার করে আসা আংটিটার কালো পাথরটা হঠাৎ করে রং পরিবর্তন করে ধূসর রং ধারণ করেছে। পাথরটার রঙ পরিবর্তনের সাথে সাথে যেন মনু মিয়ার ভাগ্যও পরিবর্তন হয়ে গেছে। একের পর এক দুর্ঘটনায় জর্জরিত তিনি এখন।

মনু মিয়ার ইটের ভাটার চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে পাঁচজন শ্রমিক মারা পড়েছে। গ্রামের বাজারের ভিতরের সিনেমা হলটায় আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়েছে। কাঠ চেরাইয়ের সমিলে ইলেকট্রিক করাত ছিঁড়ে ছিটকে পড়ে

BanglaBook.org

তিনজন শ্রমিক আহত হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক। এক রাতের ঝড়ে পেয়ারা বাগানটা ভেঙেচুরে তছনছ হয়েছে। অথচ তাঁর পেয়ারা বাগানের আশপাশের অন্যান্য বাগানগুলোর তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কী কারণে যেন মাছের ঘেরগুলোর সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে। পটুয়াখালি শহরের কসমেটিকস্-এর দোকানটায়ও আগুন লেগেছে।

বিভিন্ন দুর্ঘটনার খবর শুনতে শুনতে মনু মিয়ার মেজাজ আজকাল আরও তিরিক্ষি হয়েছে। তিনি সারাক্ষণ সবাইকে গালি-গালাজ করেন।

এক মাস কেটে যাবার পরও যখন হাবু আর ফিরে আসে না তখন লাইলি নিশ্চিত হয়ে যায়, হাবুকে তার বাবা মেরে ফেলেছেন। হাবু আর ফিরবে না। হাবুকে ছাড়া লাইলি বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায় না। ভালবাসার মানুষকে হারানোর এক বুক কষ্ট নিয়ে লাইলির কাছে এই পৃথিবী অসহ্য লাগতে থাকে। সারা দিন-রাত সে কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসায়।

হাবুর ব্যাপারে আম্বিয়া বেগম, মনু মিয়ার কাছে জানতে চাইলে, তিনি জানান, সেদিন রাতে ইটের ভাটায় হাবু হাঁসের মাংস আর চালের আটার রুটি নিয়ে যায়-ই-নি। হারামজাদার অপেক্ষায় তাঁদের সারা রাত উপোস থাকতে হয়। বাড়িতে আলমারির ভিতরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল, সেই টাকা গায়েব। হাবু সেই টাকা চুরি করে পালিয়েছে। এত দিন খাইয়ে-পরিয়ে একটা চোর পুষেছেন! ফের যদি আম্বিয়া বেগম চোরটার কথা মুখে আনেন, তা হলে তাকে টাটকা বিষ্ঠা খাইয়ে দেবেন। থুঃ করে মুখ থেকে উগরে ফেলে দিতে চাইলে, মুখ চেপে ধরবেন। তখন কোঁৎ করে গিলে ফেলা ছাড়া উপায় থাকবে না।

লাইলি বুঝতে পারে, হাবু সম্পর্কে তার বাবা যা বলছেন, সবই মিথ্যে বানোয়াট। হাবু কোনও দিনও টাকা চুরি করে পালাতে পারে না। তার বাবা হাবুকে মেরে ফেলে মিথ্যে অজুহাত দাঁড় করিয়েছেন।

ভালবাসার মানুষকে হারানোর এক বুক কষ্ট আর জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে অভিমানী লাইলি শেষ পর্যন্ত এনড্রিন খেয়ে আত্মহত্যা করল।

চারদিকে ব্যবসায়িক বিপর্যয়, এরই মধ্যে মেয়ের মৃত্যুতে মনু মিয়া

BanglaBook.org

একেবারে ভেঙে পড়েন। মেয়ের মৃত্যু শোক সামলাতে না সামলাতে তিনি জানতে পারেন, বসত ভিটাটা ছাড়া তাঁর সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সহায়-সম্পত্তি সব ম্যানেজার ইয়াকুব নিজের নামে করে নিয়েছে। খবরটা শোনার পরই তিনি হার্ট অ্যাটাক করেন।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে মনু মিয়া দেখতে পান, ভয়ঙ্কর চেহারার চার-পাঁচটা বামন তাঁর বুকের উপর চেপে বসেছে। বামনগুলোর চোখ আগুনের গোলার মত গনগনে। সমস্ত মুখের চামড়া কুঁচকানো ভাঁজ-ভাঁজ। নাকের স্থানে থ্যাবড়ানো মাংস পিণ্ড। বামনগুলো কিচকিচ করে দাঁত বের করে হাসছে। বামনগুলোর মুখের ভিতরে কাঁচির আলের মত তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি আর কুচকুচে কালো রঙের লকলকে জিভ। শেষ মুহূর্তে লকলকে লম্বা জিভগুলো মনু মিয়ার গলা পেঁচিয়ে ধরে। মনু মিয়ার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট

গ্রামের বাজারে মিজান একটা ছোট্ট দোকান দিয়েছে। তার দোকানে চা, পান, সিগারেট, বিড়ি এই সব পাওয়া যায়। এই দোকানের আয় দিয়েই তাদের সংসার চলে। সংসারে তারা দু'জন মাত্র মানুষ। তার মা আম্বিয়া বেগম আর সে।

মনু মিয়া আর লাইলির মৃত্যুর পর থেকে আম্বিয়া বেগমের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তিনি একা হলেই দেখতে পান, তাঁর চারপাশে কতগুলো ভয়ঙ্কর চেহারার বামন ছোটাছুটি করে। বামনগুলো হঠাৎ হঠাৎ রূপ পরিবর্তন করে কখনও তাঁর মৃত স্বামী মনু মিয়ার রূপ ধারণ করে, কখনও আবার মৃত মেয়ে লাইলির, কখনও হাবুর।

মিজান তার নিজের সাথে সব সময় কাঁচা রসুন আর সরিষা রাখে। তার বাড়ির সর্বত্রই রসুনের কোয়া আর সরিষা ছড়ানো-ছিটানো। এমনকী বিছানার তোশক-বালিশের নীচেও। তার মায়ের সাথেও সব সময় রসুন আর সরিষা রাখতে বলে। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ মা তা মেনে চলেন না। মিজান জানে, বাড়ির সর্বত্র রসুন আর সরিষা ছিটানো রয়েছে বলে এখন পর্যন্ত গুডরোবোঙ্গারা তার মাকে মেরে ফেলতে পারেনি। দূর থেকে বিভিন্ন ভেলকি দেখায়। যেদিন তার মাকে ঠিক মত বাগে পাবে সেদিনই মেরে

BanglaBook.org

ফেলবে। তাদের পরিবারের কাউকেই আর বাঁচতে দেবে না গুডরোবোঙ্গারা।

অনেক রাতে মিজান যখন দোকান বন্ধ করে একা একা বাড়িতে ফেরে তখন সে-ও পথের মাঝে দেখতে পায়, তার থেকে কিছুটা দূরে-দূরে কতগুলো ভয়ঙ্কর চেহারার বামন চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়। একদিন কৌতূহল বশত যে গুডরোবোঙ্গাদের দেখার জন্য তার ওস্তাদ চান্দ শাহ্ দেওয়ানির হাত-পা ধরে, মানুষের ঊরুর হাড়ের তৈরি মন্ত্রপূত বাঁশিটা বাজাতে রাজি করেছিল, আজ সেই গুডরোবোঙ্গারাই তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তার প্রতিটা মুহূর্ত এখন কাটে গুডরোবোঙ্গাদের ভয়ে তটস্থ হয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লাশের সঙ্গে বাস

এক

আগামীকাল রুবির বিয়ে।

বিয়ে উপলক্ষে রুবিদের বাড়ি ভর্তি আত্মীয়-স্বজন।

রুবির বড় ফুপু এসেছেন পনেরো দিন আগেই। সাথে তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। মেয়েদের নাম–টুম্পা-রুম্পা। টুম্পা-রুম্পা একে অপরের চেয়ে দুই বছরের ছোট-বড়। টুম্পা বড়, রুম্পা ছোট। কিন্তু দুজনই একই ক্লাসে পড়ে। ক্লাস টেনে। তারা দু'জন যে শুধু একই ক্লাসে পড়ে তাই নয়, তাদের দু'জনার মধ্যে আরও অনেক মিল রয়েছে। দু'জনের চেহারার মাঝে শতকরা আশি ভাগ মিল। দু'জন একই সমান লম্বা। দু'জনের গায়ের রংই উজ্জ্বল ফর্সা। দু'জনের চেহারাই নাদুসনুদুস। দু'জনের চুলের স্টাইলও একই। এমনকী দু'জন পোশাক পরেও একই ডিজাইনের, একই রঙের। তাদের দু'জনকে এক সাথে দেখে অনেকেই ভুল করে মনে করে–তারা যমজ।

টুম্পা-রুম্পা একে অপরের ছায়া। একজনকে ছাড়া অন্যজন থাকতে পারে না। একজন যেখানে অপরজনও সেখানে। খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাঘুরি, আড্ডা, স্কুলে যাওয়া সবখানেই দু'জন এক সাথে। এমনকী বাথরুমে গোসল করতেও ঢোকে দু'জন এক সাথে। তবু ভাল টয়লেট করতে দু'জন এক সাথে যায় না। একজন টয়লেটে ঢুকলে অপরজন টয়লেটের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। একজনের অসুখ করলে অন্যজনও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দু'জনের মধ্যে তেমন কথাবার্তা হতে দেখা যায় না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে দু'জন এক সাথে ঘোরাঘুরি করে। দেখলে মনে হয়–একে অপরের সাথে অভিমান করেছে।

BanglaBook.org

রুবির মেঝ মামা-মামী এসেছেন তিন দিন আগে। সঙ্গে তাঁদের একমাত্র গুণধর পুত্র রাজিবকেও নিয়ে এসেছেন।

রাজিব এস.এস.সিতে পর পর দুইবার ফেল করার পরে এবারও তৃতীয়বারের মত পরীক্ষা যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। মনে হয় এবারেও সে যুদ্ধে পরাজিত হবে। অত্যন্ত রোগা-পাতলা হ্যাংলা বকের মত লম্বা সে। গায়ের রং কালো। শুকনো আমসির মত মুখখানা। ভি আকৃতির সুচাল চোয়াল বেরিয়ে গেছে। গলার কণ্ঠা হাড় কুৎসিতভাবে দেখা যায়। বাম কান মেয়েদের মত ফোঁড়ানো। রিং পরা। পছন্দের পোশাক টাইট জিন্স প্যান্ট আর টকটকে লাল, হলুদ বা কমলা রঙের শর্ট শার্ট। যে শার্ট গায়ের মাপের চেয়ে খানিকটা ছোট। আর জিন্স প্যান্টের হাঁটুর উপরে, পিছনে পাছার উপরে গোটা কয়েক তাপ্পি মারা। দু-কানে হেড ফোন লাগিয়ে অধিকাংশ সময়ই তাকে গান শুনতে দেখা যায়। পড়া গেছে থমকে/দাদু গেছে চমকে...খোকাবাবু যায়/লাল জুতো পায়/বড় বড় দিদিরা সব উঁকি মেরে চায়... এই ধরনের গান তার পছন্দের তালিকায়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে–তিন দিন আগে রাজিবরা আসার পর থেকেই টুম্পা-রুম্পা দু-বোন সারাক্ষণ রাজিবের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। দেখে মনে হচ্ছে–টুম্পা-রুম্পা দু-বোনই রাজিবের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

রুবির ছোট ফুপু এসেছেন আজই। সাথে তাঁর আট বছরের ছেলে রিফাত। রিফাত এমন এক চিজ যাকে বিচ্ছু না বলে, বিচ্ছুদের দাদা বলা যায়। বাড়িতে ঢোকার পরই প্রথম সে যে অপকর্মটা করেছে তা হলো–বারান্দার টবের একটা ফুল গাছের গোড়ায় প্রস্রাব করে ভাসিয়ে দেয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, ফুল গাছটার গোড়া শুকনো ছিল বলে পানি দিয়েছে। দ্বিতীয় অপকর্ম–বাড়ির পোষা বিড়ালটাকে ধরে পুকুরে ছুঁড়ে মেরেছে। তৃতীয় অপকর্ম–রুবির বাবার আতরের শিশির সমস্ত আতর বড় এক হাঁড়ি ভাতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে। হাদীসের বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নৌকা বানানো, রুবির মায়ের নতুন শাড়ি কাঁচি দিয়ে কেটে কুটিকুটি করা, টবের সমস্ত ফুল গাছের পাতা ছিঁড়ে ন্যাড়া করা, টুম্পা-রুম্পার গায়ে তেলাপোকা ধরে এনে ছেড়ে দেওয়া, রাজিবের তাপ্পি মারা প্যান্টের পাছায় চুইংগাম লাগিয়ে দেওয়া, পাশের বাড়ির এক ছেলের মাথায় ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়ে

BanglaBook.org

দেওয়া...আসার পর অবধি একটুও সুস্থির নেই। তবে মাঝে মাঝে সে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। বোধহয় সেই মুহূর্তে সে ভেবে বের করে–পরবর্তী মিশন কী হবে। রিফাতের গম্ভীর হয়ে বসে থাকার এক মুহূর্তে রুবির বাবা সালাম সাহেব, রিফাতের পাশে গিয়ে বসে বললেন, 'এই তো রিফাত সোনা কী শান্ত হয়ে বসে আছে! কে বলেছে রিফাত দুষ্ট!' অমনি রিফাত সালাম সাহেবের মুখে এক দলা থুথু মেরে দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যার পরে এলেন রুবির ছোট মামা হেমায়েত উদ্দিন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। অবিবাহিত। তিনি ঘোষণা করেছেন–কখনোই তিনি আর বিয়ে করবেন না। চিরকুমার থাকবেন। ভ্যাগাবণ্ড টাইপের লোক। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি কুট্টি নামে পরিচিত। ছোট-খাটো রোগা-পাতলা বলেই হয়তো কুট্টি নামকরণ করা হয়েছে। রুবিরা ডাকে কুট্টি মামা বলে। কুট্টি মামা নিজেকে ত্যাগী পুরুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। তাঁর মতে পৃথিবীর মানুষ হচ্ছে দুই ধরনের। ভোগী মানুষ–ত্যাগী মানুষ। বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে ভোগী। মানুষ মাত্রই ভোগ, বিলাস, আয়েশ। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ত্যাগ করার জন্য জন্ম নেন। সমস্ত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দকে তাঁরা ত্যাগ করেন। যেমন–মহাপুরুষরা। মহাপুরুষ-টুরুষের চল এখন উঠে গেছে, এখন হচ্ছে ত্যাগী পুরুষের চল। কুট্টি মামাও নিজেকে আপাদমস্তক একজন ত্যাগী পুরুষ হিসেবে ভাবেন।

বাড়িতে ঢোকার পর বসার ঘরে কুট্টি মামা প্রথমেই মুখোমুখি হন রুবির বাবা সালাম সাহেবের।

কুট্টি মামা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, 'আরে, দুলাভাই, ফুলে-ফেঁপে তো একেবারে গাছের গুঁড়ির মত মোটা হয়েছেন!'

সালাম সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে, 'তা কেমন আছ? দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই আছ, কারণ আগের চেয়েও বান্দরের চেহারার সাথে তোমার চেহারার মিল অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে।'

কুট্টি মামা এক গাল হেসে বললেন, 'তা যা বলেছেন, দুলাভাই; একেবারে মন্দ বলেননি। এখন তো এই চেহারারই যুগ। দেখেন না বোম্বের সমস্ত নায়ক-নায়িকাই আমার মত রোগা-পাতলা।'

'তা নিজেকে কি তুমি আবার বোম্বের নায়ক ভাব নাকি! ভুলেও এমনটা

BanglaBook.org

ভেবো না। তোমাকে যদি বোম্বের নায়কদের মত লাগে, তা হলে জঙ্গলের সমস্ত বানর-মুখপোড়া হনুমান কিন্তু বোম্বে গিয়ে উঠবে, বোম্বের সিনেমার নায়ক-নায়িকা হবার জন্যে।'

'দুলাভাই, আর ঠাট্টা-মশকরা নয়। আপনি কিন্তু সত্যি সত্যিই অনেক মোটা হয়েছেন। দিন দিন গ্যাস বেলুনের মত ফুলেই যাচ্ছেন। একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুন। ত্যাগ করতে শিখুন। আরাম আয়েশ, আহার-নিদ্রা যতটা সম্ভব ত্যাগ করুন। ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।'

'ত্যাগ তো প্রতিদিনই করছি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই টয়লেটে ছুটে যাই ত্যাগ করার জন্যে। ত্যাগ করে যথেষ্ট সুখও পাই। তা তুমি এত বড় একজন ত্যাগী পুরুষ হয়ে ভাগ্নির বিয়েতে এলে! বিয়ে বাড়ি মানেই তো আমোদ-ফুর্তি, ভাল ভাল খাওয়া-দাওয়া।'

'একবার ভেবেছিলাম আসব না। এক লোককে একটা কিডনি দান করার কথা ছিল। পরে ভেবে দেখলাম—ভাগ্নির বিয়েতে উপস্থিত থাকাটাও এক ধরনের ত্যাগ। তাই কিডনি দানের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে চলে এলাম।'

সালাম সাহেব আর কুট্টি মামার কথাবার্তার এক পর্যায়ে রিফাত এসে এক মুঠ ছাই কুট্টি মামার চোখে-মুখে ছুঁড়ে মেরে দৌড়ে পালায়।

দুই

শেষ রাতের দিকে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে রুবির ঘুম ভেঙে গেল।

বিয়ের আগের রাতে কোনও মেয়ের চোখেই সহজে ঘুম আসে না। রুবির চোখেও আসছিল না। বিভিন্ন আকাশ-পাতাল চিন্তা-ভাবনা এসে ভর করছিল মাথায়। বোধহয় সব মেয়েরাই বিয়ের আগের রাতে এমন চিন্তা-ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। একাকী স্বাধীন জীবনটা অন্য একটা মানুষের সাথে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে যাবে। নিজের খেয়াল-খুশি বন্দি হবে অন্য একজনের মর্জির উপরে। নিজের একান্ত চেনা বিছানাটা আর নিজের থাকবে না। ইচ্ছে হলেই হাত-পা ছড়িয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে ঘুমানো যাবে না।

BanglaBook.org

ঘুমের মাঝেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নয়তো বা পাশের লোকটা যদি জেগে উঠে কুৎসিত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে অথবা স্বামী নামক পুরুষটার গায়ে যদি পা লেগে যায়, সেই ভাবনায় সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হবে। ইচ্ছে হলেই গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে ভাবা যাবে না রাস্তার মোড়ে ক্ষণিক দেখা হওয়া কোনও সুদর্শন যুবকের কথা বা কল্পনার রাজ্যে বাস করা কোনও স্বপ্ন পুরুষের কথা। আচ্ছা, যে লোকটার সাথে বিয়ে হবে সে লোকটা কেমন? সে কি ভাল মনের মানুষ? সে কি সৎচরিত্রের অধিকারী? সে কি ভালবাসতে জানে? সে কি ভালবাসা বোঝে? ?...?...?...?

এত শত উত্তেজিত ভাবনা, বাড়ি ভর্তি আত্মীয়-স্বজনদের গমগমে ভাব, তার উপরে টুম্পা-রুম্পা শুয়েছে রুবির সাথে। সব মিলিয়ে রুবির চোখে একটুও ঘুম আসছিল না। শত চেষ্টার পরে শেষ রাতের দিকে যখনই একটু তন্দ্রার মত হলো তখনই সে দুঃস্বপ্নটা দেখল।

স্বপ্নে দেখল–রুবি যেন ফাঁকাফাঁকা ভাবে গাছগাছালিতে ঘেরা একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। আকাশ ঢেকে আছে কালো মেঘে। একটু পরপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর থেমে থেমে বিকট শব্দে মেঘের গর্জন। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। একটু পরেই তুমুল বেগে বৃষ্টি নামবে।

বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে চারপাশটা দেখতে দেখতে এক সময় রুবি বুঝতে পারল–এই জায়গাটা হচ্ছে একটা পুরানো কবরস্থান। চারদিকে অনেক কবর। পুরানো কবর বলে বেশিরভাগ কবরের মাটিই দেবে সমান হয়ে গেছে। আর গাছগাছালিগুলো হচ্ছে একেকটা কবরের মাথার কাছে লাগানো গাছ। ভয়ে রুবির গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। এ কোথায় এসেছে সে!!! ভীত পায়ে রুবি একটু-একটু করে এগোতে থাকে। বৃষ্টি নামার আগে কোনও নিরাপদ স্থানে যেতে হবে। চারদিকে শুধু কবর আর কবর। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর রুবির চোখে পড়ে একটা নতুন কবর। সদ্য মাটি দেওয়া হয়েছে এমন নতুন কবর। কী এক অমোঘ আকর্ষণের টানে রুবি থমকে দাঁড়ায় নতুন কবরটার সামনে। কবরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রুবির কাছে মনে হয়–কবরের মাটি যেন একটু-একটু কাঁপছে।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি নামার সাথে সাথে কবরের মাটি ফুঁড়ে ওঠে কাদা মাটি মাখানো একখানা মানুষের হাত। রুবি ভয়ে স্থাণুর মত জমে যায়। পা দুটো যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। দৌড়ে পালাবে সেই শক্তি তার নেই। দেখতে দেখতে আরও একখানা হাত মাটি ফুঁড়ে উঠতে থাকে। হাত দুটো সম্পূর্ণ বের হওয়ার পর ধীরে ধীরে মাথা, গলা, কাঁধ...গাছের চারার মত আস্ত একটা মানুষ মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ায়। মানুষটার চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে কাদা মাটির আস্তরণ। ভয়ে জমে যাওয়া রুবির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। তার পা যেন মাটির সাথে সেঁটে গেছে।

কবরের ভিতরের মানুষটা বাইরে বেরিয়ে আসার পর বৃষ্টির বেগ আরও বেড়ে যায়। তীব্র বৃষ্টির ফোঁটায় মানুষটার গায়ের কাদা, মাটির আস্তরণ ধুয়ে যেতে থাকে। একটা পুরুষ মানুষ। মানুষটার মুখ দেখে রুবির কেমন পরিচিত পরিচিত লাগে। একসময় মানুষটা চোখ মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুবির দিকে তাকিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে ধরে এগোতে থাকে। রুবি মনে-প্রাণে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু সে এক চুলও নড়তে পারে না। মানুষটা রুবির কাছে পৌঁছে রুবিকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তখনই চিৎকার করে রুবির ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ভাঙার পরে রুবি থরথর করে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে বেড সুইচ টিপে সে আলো জ্বালে। ধাতস্থ হতে বেশ সময় লাগে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিছানার পাশে টেবিলের উপরে রাখা জগ থেকে কাঁপা হাতে এক গ্লাস পানি ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে শেষ করে। পাশে ঘুমানো টুম্পা-রুম্পার দিকে তাকিয়ে ভয় কমতে থাকে। টুম্পা-রুম্পা পাশে না থাকলে ভয়ে হয়তো সে আজ মরেই যেত। টুম্পা-রুম্পার দিকে তাকিয়ে রুবি ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। টুম্পা-রুম্পা দু-বোন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমাচ্ছে।

রুবি পুরোপুরি ধাতস্থ হওয়ার পর স্বপ্নে সেই কবরের ভিতর থেকে উঠে আসা মানুষটার চেহারা মনে করে আবার শিউরে ওঠে। স্বপ্নের সেই মানুষটা কে ছিল এখন সে বুঝতে পারছে। হায় খোদা, স্বপ্নের লোকটা হচ্ছে—কাল যার সাথে তার বিয়ে হবে সেই লোকটা। রুবির টেবিলের দেরাজে

BanglaBook.org

লোকটার একটা ফটো আছে। ফটোটা বের করে স্বপ্নে দেখা লোকটার চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখলে কেমন হয়? দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই রুবি বিছানা থেকে নেমে টেবিলের দেরাজ থেকে ফটোটা বের করে ফটোটার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে পাংশু বর্ণ ধারণ করে। কারণ স্বপ্নে এই লোকটাই কবর থেকে উঠে এসেছিল।

রুবির যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে তার নাম আব্দুল কাইয়ুম। ডাকনাম শুধু কাইয়ুম। ফর্সা, রোগা, লম্বা একটা ছেলে। কাইয়ুমের চেহারার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তার চোখ। চোখ দুটি ইংরেজ কবি শেলির মত ভাসা ভাসা।

কাইয়ুম একটা নামকরা বেসরকারি ব্যাংকের সহকারী অফিসার। কাইয়ুমের বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। খুব ছেলেবেলায়ই সে বাবা-মাকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছে তার মামা-মামীর কাছে। অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ছেলে। আজকালকার দিনে এমন ভদ্র-শান্ত ছেলে সাধারণত দেখা যায় না। অফিস-বাসা এর মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ। বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে সে আলাদা বাসায় থাকবে।

রুবির বাবা সালাম সাহেবের এক কলিগ এই সম্বন্ধটা এনেছিলেন। সব শুনে সালাম সাহেবের এই সম্বন্ধ খুব পছন্দ হয়। ছেলে ভাল চাকরি করছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন–ছেলের স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল। সিগারেট খায় না, আড্ডা দেয় না, মেজাজ মাটির মত কোমল, মার্জিত ব্যবহার। কিছুটা বেখাপ্পা লাগে–ছেলের মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ নেই এই নিয়ে। রুবির মা শুনে বলেন–সেটাই ভাল, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ না থাকলে ঝামেলা অনেক কম থাকে। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদরা সব সময় মুখিয়ে থাকে বাড়ির বউয়ের ভুল-ত্রুটি ধরার জন্য।

সব দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে সালাম সাহেব এই বিয়েতে মত দেন। রুবি তাঁর এক মাত্র মেয়ে, কিন্তু চেহারা মোটেই ভাল না। গায়ের রং ময়লা, বেঁটে, তার উপরে পড়াশুনাও তেমন হয়নি। এস.এস.সিতে তিনবার ফেল করেছে। এর আগে এরচেয়ে আর ভাল সম্বন্ধ আসেনি। একমাত্র মেয়ে দেখে টাকা-পয়সা আর সম্পত্তির লোভে সম্বন্ধ অনেকেই এসেছে কিন্তু

BanglaBook.org

সবই বেকার ফটকা টাইপের ছেলে-ছোকরা। বিয়ের পরে জামাইকে একটা চাকরি বা ব্যবসা ধরিয়ে দিতে হবে। থাকবে সালাম সাহেবের বাড়িতেই, অর্থাৎ ঘরজামাই। ঘরজামাই ব্যাপারটা সালাম সাহেবের এক দমই পছন্দ না। হোক না রুবি তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেরুদণ্ডহীন ঘরজামাইদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। সেদিক দিয়ে এই ছেলের কোন দাবি-দাওয়াই নেই। বিয়ের পরই স্ত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। সুন্দর একটা একতলা বাসা ভাড়া করে রেখেছে। সালাম সাহেব বাজিয়ে দেখার জন্য ছেলের মামাকে বলেছিলেন, 'আমার তো একটি মাত্র মেয়ে, বিয়ের পরে আমার বাড়িতেই তো থাকতে পারে, বাড়ি ভাড়া নেয়ার কী দরকার?'

ছেলের মামা জিভ কেটে বলেছেন, 'ভুলেও কাইয়ুমের সামনে এমন কথা বলবেন না। এমনিতে কাইয়ুম খুব নম্র-ভদ্র-বিনয়ী, কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধ খুবই বেশি। বউয়ের বাপের বাড়ি ঘরজামাই থাকবে এটা সে জীবনেও মেনে নেবে না।'

ছেলের আত্মসম্মানবোধ বেশি জেনে সালাম সাহেব খুব খুশি হন। পুরুষলোক যদি ব্যক্তিত্ববোধহীন, আত্মসম্মানবোধহীন হয় সে পুরুষ পুরুষই নয়।

তিন

রুবিদের বাড়ির উঠানেই শামিয়ানা খাটিয়ে বিয়ের অতিথিদের জন্য সারি-সারি করে চেয়ার টেবিল সাজানো হয়েছে। শামিয়ানার ভিতরে এক কোনায় বর-কনের স্টেজ। শামিয়ানার পিছন দিকে বাবুর্চিরা বড় বড় ডেকচিতে পোলাও, রোস্ট, খাসির রেজালা, গরুর মাংস, মুরগির গিলা-কলিজা দিয়ে মুগ ডাল, চপ, টিকিয়া, চাটনি...আরও বিভিন্ন রকমারি সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করছে। রকমারি রান্নার চনমনে গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে।

সমস্ত বাড়ি জুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। বয়স্করা দশ-বারোজন করে একত্রিত হয়ে পান চিবুচ্ছে আর উচ্চ শব্দে কথাবার্তা বলছে। কম বয়সী

BanglaBook.org

মেয়েরা ঝলমলে নতুন পোশাক পরে পরীর মত সেজে-গুজে দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করছে আর নিজেদের মধ্যে কী এমন কথা হচ্ছে যে একটু পর পর খিলখিল করে হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ছে। কম বয়সী মেয়েদের আর একটি দল আবার কনেকে ঘিরে বসে বিভিন্ন ঠাট্টা-রসিকতা-হাসাহাসি করতে করতে কনেকে সাজাচ্ছে। যুবক ছেলেরা ব্যস্ত ভঙ্গিতে সর্বত্র বিচরণ করছে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের গায়ের সাথে ধাক্কা লাগানো। সুযোগে ভিড়ের মাঝে মেয়েদের শরীরের নিষিদ্ধ অঞ্চলে হাত ছোঁয়ানো। বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে দুষ্টুমি আর ছোটাছুটিতে ব্যস্ত।

রুবির ছোট ফুপুর বিচ্ছু ছেলে রিফাত কিছুক্ষণ তার সমবয়সী অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সাথে দুষ্টুমি-ছোটাছুটি করে দেখে তাতে সে মোটেই মজা পাচ্ছে না। তখন সে তার সমবয়সীদের সঙ্গ ছেড়ে একা-একা গম্ভীর হয়ে ঘুরতে থাকে আর ভাবতে থাকে–কী করা যায়? মজা পাওয়া যায় এমন কিছু কি করা যায়???

রিফাত তার ষোলোকলা পূর্ণ করার মত সঠিক জিনিস পেয়ে যায়। বাড়ির পিছনের একটা আম গাছের নিচু ডালে লাল ডেঁয়ো (বড় লাল পিঁপড়া) বাসা করেছে। আম গাছটার চিকন একটা ডালের আগার পাতাগুলোকে একত্রে জড় করে একটা পাতার সাথে আর একটা পাতা ডেঁয়ো পিঁপড়ারা বিশেষ পদ্ধতিতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে গোল আকৃতির বলের মত বাসা বানিয়েছে।

ডেঁয়োর বাসাটা রিফাতের চোখে পড়তেই তার চোখ চকচক করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার মধ্যে চমৎকার একটা পরিকল্পনা এসে পড়ল। দেরি না করে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত লাগাল। ডেঁয়োর বাসা সহ চিকন আম ডালটা অতি সন্তর্পণে সে ভেঙে ফেলল। খুব সাবধানে সে বাসাটা নাড়াচাড়া করছে। একটু অসাবধান হলেই ডেঁয়োরা দলে-দলে বেরিয়ে পড়বে। এখন যথাস্থানে বাসাটা রেখে, ভেঙে দিয়ে, সটকে পড়লেই কার্যসিদ্ধি।

রুবিকে তৃতীয়বারের মত সাজানো হচ্ছে। সাজানোর দায়িত্বে আছে রুবির বান্ধবীরা এবং টুম্পা-রুম্পা। প্রথমবার সাজানোর পর দেখা গেল– রুবির একটি চোখ বড় লাগছে, অন্যটি ছোট। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তখন

BanglaBook.org

তাকে। কাজল দিয়ে চোখ আঁকার ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনও ভুল হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সবাই মিলে ঘষে ঘষে মেকাপ তুলে ফেলে আবার নতুন করে মেকাপ করে। বিয়ে বলে কথা, একটুও ভুল-ত্রুটি রাখা যাবে না। দ্বিতীয়বারের মেকাপ শেষে দেখা গেল লিপলাইনার দিয়ে ঠোঁট আঁকার ক্ষেত্রে কোনও ভুল হয়েছে। কারণ ঠোঁট দুটিকে কেমন কাতল মাছের খাবি খাওয়া ঠোঁটের মত লাগছে।

তৃতীয়বার সাজানো শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সব মেয়েরা চিৎকার-চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলল। তারা রুবির বিছানার উপরে বসে গোল হয়ে রুবিকে সাজাচ্ছিল, হঠাৎ ডেঁয়ো পিঁপড়ায় সমস্ত বিছানা ছেয়ে যায়। যত্রতত্র সবাইকে কামড়াতে শুরু করে। হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়। উঃ...আঃ...উঃহুহু...উঃহুহুরে... বাবারে...মরে গেলামরে...

ডেঁয়ো পিঁপড়ারা বোধহয় সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে টুম্পা-রুম্পাকে। ডেঁয়ো পিঁপড়ার আক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে টুম্পা-রুম্পা গায়ের ওড়না-টোড়না ফেলে দিগ্বিদিক্ হয়ে লাফাতে থাকে আর চিৎকার করতে থাকে। সিনেমার নায়কদের মত ছুটে আসে রাজিব। রাজিব টুম্পা-রুম্পাকে কিছুটা শান্ত করে, তাদের গা থেকে এক এক করে পিঁপড়া বেছে-বেছে ফেলতে থাকে। পিঁপড়া বেছে ফেলার অজুহাতে টুম্পা-রুম্পার গায়ের স্পর্শকাতর স্থানেও রাজিবকে নির্দ্বিধায় হাত দিতে দেখা যায়।

গায়ের সমস্ত পিঁপড়া ছাড়ানোর পরে টুম্পা-রুম্পা টের পায়—তাদের গায়ে সিল্ক কাপড়ের আঁটসাঁট হয়ে থাকা শর্ট কামিজের ভিতরেরও দু-একটা পিঁপড়া ঢুকে পড়েছে। কামিজের নীচে পিঁপড়ারা কুটকুট করে কামড় বসাচ্ছে। কামড়ের জ্বালায় দু-বোন অস্থির। কী আর করা! কামিজের নীচের পিঁপড়া ছাড়াতেও বাধ্য হয়ে রাজিবকে হাত লাগাতে হয়।

BanglaBook.org

চার

নির্দিষ্ট সময়ে বরযাত্রী এসে পড়ল।

রুবিকে চতুর্থবারের মত সাজানো হলো। এবার সাজানোতে কোন ভুল

ধরা পড়ল না। একেবারে নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে। কিন্তু রুবিকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। কেমন পেত্নী-পেত্নী লাগছে।

রুবির বাম চোখের উপরে এবং নীচের ঠোঁটে ডেঁয়ো পিঁপড়া কামড় বসিয়েছিল। তাই বাম চোখ ফুলে ঝুলে পড়ে চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে আর নীচের ঠোঁটখানাও ফুলে ঢোল। তা যা-ই হোক এই অবস্থায়ই গিয়ে রুবিকে বরের পাশে বসতে হবে। বর বেচারা বর-কনের স্টেজে একা-একা বসে আছে। এ ছাড়া বিয়ে পড়ানোর কাজীও এসে পড়েছে।

টুম্পা-রুম্পা এবং রুবির বান্ধবীরা মিলে রুবিকে নিয়ে যখন বর-কনের স্টেজের দিকে রওনা হলো, ঠিক তখন রুবির বাবা সালাম সাহেব এসে আহত গলায় ঘোষণা করলেন, 'রুবিকে নিয়ে যেতে হবে না, এই বিয়ে হচ্ছে না, বিয়ে ভেঙে দিচ্ছি।'

মুহূর্তে বাড়ির পরিবেশ বদলে গেল। উল্লাস, আনন্দ, হাসি থেমে গেল। সমস্ত বাড়ি জুড়ে থমথমে অবস্থা। কেউ কেউ নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগল। রুবির মা আর রুবির চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল।

রুবির বাবা, চাচা, ফুপুরা, মামারা...অর্থাৎ রুবিদের পক্ষের লোকজনদের সাথে বর পক্ষের লোকজনদের বাকবিতণ্ডা শুরু হলো। রুবিদের পক্ষের লোকজন চাচ্ছে বিয়ে ভেঙে দিতে কিন্তু বর পক্ষের লোকজন চাচ্ছে না বিয়ে ভাঙতে। বর পক্ষের লোকদের যুক্তি হচ্ছে–এত কিছুর পর বিয়ে ভাঙা সম্ভব নয়। মেয়ের গার্ডিয়ানরা ছেলে সম্পর্কে আগে কেন ভালভাবে খোঁজ করল না। আর যে কারণে বিয়ে ভাঙতে চাচ্ছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

রুবির গার্ডিয়ানরা নিজেদের মধ্যেও আলাপ-আলোচনা করছে। বিয়ে ভেঙে গেলে তারা নিজেরাও বড় ধরনের একটা অপমানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। এমনিতেই রুবির বিয়ে হচ্ছিল না, তার উপরে এই বিয়ে ভেঙে গেলে পাড়া-পড়শি নানান জনে নানান কু-কথা রটাবে। এর পরে দেখা যাবে মেয়েটার আর বিয়েই হচ্ছে না। তাই বলে জেনে-শুনে এমন একটা ছেলের সাথে...

রুবির সাথে বিয়ে ঠিক হওয়া কাইয়ুম ছেলেটা এমনিতে খুবই ভাল ছেলে। রুবির বাবা সালাম সাহেব কাইয়ুম সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে যা যা

BanglaBook.org

জেনেছিলেন সবই ঠিক ছিল। কিন্তু আজ বর পক্ষেরই এক লোকের কাছ থেকে যা জানলেন তাতে তাঁর পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পর্যন্ত অচেনা এক আতংকে শিরশির করে উঠল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাইয়ুমের মামার কাছে জিজ্ঞেস করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখলেন–যা জেনেছেন তা সবই সত্যি।

কাইয়ুমের যখন তার মায়ের পেটে নয় মাস চলছে তখন এক সন্ধ্যায় তার মা সাপের কামড়ে মারা যায়। গ্রামের লোকজন তড়িঘড়ি করে সেই রাতেই এশার নামাজের পরে কাইয়ুমের অন্তঃসত্ত্বা মৃত মাকে কবর দেয়। সেই রাতে, শেষ রাতের দিকে ফজরের নামাজের আগে আগে কাইয়ুমের মায়ের কবর থেকে অনবরত সদ্য জন্মানো বাচ্চার কান্নার শব্দ পাওয়া যায়। এই ঘটনায় কাইয়ুমের বাবা সহ গ্রামবাসীরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ফজরের নামাজ শেষে মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, 'চলুন, আমরা সবাই মিলে কবর খুলে দেখি কী ব্যাপার!'

ইমাম সাহেবের কথা মত সমস্ত গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে কবর খুলে দেখতে পায়–কাইয়ুমের মায়ের লাশের পায়ের কাছে একটা সদ্য জন্মানো শিশু। নাড়ী কেটে শিশুটিকে কবর থেকে তুলে এনে আবার কবরের মাটি চাপা দেওয়া হয়। অলৌকিক ভাবে জন্ম নেওয়া সেই শিশুকে গ্রামবাসীরা সবাই ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করে। এমনকী শিশুটির বাবাও। শেষ পর্যন্ত কাইয়ুমের মামা জালালউদ্দিন শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। কবরে জন্ম নেওয়া সেই শিশুটিই হচ্ছে আজকের কাইয়ুম। কাইয়ুমের বাবা কাইয়ুমের কোনও খোঁজ-খবর রাখেননি, তিনি অন্যত্র বিয়ে করে নতুন ভাবে সংসার গড়েছেন। কাইয়ুম তার মামা-মামীর কোলেই বড় হয়েছে।

যে ছেলের জন্ম এমন ভয়ানক ভাবে সেই ছেলের সাথে কোনও বাবা কি তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে চান? সালাম সাহেবও দিতে চাচ্ছেন না। এ ছাড়া কাইয়ুমের জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং আচার-আচরণের মধ্যেও নাকি অনেক ধরনের অস্বাভাবিকতা রয়েছে।

বর পক্ষের সাথে রুবির গার্ডিয়ানদের বাকবিতণ্ডা ঝগড়ায় রূপ নেয়ার উপক্রম। কিন্তু কাইয়ুম নির্বিকার ভঙ্গিতে পিঠ টানটান করে মূর্তির মত বসে আছে। তার চোখে সানগ্লাস। ঝগড়া, বাকবিতণ্ডা আশপাশের কোনও কিছুই

BanglaBook.org

তাকে স্পর্শ করছে না। দেখে মনে হচ্ছে সে যেন সবার মাঝে থেকেও অন্য কোথাও। তার চেহারা ভাবলেশহীন।

বর পক্ষের সাথে রুবির গার্ডিয়ানদের তুমুল ভাবে ঝগড়া বাধার আগেই রুবি এসে উপস্থিত হলো। রুবি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এই বিয়েতে আমি রাজি। একেই আমি বিয়ে করব।' বাবা, মামা, ফুপুদের দিকে তাকিয়ে ভেজা চোখ মুছতে মুছতে, 'তোমরা শুধু শুধু ঝগড়া কোরো না। আমি বিয়েতে রাজি।'

পাঁচ

কাইয়ুম আর রুবির সংসার জীবন।

প্রতিদিন সকালে ন'টার মধ্যে কাইয়ুম অফিসে চলে যায়। কাইয়ুম অফিসে যাবার পর একলা বাসায় পড়ে থাকে রুবি।

তাদের বাসাটা খুব সুন্দর। একতলা নিরিবিলি ছিমছাম বাড়ি। বাড়ির সামনে লনের মত কিছুটা খোলা জায়গা। রুবির পরিকল্পনা খোলা জায়গাটায় সে ফুলের বাগান করবে। খোলা জায়গাটা পেরুলে পর এক পাশে পাশাপাশি দুটো কাঁঠাল গাছ, অন্য পাশে একটা সবল নারকেল গাছ। বিষণ্ন দুপুরবেলা কাঁঠাল গাছ দুটোর ছায়ায় বসে পাখিরা কিচির-মিচির করে। পাখিদের কিচির-মিচির শুনতে রুবির খুব ভাল লাগে। কিছুটা হলেও রুবির একাকীত্ব দূর হয়।

সাধারণত স্বামী অফিসে যাবার পর থেকে নতুন বউদের এক ধরনের বিরহ সময় কাটে। মনমরা হয়ে সারাক্ষণ অপেক্ষা করে কখন সে ফিরে আসবে। কিন্তু রুবির বেলায় সম্পূর্ণ উল্টো। কাইয়ুম অফিসে যাবার পর সে অনেক স্বস্তি বোধ করে। বরং কাইয়ুম যতক্ষণ বাসায় থাকে সে তীব্র ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। ভয়ের শুরু বাসর রাত থেকেই।

বাসর ঘরে রুবি একা জড়সড় হয়ে বসে ছিল। মনটা বেজায় খারাপ। তখনও বারবার চোখটা ভিজে উঠছিল। বাবা-মা, সবাইকে ছেড়ে এসেছে,

BanglaBook.org

কী এক হাহাকার বুকের ভিতরে! তার উপরে রুবিদের বাড়ির কেউ চাচ্ছিল না এই বিয়েটা হোক। সবাইকে অবাক করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত রুবির ইচ্ছেতেই বিয়েটা হলো। রুবির বাবা-মা, চাচা, মামারা, ফুপুরা অর্থাৎ রুবির গোটা পরিবার রুবির উপরে কিছুটা অভিমান করেছেন তাতে। এ ছাড়া রুবির করারও কিছু ছিল না। তার মত অসুন্দর একটা মেয়ে, যার এমনিতেই বিয়ে হচ্ছিল না, তার বিয়ে নিয়ে এত নাটক হওয়ার পর যদি বিয়েটা ভেঙে যেত, তা হলে পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কুৎসিত মন্তব্য করত, যা শুনে তার মন খুব খারাপ হত। এমনকী, যে গার্ডিয়ানরা চাচ্ছিল না বিয়েটা হোক তারাও কিছুদিন পর হয়তো বলত, 'তুই-ই একটা অপয়া, না হলে তোর বেলায়ই সব অঘটন কেন! দুনিয়ায় তো আরও অনেক মেয়ে আছে, তাদের জন্য তো কবরে জন্ম নেওয়া ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ আসে না।' নানামুখী কথা শুনতে হত। এই সব ভেবেই ঝোঁকের মাথায় সে সিদ্ধান্তটা নেয়। এখন মনে হচ্ছে বিয়েটা না হলেই ভাল হত। এমন একটা লোকের সাথে বিয়ে হওয়ার চেয়ে সারা জীবন একা থাকাও ভাল ছিল।

বাসর ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কাইয়ুম এসে ঢুকল। রুবি আরও জবুথুবু হয়ে গেল। রুবি শুনেছে–বাসর রাতে স্বামীরা অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে। অনেকে আবার কবিতা আবৃত্তি করে বা গান গেয়েও শোনায়। অনেক স্বামীরা আবার এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়ে যে নতুন বউয়ের সামনে হাস্যকর কিছু বলে ফেলে। যা শুনে নতুন বউ হাসতে পারে না, হাসি চেপে বসে থাকতে হয়।

রুবিদের বেলায় তেমন কিছুই ঘটল না। কাইয়ুম ভিতরে ঢুকে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে, স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা অবস্থায় ঘরের আলো নিভিয়ে টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রুবি বিছানার অন্য পাশে যেমন অবস্থায় বসা ছিল অন্ধকারেও ঠিক তেমন অবস্থায়ই বসে রইল। প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল রুবি। এ কেমন লোকরে বাবা! নতুন বউ যে বসে আছে সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। রুবি জোরে-জোরে কয়েকবার গলা খাঁকারি দিল। যদিও নতুন বউয়ের জন্য ব্যাপারটা অশোভন। কিন্তু গলা খাঁকারি শুনেও লোকটার কোনও ভাবান্তর হলো না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। এমনকী

BanglaBook.org

লোকটার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে বসে বসে রুবি কতটা সময় পার করল তা ঠিক বলতে পারবে না। তবে ঘণ্টা দুয়েকের যে কম না সেটা নিশ্চিত। খুব পানি পিপাসা লাগল। পানি খেতে হলে খাবার ঘরে যেতে হবে, এ ঘরে পানি খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই।

রুবি অতি সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামল। হাতড়ে-হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে পেয়ে ঘরের আলো জ্বালল। আলো জ্বলে উঠতেই সহসা চোখ পড়ল বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা লোকটার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে রুবি প্রচণ্ড চমকে উঠল। লোকটা ঘুমানো নয়, জেগে আছে। চিত ভাবে টানটান হয়ে শোয়া। চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা, সিলিং-এর দিকে তাকানো।

রুবি সলজ্জ গলায় বলল, 'খুব পিপাসা লেগেছে।'

লোকটার চেহারায় কোনও ভাবান্তর হলো না। সে যেমন সিলিং-এর দিকে তাকানো ছিল ঠিক তেমনই পলকহীন তাকিয়ে রইল।

রুবির মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল। সময় যেন থমকে গিয়েছে। লোকটা স্থির চোখে পলকহীনভাবেই পড়ে রইল। লোকটার হাত-পা, গোটা শরীর যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকও ওঠানামা করছে না।

রুবির মনে পড়ল, তার দাদী যখন মারা গিয়েছিল, দাদীর চোখ দুটোর দৃষ্টিও এমন স্থির হয়ে গিয়েছিল। পরে রুবির মা, দাদীর চোখ বুজিয়ে দিয়েছিল।

লোকটা কি তা হলে মারা গেল!? বাসর রাতেই স্বামীর মৃত্যু!!! রুবির হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। সমস্ত শরীর ভিজে গেল ঘামে। কাছে গিয়ে নাকের সামনে হাত উঁচিয়ে ধরে এবং বুকের বাম পাশে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখতে হয় লোকটা সত্যিই মারা গেল নাকি। কিন্তু রুবির এতটা সাহসে কুলাচ্ছে না।

ঘণ্টাখানেক ধরে নিজেকে প্রবোধ দিতে দিতে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে রুবি। ছোট-ছোট পায়ে সে লোকটার কাছে গিয়ে নাকের সামনে হাত উঁচিয়ে ধরে এবং বুকের উপর হাত রেখে নিশ্চিত হয়—সত্যিই লোকটা মারা গেছে। কারণ লোকটার নিঃশ্বাস পড়ছে না আর বুকেও কোন স্পন্দন নেই।

BanglaBook.org

এ ছাড়া লোকটার সমস্ত শরীরও বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে আর ফর্সা গায়ের রঙেও কেমন নীলচে ভাব।

রুবির অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল। এমন মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত সে ভেবে পেল না।

এক সময় রুবির খেয়াল হলো, ফোন করে বাড়িতে জানানো উচিত। কিন্তু সে যে মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করত সেটা ভুলে এ বাড়িতে আনা হয়নি। ভাবল, এই লোকটার নিশ্চয়ই কোন ফোন সেট আছে, সেটা দিয়ে বাড়িতে জানানো যায়।

সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন ফোন সেট পাওয়া গেল না। রুবি নিরাশ হয়ে খাবার ঘরের ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গলাটা ভিজিয়ে, টেবিলের উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দূর থেকে ভেসে এল ফজরের আযানের ধ্বনি। রুবি অনবরত কাঁদতেই থাকল। পিছন থেকে কে যেন রুবির মাথায় হাত রেখে থমথমে গলায় বলল, 'কাঁদছ কেন তুমি?'

রুবি ধড়মড়িয়ে, ঝট করে টেবিলের উপর থেকে মাথা তুলে অশ্রু ভেজা ভয়ার্ত চোখে পিছনে তাকিয়ে দেখে–একটু আগের মৃত লোকটা, তার স্বামী কাইয়ুম পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতি রাতেই কাইয়ুমের পরিণতি বাসর রাতের মত হয়। আর প্রতিটা রাতই রুবি ভয়ে গুটিসুটি মেরে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে ঘরের এক কোনায় জেগে বসে থাকে। অপেক্ষা করে কখন ভোর হবে। কখন মৃত স্বামী আবার জীবন ফিরে পাবে।

রুবি এসব কথা কাউকে বলে না। কেউ শুনলে হয়তো তাকেই পাগল ভাববে। এ ছাড়া বলার মত মুখও তার নেই। তার ইচ্ছেতেই এই বিয়েটা হয়েছে। হয়তো রাতে যা ঘটে তা সম্পূর্ণই বড় ধরনের কোনও ভ্রান্তি। কারণ যখন থেকে সে জেনেছে, কাইয়ুম কবরে জন্মগ্রহণ করেছে তখন থেকেই তার মনের ভিতরে কাইয়ুম সম্পর্কে পাহাড়সম এক ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো সেই ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ ওটা।

BanglaBook.org

প্রতিরাতে আমার ভুল হচ্ছে, দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে, ভ্রান্তি, সবকিছুই ভ্রান্তি ...এই বলে সারাক্ষণ নিজেকে নিজে প্রবোধ দেয় রুবি। কিন্তু তাতে তার মানসিকতার মোটেও উন্নতি হচ্ছে না। হবেই বা কী করে! সে যে আরও কিছু বিষয় লক্ষ করেছে যা কিনা রাতের দৃশ্যের মতই ভয়ঙ্কর।

শুক্রবার বা ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়ার পরে কাইয়ুম যখন ঘুমায় তখনও তাকে রাতের মত একই অবস্থায় দেখা যায়। মুখের উপর ভন-ভন করে ঘুরে বেড়ায় মাছি। মৃত মানুষের মুখের উপর যেমন মাছি ঘুরে বেড়ায়। এ ছাড়া কাইয়ুমের চোখে কখনওই পলক পড়ে না। জেগে থাকা অবস্থায়ও সে সারাক্ষণ সাপের মত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার এই ব্যতিক্রম অন্যের চোখে ধরা পড়ে না কারণ সে সবসময় চোখে সানগ্লাস পরে বাইরে বের হয়। অফিসও করে সানগ্লাস পরে। এ সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে–তার চোখে কিছু সমস্যা আছে, আলো সহ্য করতে পারে না। তাই চোখে সারাক্ষণ সানগ্লাস পরে থাকে।

কাইয়ুমের চলাফেরাও কেমন জোম্বিদের মত। জোম্বিদের মত মেরুদণ্ড সোজা করে হাত দুটো শরীরের দু-পাশে সরলরেখার মত স্থির করে রেখে হাঁটে।

এক জোম্বির সাথে এখন রুবির বসবাস। রুবির জোম্বি স্বামী প্রতিদিন যখন পিঠ টানটান করে শরীরের দু-পাশে হাত দুটোকে পাথরের মত সেঁটে অফিসে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে রাস্তায় বের হয়, তখন রুবি এক ধরনের স্বস্তি বোধ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। রুবি দেখতে পায়–তার জোম্বি স্বামীর মাথার উপরে বেশ কয়েকটা কাক ঘুরে ঘুরে ওড়াউড়ি করে আর তীক্ষ্ণ স্বরে কা-কা করে ডাকতে থাকে। কাকদের নাকে হয়তো দামী পারফিউমের মিষ্টি গন্ধকে হার মানিয়েও জীবন্ত লাশটার পচা গন্ধ পৌঁছে যায়। কাকেরা সেই পচা গন্ধে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর রুবির প্রতিনিয়ত সেই গন্ধে মনে পড়ে বিয়ের আগের রাতে দেখা দুঃস্বপ্নটার কথা।

BanglaBook.org

মৃত্যুছবি

এক

সাবিনা তাঁর পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে স্নেহার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। পুতুলের মত সুন্দর মেয়েটা বিছানার উপরে লেপ্টে বসে নুয়ে-নুয়ে ছবি আঁকছে। মেয়েকে একটা ছবিওয়ালা বই কিনে দেয়ার পর থেকে মেয়ে সেই ছবি দেখে-দেখে পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকে। আম, আতা, কাঁঠাল–বইতে যত ছবি আছে সব। আঁকেও খুব ভাল। দেখলে মনে হয় কোনও নামকরা শিল্পীর পেন্সিল স্কেচ। ভেবে অবাক লাগে, এতটুকু মেয়ে এত সুন্দর ছবি আঁকে কী করে!

বড় হলে মেয়েকে আর্ট কলেজে পড়াতে হবে। মেয়ে বড় হবে–এই ভেবে সাবিনা বেশ শঙ্কা অনুভব করছেন। সুন্দরী মেয়েরা বড় হলে পরে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। সব সময় তাদের চোখে-চোখে রাখতে হয়। নিজস্ব গণ্ডির বাইরে যেতে দেয়া যায় না। পুরুষ নামের কিছু হিংস্র কুকুরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তাদের উপর। প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলে এসিড ছুঁড়ে মারে। এসিড তো আজকাল আবার চাল-ডালের মত হর-হামেশাই পাওয়া যায়। ভাবতে-ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয় সাবিনার।

রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে। স্নেহার বাবা জাহিদুল কবির এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। সাবিনা বিরক্তি চেপে রেখে টিভি দেখছেন। স্টার প্লাস চ্যানেলের সিরিয়াল। স্নেহা দূরে বিছানার উপরে বসে ছবি এঁকেই যাচ্ছে। সাবিনা মেয়েকে কয়েকবার বলেছেন, 'অনেক রাত হয়েছে, চলো ভাত খাবে।' কিন্তু মেয়ে প্রতিবারই বেণি করা চুল দুলিয়ে-দুলিয়ে বলেছে, 'বাবা আসলে পরে, বাবার সাথে খাব।' মেয়েটা কেমন যেন গোনা-গোনা কথা বলে। এই বয়সের মেয়েরা সাধারণত এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে

BanglaBook.org

সারাক্ষণ জ্বালাতন করতে থাকে। কিন্তু এই মেয়েটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য কোনও মেয়ে হলে নিশ্চয়ই এখন বলত–মাম্মি, বাবা এখনও আসছে না কেন? কখন আসবে? বাবা ফোন ধরছে না কেন? বাবাকে তুমি বকো না কেন? আরও-আরও সব প্রশ্ন। কিন্তু এই মেয়ে একবারও জিজ্ঞেস করছে না বাবা কেন এত দেরি করছে!

সাবিনার বিরক্তি আরও বাড়ছে। টিভি দেখতেও আর ভাল লাগছে না। মেয়েটার সাথে যে গুটুর-গুটুর করে গল্প করবেন সে উপায়ও নেই। মেয়ে রাশভারী লোকের মত গম্ভীর হয়ে থাকে। ছবি আঁকার সময় কাছে গেলেও গম্ভীর গলায় বলে, 'মাম্মি, তুমি এখান থেকে যাও, আমার পাশে কেউ থাকলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।'

জাহিদুল কবির সাড়ে ১২-টায় ফিরলেন। টিভি দেখতে-দেখতে সোফায় হেলান দিয়েই সাবিনা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কলিংবেলের শব্দে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে এসে দেখেন স্নেহাও উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। হাতের মুঠে পেন্সিলটা শক্তভাবে চেপে ধরা। সাবিনা পেন্সিল এবং ছবি আঁকার খাতাটা আস্তে করে সরিয়ে নিয়ে টেবিলের উপরে রাখতে গিয়ে একটা ছবি দেখে রীতিমত চমকে যান। সাবিনা সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্বামী কবিরকেও ডেকে দেখান। কবিরও বিস্মিত হয়ে যান। বিস্ময় চেপে রেখে বলেন, 'ওকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। ঘুম ভাঙিয়ে চারটা খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

সকালে নাস্তা তৈরি করে, কবিরকে গোছগাছ করে অফিসে পাঠাতে-পাঠাতে ১০টা বেজে যায়। কবির অফিসে যাওয়ার পর ব্যস্ততা থেকে একটু স্বস্তি মেলে সাবিনার। টিভি ছেড়ে, সোফায় হেলান দিয়ে বসে ক্লান্তি দূর করতে চান তিনি। স্নেহা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে, দাঁত ব্রাশ করিয়ে, নাস্তা খাওয়াতে হবে।

হঠাৎ টিভির একটা চ্যানেলের নিউজের হেড লাইন দেখে আঁতকে ওঠেন সাবিনা। পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেত্রী বেনজীর ভুট্টো আততায়ীর গুলিতে নিহত।

সাবিনা কাঁপা-কাঁপা হাতে ফোন করেন কবিরকে। ওপাশ থেকে, 'হ্যাঁ, সাবিনা, বলো।'

BanglaBook.org

'শুনেছ!'

'কী শুনব?'

'বেনজীর ভুট্টো মারা গিয়েছেন!'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে, কিছুটা থমথমে গলায় কবির বলেন, 'কখন? কীভাবে?'

'আজ সকালে। একটা জনসভায়...'

'তুমি এ ব্যাপারটা নিয়ে এত অস্থির হয়ো না। নিশ্চয়ই কাকতালীয় ব্যাপার। স্নেহা ঘুম থেকে উঠেছে?'

'না।'

'ওকে ঘুম থেকে উঠিয়ে, নাস্তা খাইয়ে ঠাণ্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করো, ছবিটা কী করে আঁকল। বেনজীর ভুট্টো যে মারা গিয়েছেন তা বলার দরকার নেই। ওর শিশু মনে প্রভাব পড়তে পারে।'

সাবিনা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছেন না। গতকাল রাতে স্নেহা বেনজীর ভুট্টোর ছবি আঁকল। বেনজীর ভুট্টো চোখ বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। নিখুঁত ছবি। এর আগে স্নেহা কখনও মানুষের ছবি আঁকেনি। এ ছাড়া এমন নিখুঁত ছবি সে আঁকা শিখল কীভাবে! আর বেনজীর ভুট্টোকে সে দেখল কোথায়? টিভির খবরের সময়। না, স্নেহা তো খবর দেখে না।

সাবিনা খাতাটা বের করে আবার ছবিটা দেখেন। ভালভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ছবিটা দেখে তিনি আরও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ছবিতে বেনজীর-এর গায়ে রক্ত লেগে আছে সেটাও আঁকা রয়েছে। পেনসিল স্কেচ, তাই প্রথমে বোঝা যায়নি। অবাক কাণ্ড! এতটুকু মেয়ে এমন স্পষ্ট ছবি আঁকতে পারে না! নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোনও ব্যাপার রয়েছে।

স্নেহাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে, নাস্তা খাইয়ে সাবিনা ঘনিষ্ঠ হয়ে মেয়ের পাশে বসেন, ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'মা, এ কার ছবি তুমি এঁকেছ?'

'জানি না, মাম্মি।'

কিছুটা চটে গিয়ে সাবিনা বলেন, 'তুমি নিজে এঁকেছ! অথচ বলছ জানি না।'

স্নেহা অবাক চোখে ছবিটা দেখতে থাকে। দেখে মনে হচ্ছে সে-ও

BanglaBook.org

অবাক হচ্ছে। এই ছবি সে কীভাবে আঁকল তাই ভেবে।

সাবিনা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার জিজ্ঞেস করেন, 'মা, কে তোমাকে এমন ছবি আঁকা শিখিয়েছে?'

'বন্ধু।'

'কে তোমার বন্ধু?'

'চুল বড়, দাড়িওয়ালা লোকটা।'

'কোথায় সে? তোমাকে কখন সে ছবি আঁকা শিখাল!'

'সে তো আমাদের বাড়িতেই থাকে। তুমি কাছে না থাকলেই সে কাছে আসে।'

সাবিনা ধরা গলায় বলেন, 'কী আবোল-তাবোল বলছ, মা!' মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে থাকেন সাবিনা।

দুই

স্নেহা আজকাল মানুষের ছবিই আঁকে। অপরিচিত সব মানুষের। সাবিনা খবরের কাগজ এবং টিভির খবর দেখে-দেখে মিলিয়ে দেখেছেন, সেই সব ছবির মানুষগুলো এর পরে অপঘাতে বা কারও হাতে নিহত হয়। সেদিন জড়ুলওয়ালা মোটাসোটা এক লোকের ছবি আঁকল। এর পরের দিনই খবরের কাগজে দেখা গেল ট্যারা রতন নামে এক টপ টেরর র‍্যাবের ক্রস ফায়ারে মারা গিয়েছে। জড়ুলওয়ালা ছবির সাথে ট্যারা রতনের চেহারার হুবহু মিল। এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট, আততায়ীর হাতে খুন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আগেই স্নেহা ছবি এঁকে ফেলে। জিজ্ঞেস করলে সেই প্রথম দিনের মত অবাক হয়ে বলে, আমি কিছু জানি না, বন্ধু জানে। বন্ধু কে?—বড়চুল-দাড়িওয়ালা লোকটা।

স্নেহাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাইকিয়াট্রিস্ট পেণ্ডুলাম দেখিয়ে খুব সহজেই স্নেহাকে হিপনোটাইজ করেন। হিপনোটাইজড অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বেশি কিছু জানা যায়নি। সেই

BanglaBook.org

একই তথ্য। লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা বন্ধুই তার হাত ধরে তাকে দিয়ে ছবি আঁকায়। বন্ধু তাদের বাড়িতেই থাকে। বন্ধুর নাম আলফ্রেড। বন্ধু তাকে খুব ভালবাসে। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দিতে চায় না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সাইকিয়াট্রিস্ট বলেন, 'মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটাই ওর শিশু মনের কল্পনা। নার্ভ রিলাক্স টনিক দিয়ে দিচ্ছি। সব সময় ওর সাথে-সাথে থাকবেন, লোনলি হতে দেবেন না। সম্ভব হলে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।'

স্নেহার বাবা জাহিদুল কবির, স্নেহার আঁকা ছবিগুলো বের করে সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখান।

ছবিগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে সাইকিয়াট্রিস্টের চোখে-মুখেও চিন্তার ছাপ দেখা যায়। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ইতস্তত করে বলেন, 'সত্যিই ওর মত একটা বাচ্চা মেয়ের পক্ষে এ ধরনের স্কেচ করা সম্ভব নয়। তবে মিরাকল বলে একটা ব্যাপার রয়েছে। লণ্ডনের বেলগ্রেড স্কোয়ারের বাসিন্দা মিসেস কোরাল পোল্‌জও মৃত ব্যক্তি, যাদের তিনি চেনেন না, কখনও দেখেননি এমনকী তাদের সম্পর্কে কিছু জানেন না...চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে তাদের ছবি এঁকে ফেলতেন। বিখ্যাত শিল্পী মরিস দে-লা ত্যুরের আত্মার মাধ্যমে তিনি সেই সব ছবি আঁকতেন বলে দাবি করতেন। আজ পর্যন্ত সেই রহস্যের কোনও কূলকিনারা করতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। প্রকৃতি এমনই কিছু রহস্য মাঝে-মাঝে মেলে ধরে আমাদের সামনে, যা কখনও ভেদ করা যায় না।'

তিন

স্নেহা বিছানার উপরে উপুড় হয়ে ছবি আঁকছে। মাঝে-মাঝে ডান পাশে তাকিয়ে অদৃশ্য বন্ধু আলফ্রেডের সঙ্গে কথা বলছে। দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছেন সাবিনা।

BanglaBook.org

গত তিন বছর ধরে এ-রকম দৃশ্য দেখতে-দেখতে কিছুটা সয়ে এসেছে সাবিনার। প্রথম দিকে স্নেহাকে ওভাবে অদৃশ্য বন্ধুর সাথে কথা বলতে দেখলেই তাঁর বুকের ভিতরটায় হু-হু করে উঠত। চোখ দিয়ে টপ-টপ করে লোনা জল ঝরত। এখন চোখ দিয়ে লোনা জল না ঝরলেও মনটা ভীষণ কাঁদে। রাজকন্যার মত সুন্দর মেয়েকে ইচ্ছে করে সারাক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। মেয়ের ধারে-কাছেও যাওয়া যাবে না। সে একা-একা তার বন্ধুর সঙ্গে থাকবে।

দেশের নামকরা বেশ কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। সবাই-ই একই কথা বলেছেন–শিশু মনের কল্পনা, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে-ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় ঠিক হচ্ছে! আরও বেড়ে যাচ্ছে!

সেদিন রাতে হঠাৎ স্নেহা ফুঁচ-ফুঁচ করে কাঁদতে শুরু করল। সাবিনা সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, মা, তোমার? কাঁদছ কেন? বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে?'

চাপা স্বভাবের মেয়ে, প্রথমে তো কিছুই বলতে চায় না। অনেক পীড়াপীড়ি আর মিনতির পরে কাঁদো-কাঁদো গলায় দুই উরুর মাঝখানটা দেখিয়ে বলে, 'মাম্মি, ও শুধু আমার এখানটায় হাত দিতে চায়। আমার ব্যথা লাগে।'

কথাটা শোনার পর সাবিনা মেয়েকে বুকের সাথে চেপে ধরে শব্দ করে কেঁদে ওঠেন।

BanglaBook.org

চার

জাহিদুল কবিরের মামা আসাদুল্লার কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর একটা তথ্য জানা গিয়েছে।

কবির আর সাবিনা যখন সুইটজারল্যাণ্ড ছিলেন তখন মামাই তাঁদের এই বাড়িটা কবিরের নামে কিনে রাখেন। এই বাড়িটা ছিল এক খ্রিস্টান

মহিলার। মহিলার নাম মিসেস রুথ। বাড়িটায় মহিলার এক ভাতিজা থাকত। সেই ভাতিজাটি একজন চিত্র শিল্পী ছিল। হঠাৎ সে মারা যায়। মারা যাওয়ার পর বেশ কয়েক বছর বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে। এর পরে বিক্রি হয়। কবির আর সাবিনা দেশে ফিরে বাড়িতে ওঠার আগে মামা বাড়ির নতুন করে রং-ডেকোরেশন করিয়ে একেবারে ফিটফাট করে তোলেন।

মামার কাছ থেকে বাড়ির আগের মালিক মিসেস রুথের ঠিকানা রেখে দিয়েছে সাবিনা আর কবির। মিসেস রুথের ভাতিজা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবেন তাঁরা।

পাঁচ

মিসেস রুথের বাড়ি থেকে ফিরছেন কবির আর সাবিনা।

কবির নিজেই ড্রাইভ করছেন টয়োটা করোলাটা। বেশ গতিতে। যত দ্রুত পৌঁছনো যায়। স্নেহাকে নিয়ে ও বাড়িতে আর একদিনও নয়। মিসেস রুথের কাছ থেকে যা জেনেছেন তাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এসেছে।

মিসেস রুথের ভাতিজার নাম ছিল আলফ্রেড। আলফ্রেড নিঃসঙ্গ, বিকৃত যৌনাচারসম্পন্ন চিত্র শিল্পী ছিল। স্নেহার বর্ণনা মতই তার লম্বা চুল-দাড়ি ছিল। কবিরদের ওই বাড়িটায় বসেই সে একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। বিচারে তার ফাঁসি হয়।

স্নেহাকে রেখে এসেছে তাসলিমা নামের কাজের মেয়েটার কাছে। তাসলিমা স্নেহার খুব খেয়াল রাখে। তবুও স্বামী-স্ত্রী বেশ শঙ্কা অনুভব করছেন। কারণ ও বাড়িতে আলফ্রেডের প্রেতাত্মাটাও রয়েছে। আর সামান্য পথ, একটু পরেই পৌঁছে যাবেন বাড়িতে।

স্বামী-স্ত্রী একের পর এক কলিংবেল টিপেও ভিতর থেকে সাড়া-শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন কাজের মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে

BanglaBook.org

রয়েছে মেঝেতে। মাথায় জমাট বাঁধা রক্ত। স্নেহা কোথায়? স্বামী-স্ত্রী ঊর্ধ্বশ্বাসে স্নেহার ঘরে গিয়ে দেখেন–সব শেষ!!! মেয়েটা রক্তে মাখামাখি হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আলফ্রেড নামের অদৃশ্য পিশাচটা ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে ওকে।

স্নেহার ছবি আঁকার খাতার শেষ ছবিটা একটা মেয়ের ছবি। পেনসিল স্কেচ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা স্নেহার নিজেরই ছবি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়। দুই দিন ধরে সূর্যের দেখা নেই। শৈত্য প্রবাহ চলছে। পাড়ার মোড়ে-মোড়ে চায়ের দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। জন জীবনে কেমন এক স্থবিরতা নেমে এসেছে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সব জায়গায় চলছে অলস সময়। প্রতিটি মানুষ গরম পোশাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে জবুথবু হয়ে থাকতে পছন্দ করছে। নিম্ন আয়ের রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, ভ্যানচালক ধরনের লোকজন রাস্তার পাশে আগুন জ্বেলে, গোল হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছে। রাস্তার পাশের পুরানো কাপড়ের দোকানগুলোর ব্যবসা চলছে জমজমাট। সারাদিন 'বাইছা লন দশ টাকা, বাইছা লন বিশ টাকা' শব্দে মুখরিত। রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা দেশের বিভিন্ন জায়াগায় দরিদ্র লোকদের মধ্যে শত-শত কম্বল, চাদর বিলাচ্ছে। প্রচণ্ড শীত আর শৈত্য প্রবাহের দাপটে সারা দেশব্যাপী কয়েক দিন ধরে এই অবস্থা চলছে।

পলাশপুর বস্তির একেবারে উত্তর মাথার ছোট্ট ঘরটার বাসিন্দা ওস্তাদ-সাগরেদ। ওস্তাদের নাম মজিবর পাগলা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাঝারি উচ্চতা। রোগা-পাতলা চোয়াল ভাঙা চেহারা। মুখ ভর্তি খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। ওস্তাদ মোটেই পাগলা ধরনের নয়, তবুও তাঁর নামের সাথে কী এক অদ্ভুত কারণে সবাই পাগলা যোগ করে দিয়েছে। মজিবর পাগলার পেশা হচ্ছে জাদু দেখানো। বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, বিভিন্ন জনবহুল জায়গা মেলা, গ্রামের হাট-বাজারে বসে ভয়ঙ্কর সব জাদু দেখান তিনি। মজিবর পাগলার সাগরেদের নাম কালু। কালুর বয়স চোদ্দ বা পনেরো। তার গায়ের রঙের সাথে নামের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ভোলাভালা দুঃখী-দুঃখী চেহারা তার। তবে উচ্চতার দিক দিয়ে এরই মধ্যে ওস্তাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

মজিবর পাগলা দুই দিন ধরে বিছানায় শোয়া। গত কয়েক দিনের শীতে তাঁর হাঁপানির টান বেড়েছে। গায়েও বেশ জ্বর। কালু ওস্তাদের গায়ে ছেঁড়া কম্বল আর তেল চিটচিটে মোটা দুটো কাঁথা চাপিয়ে দিয়েছে। এর পরেও ওস্তাদ শীতে কাঁপছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে-বলতে তন্দ্রার মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার একটু পর-পর জেগে উঠে বিড়বিড় করছে।

কালু ওস্তাদের ঠোঁটের ফাঁকে চামচ দিয়ে পানি দিতে দিতে জিজ্ঞেস করছে, 'ওস্তাদ, এখন কেমন লাগছে? খুব বেশি খারাপ লাগছে!'

ওস্তাদ কিছুই বলছে না। শুধু চোখ উল্টে-পাল্টে আশ-পাশে তাকাচ্ছে। পানিও গিলতে পারছে না, ঠোঁট গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

কালুর চোখ ছলছল করছে। বুকের ভিতর দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। মনে হয়–এই শীতটা আর ওস্তাদ টিকব না। ওস্তাদ মরে গেলে কালুর কী হবে! সে কোথায় যাবে! কালু আট বছর বয়স থেকে ওস্তাদের সাথে আছে। ওস্তাদের যেমন জগৎ-সংসারে আপন বলতে কেউ নেই, কালুরও সেই একই অবস্থা। মা'য় মরার পর বাজানে আর একটা বিয়া করল, কালুরে ঘর থেকে বের করে দিল। ভাসতে-ভাসতে ওস্তাদের হাতে পড়ল। সেই থেকে...

ওস্তাদের উপর কালুর কিছুটা গোস্বা লাগছে। ওস্তাদের কত ক্ষমতা–মরা মানুষ জিন্দা করতে পারে, শূন্যে ভেসে উঠতে পারে, বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে, কাপড়ের বানানো পুতুলরে জীবন্ত করতে পারে, হাতের মুঠে ডিম নিয়া দুই সেকেণ্ডের মধ্যে সেই ডিম দিয়া বাচ্চা ফুটাইতে পারে, দড়িরে সাপ বানাতে পারে। আরও কত কী! সেই ওস্তাদ কী নিজের রোগ সারাতে পারে না!

ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে ওস্তাদ ঘুমাচ্ছেন। কালু ভাবল–এই ফাকে ভাত রান্না করে ফেলবে সে। ভাতের মধ্যে দুইটা আলু আর একটা ডিম সিদ্ধ দিয়ে দিবে। বেশি করে পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ কুঁচানো দিয়ে আলু দুটো আর ডিমটা এক সাথে মিশিয়ে সরিষার তেল মাখিয়ে ভর্তা করবে। গতরাত থেকে ওস্তাদ পানি ছাড়া কিছুই খায়নি। ঘুম থেকে উঠে যদি চারটা ভাত মুখে দেয়...

রান্না শেষে কালু ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে–ওস্তাদ তেল চিটচিটে কাঁথা গায়ে জড়িয়ে দিব্যি বসে আছেন। চেহারায় শান্তি-শান্তি ভাব। কালুকে

BanglaBook.org

দেখামাত্রই ওস্তাদ তাঁর স্বভাবসুলভ বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, 'ওরে কালু ভাত-টাত কিছু রান্না করছিস? খিদায় জান যায়।'

ওস্তাদ গরম ভাত সিদ্ধ আলু আর ডিমের সরিষার তেল মাখানো ভর্তা দিয়ে বেশ আয়েশ করে খেলেন। কালুর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি ভরা গলায় বললেন, 'তোরে এমন এক বিদ্যা শিখায়ে দিব, সারা জীবন রাজার হালে থাকবি।'

ওস্তাদের কথা শুনে আনন্দে কালুর চোখে পানি এসে যায়। গত দুইটা দিন যেভাবে কাটল! কালু মুখ আড়াল করে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, 'শিখাইয়েন।' সেই প্রথম দিন থেকে ওস্তাদ প্রায়ই বলেন, তোরে এমন কিছু শিখায়ে দিব, রাজার হালে থাকবি।

'আইজই শিখামু। আমার সময় ফুরাইয়া আইছে। আজরাইল ঘরের আশপাশে ঘুর-ঘুর করতেছে। যে-কোনও সময়...'

ওস্তাদের মুখে 'সময় ফুরাইয়া আইছে' কথাটা শুনে কালুর বুকের ভিতরটা আবার ধক্ ধক্ করে ওঠে। ছলছল চোখে ওস্তাদের দিকে তাকায়।

'আরে ব্যাটা দুখ পাওয়ার কিছু নাই। এমন ব্যবস্থা শিখাইয়া যামু–মরণের পরও তোর সাথে ছায়ার মত থাকুম। কান্দাকান্দি অফ কর। ভাত খাইয়্যা উইঠা, মোতালেব বেপারিরে ডেকে আন।'

মোতালেব বেপারি হচ্ছেন এই বস্তির মালিক। অত্যন্ত রগচটা স্বভাবের লোক। তবে ওস্তাদকে খুব সমীহ করে চলেন। ওস্তাদের জন্য তিনি জান দিতেও প্রস্তুত। মোতালেব বেপারির ছয় মেয়ে। মেয়েগুলোর বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়ে হচ্ছিল না। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। এক দিন ওস্তাদকে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ খুলে বলেন। ওস্তাদ সাত ছটাক নারিকেল তেলে, এক তোলা মেথি গুঁড়া মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে দেন, মেথির সুগন্ধযুক্ত সেই তেল পড়া প্রত্যেক মেয়ের মাথায় তিন দিন করে দিতে বলেন, দেখা যায়–কিছুদিনের মধ্যেই এক-এক করে সবকটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। সেই থেকে মোতালেব বেপারি ওস্তাদকে মাথায় তুলে রাখেন। দুনিয়া এক দিকে ওস্তাদ অন্য দিকে, উনি ওস্তাদকেই বেছে নেবেন।

কালু খাওয়া শেষ করে মোতালেব বেপারিকে গিয়ে ডেকে আনে। কালুকে ঘরের বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে, ওস্তাদ আর মোতালেব বেপারি

BanglaBook.org

নিচু স্বরে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন আলাপ করেন। মোতালেব বেপারি চলে যাওয়ার পর ওস্তাদ কালুকে ডেকে নিজের পাশে বসান। এতদিন ধরে বলে আসা সেই গোপন বিদ্যা শিখিয়ে দেন। কালোজাদুর সমস্ত নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি শেখানোর পর এমন এক কথা বলেন যে কালুর শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। দুঃখী-দুঃখী চেহারায় এসে ভর করে এক রাশ আতঙ্ক। ভয়ে ভয়ে ওস্তাদকে ছুঁয়ে দেখে—সত্যিই ওস্তাদের শরীর ঠাণ্ডা বরফের মত!

কালু যখন ভাত রান্না করতে ব্যস্ত ছিল, তখনই ওস্তাদ ঘরের ভিতরে মারা যান। তাঁর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। মৃত্যুর আগে এমন এক মন্ত্র পড়েন যে, মৃত্যুর পরেও আবার কিছু সময়ের জন্য আত্মাটা এসে অবস্থান নেয় নিথর দেহটায়।

কালু চোখের সামনে দেখতে পায়—ওস্তাদের নাকের ভিতর থেকে ছায়া-ছায়া কী একটা ধোঁয়ার মত কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই অশরীরী কুণ্ডলি ক্ষণে-ক্ষণে বিভিন্ন রঙের জ্যোতি ছড়িয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

বিস্ময় আর ভয় সামলাতে কালু যখন মৃগী রোগীর মত কাঁপতে থাকে তখন হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে তার কাঁধে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত রাখেন। পিছনে তাকিয়ে দেখে, তার ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছেন। দিঘির শান্ত জলে মানুষের প্রতিচ্ছায়া যেমন দেখায় ওস্তাদকে ঠিক তেমন দেখাচ্ছে। বিস্ফারিত চোখে কালু তার সামনে তাকিয়ে দেখে চৌকির উপরে ওস্তাদের মৃত নিথর দেহটা যেভাবে ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। তা হলে পিছনে দাঁড়ানো এই ওস্তাদ কোত্থেকে এল! ভীত চোখে কালুকে বারবার সামনে-পিছনে তাকাতে দেখে, আবছায়া অশরীরী ওস্তাদ শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন। হাসির শব্দ শুনে মনে হয় বহু দূরের অপার্থিব কোনও জগৎ থেকে এই শব্দ ভেসে আসছে।

BanglaBook.org

দুই

মুনার বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে এখন পর্যন্ত একটা সন্তানের মুখ দেখা হলো না। ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ কোনও কিছুই বাদ দেয়নি। কিছুতেই কিছু হলো না।

কাজের বুয়া তাসলিমার কাছ থেকে খবর পেয়ে, আজ রাতে মুনা গিয়েছিল পলাশপুর বস্তির কালু ফকিরের কাছে। বস্তির একেবারে উত্তর মাথায় বিশাল এক শিমুল গাছের নীচে কালু ফকিরের আস্তানা। কালু ফকির নাকি খুবই ক্ষমতাধর। তাঁর কাছ থেকে কেউ-ই কোনদিন বিফল হয়ে ফেরেনি। তাঁর কাছে যেতে হয় অমাবস্যার রাতে, বারোটার পর।

বস্তির প্রায় সব লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে উত্তর কোনার খুপড়ি ঘরটায় নিভু-নিভু করে জ্বলছিল মাটির প্রদীপ। প্রদীপ থেকে ঘি আর করঞ্জা তেল পোড়া কটু গন্ধ বের হচ্ছিল। ঘটের ভিতর থেকে বের হচ্ছিল ধূপ-ধুনা আর লোবানের তীব্র গন্ধযুক্ত ধোঁয়া। ধোঁয়া-ধোঁয়া আলো-আঁধারিতে ঘেরা সেই পরিবেশে, দীর্ঘদেহী মিশমিশে কালো রঙের কালু ফকিরকে দেখে মুনার গা ছমছম করছিল। লোকটার চেহারায় ছিল কেমন বুনো ভাব। চোখ দুটো ছিল নিশাচর প্রাণীদের মত জ্বলজ্বলে। প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছিল মুনার। সাথে থাকা কাজের বুয়া তাসলিমা বারবার অভয় দিচ্ছিল। কালু ফকিরের কাছে যখন তার সমস্যার কথা বলতে যাচ্ছিল তখন লোকটা হাত উঁচিয়ে নিষেধ করে দেয়। দেখে মনে হচ্ছিল, আগে থেকেই সব বুঝতে পারছে লোকটা। লোকটা কেমন স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। ধোঁয়া-ধোঁয়া নীরব সেই মুহূর্তগুলোতে মুনার মনে হচ্ছিল অশরীরী কিছু একটা সমস্ত ঘরের ভিতরে ছুটে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে কালু ফকির তাঁর পিছন থেকে একটা শিমুল ফুলের মালা বের করে মুনার হাতে দিয়ে বলেন, 'আজ রাতে এই মালাটা গলায় দিয়ে ঘুমাবি। তা হলেই তোর ইচ্ছা পূরণ হবে। তবে...' আত্মবিশ্বাসী কর্কশ গলার স্বর। 'তোর জমজ সন্তান হবে।'

BanglaBook.org

মালা হাতে নিয়ে, কাঁপা কাঁপা গলায় মুনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার হাদিয়া?'

লোকটা নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'জন্মের পরই তোর যমজ সন্তানের একটা আমাকে দিতে হবে।'

বাসায় ফিরে আকাশ-পাতাল বিভিন্ন চিন্তায় আচ্ছন্ন মুনা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে। গলায় শিমুল ফুলের সেই ভারি মালা। রাত প্রায় পৌনে তিনটা। একা-একা কিছুটা ভয়-ভয়ও লাগছে। মুনার স্বামী হাসান অফিস থেকে তিন দিনের ট্যুরে সিলেট গিয়েছে। এই সুযোগেই কালু ফকিরের কাছে যাওয়া। হাসান এই সব ঝাড়-ফুঁকে মোটেই বিশ্বাস করে না। শুনলে প্রচণ্ড রেগে যাবে।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল মুনা। সঙ্গে-সঙ্গেই একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

মুনা তার বেডরুমেরই বিছানায় শুয়ে আছে। রুমের তাপমাত্রা কমে হিম-শীতল হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত অস্বস্তি লাগছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও গায়ে জ্বালা-পোড়া হচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ করে রুমের ভেন্টিলেটরের মধ্য দিয়ে দ্রুত বেগে এক রাশ ধোঁয়া ভিতরে ঢুকছে। ধোঁয়াটা ঘুরপাক খেতে খেতে কুণ্ডলি পাকিয়ে দানব আকৃতির একটা অবয়বে পরিণত হয়। অবয়বটা বাতাসে ভর করে ভাসতে ভাসতে মুনার দিকে এগোতে থাকে। প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করতে চায় মুনা, কিন্তু গলা থেকে শব্দ বের করতে পারে না। হাত-পা যেন পাথর হয়ে বিছানার সাথে সেঁটে গিয়েছে। দানব আকৃতির অবয়বটা এসে মুনার উপর চড়াও হয়। নিমিষে তরতাজা ফুলের মালাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর মুনার কাছে মনে হয় স্বপ্নটা শুধু স্বপ্নই ছিল না, অশুভ কিছু একটা ছিল এর মধ্যে। সমস্ত শরীরে বিস্বাদ আর যন্ত্রণা। ভীতু-ভীতু চোখে ভেন্টিলেটারটা, যেটার মধ্য দিয়ে স্বপ্নে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকানো দানবটা এসেছিল এবং চলে গিয়েছিল সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ করে, রুমের ভিতর প্রকট ভাবে ঘি-করঞ্জা তেল পোড়া, ধূপ-ধুনা আর লোবানের মিশ্রিত কটু গন্ধ নাকে লাগছে। ঠিক কালু ফকিরের আস্তানায় পাওয়া সেই একই গন্ধ!

BanglaBook.org

তিন

উপজেলা নির্বাচনের আর মাত্র দশ দিন বাকি।

চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আমজাদ তালুকদারের বেশ ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। সারাদিন নির্বাচনী প্রচারণা; মিটিং, মিছিল, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সাথে দেখা করা। দম ফেলবার যেন ফুরসত নেই। গত দুইবার তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন। এবারও যে হবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে হারুন মৃধা নামে আর এক প্রার্থীও বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন। এবারে তাঁরও অনেক সাপোর্টার দেখা যাচ্ছে।

রাত বারোটা। আমজাদ তালুকদার সারাদিনের ব্যস্ততার পর রাতের খাওয়া শেষে বিছানায় শুয়েছেন। তাঁর স্ত্রী লতিফা গিয়েছেন জর্দা দিয়ে পান বানিয়ে আনতে। আমজাদ তালুকদার শুয়ে-শুয়ে ভাবছেন—হারুন মৃধা কি এবারে জিতেই যাবে নাকি! আরে না, তা সম্ভব নয়। গত দুইবার নির্বাচিত হয়ে যে পরিমাণ এলাকার উন্নয়ন করেছি...। তবে শোনা যায় হারুন মৃধা নাকি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্যে কালু ফকিরের ফিকির নিয়েছে। ফকির ধরেই যদি নির্বাচনে জয়ী হওয়া যেত! সূক্ষ্ম হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটের কোণে। তবে আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারণার জন্য যখন বাড়ি-বাড়ি গিয়েছেন তখন একটা বাজপাখি তাঁর মাথার উপরে সারাক্ষণ উড়াউড়ি করেছে। পাখিটা কেমন হিংস্র ভাবে তাকাচ্ছিল। এমনকী মিছিলের সময়ও মাথার উপরে উড়াউড়ি করেছে। আরে, ও কিছু না, নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেন।

লতিফা পান নিয়ে এখনও আসছে না কেন! ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

হঠাৎ আমজাদ তালুকদারের নাকে তীব্র কটু গন্ধ লাগে। প্রথমে মনে করেছিল—লতিফা পান নিয়ে এসেছে। জর্দার গন্ধ। চোখ মেলে দেখেন, না, লতিফা আসেনি। (লতিফা আসবেই বা কী করে! আমজাদ তালুকদারের

BanglaBook.org

জন্যে পান আনতে গিয়ে লতিফা বেগম বিদ্যুৎস্পৃশ্য হয়ে মরে পড়ে আছেন।) গন্ধটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। পোড়া ঘি, ধূপ-ধুনা আর লোবানের মিশ্রিত গন্ধ। ভীষণ অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘরের ভিতরে অশরীরী কিছু উপস্থিত হয়েছে!

সেই মুহূর্তে আমজাদ তালুকদার যদি তাঁর বিছানা সোজা সিলিং-এ লক্ষ করতেন, তা হলে দেখতে পেতেন–ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটা সিলিং-এর হুকের সাথে যে নাট-স্ক্রু দিয়ে সংযুক্ত সেটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। একটু পরেই চলন্ত ফ্যানটা তাঁর গায়ের উপর খুলে পড়বে। অপঘাতে মৃত্যু হবে তাঁর।

চার

প্রাইভেট ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার আজাদ সাহেব অফিস থেকে ফিরে হট শাওয়ার নিচ্ছেন। তাঁর মনটা আজ খুব প্রফুল্ল। কারণ এতদিনের কাঙ্ক্ষিত প্রমোশনটা যে তিনিই পাবেন আজ তা মোটামুটি নিশ্চিত। এতদিন অনেকটা অনিশ্চয়তা ছিল। তাঁর কলিগ মকবুল সাহেবও এই প্রমোশনটার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। একে ধরা, ওকে ধরা, মন্ত্রীদের দিয়ে তদ্বির করানো, এমনকী কালু ফকির নামে এক ফকিরও ধরেছেন! কিন্তু সব চেষ্টা বিফল করে, প্রমোশনটা শেষ পর্যন্ত আজাদ সাহেবই পাচ্ছেন।

বাথরুমের নির্জনতার মধ্যে গুন-গুন করে গান শুরু করেন আজাদ সাহেব। 'পুরানো সেই...দিনের কথা... ভুলবি কীরে...হায়...

একটা বিষয় মনে পড়ে হঠাৎ গান গাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। গত দুই-তিন দিন ধরে আজাদ সাহেব লক্ষ করেছেন পথে ঘাটে বিভিন্ন জায়গায় মিশমিশে কালো রঙের একটা পাগলা কুকুর তাঁর পিছু নেয়। অফিসে থাকা অবস্থায় অফিসের সামনে বসে থাকে। আবার বাসায় ফিরলে বাসার সামনে বসে থাকে। কুকুরটা কেমন বুনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যাই হোক, কুকুরটা কখনও আক্রমণ করেনি বা সেরকম কোনও লক্ষণও দেখা যায়নি।

BanglaBook.org

আবার গুন গুন করে গান গাইতে শুরু করেন। হঠাৎ প্রচণ্ড অস্বস্তির সাথে লক্ষ করেন বাথরুমের ভিতরে তীব্র কটু গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে।

সেই মুহূর্তে আজাদ সাহেব যদি পিছনে তাকাতেন তা হলে দেখতে পেতেন–বাথরুমের দেয়াল ফুঁড়ে সেই পাগলা কুকুরটা বুনো দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। আর সোপকেস থেকে সাবানটা দেয়াল বেয়ে জীবন্ত প্রাণীর মত সরসর করে তাঁর পায়ের কাছে চলে আসছে। একটু পরে সাবানটার উপর পা ফেলেই ধপাস করে পড়ে যাবেন তিনি। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে, ব্রেন হেমারেজে মৃত্যু হবে তাঁর।

পাঁচ

পলাশপুর থানার ওসির সামনে বসে আছেন, দৈনিক সূর্য উদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার জাহিদ হাসান। তাঁদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে কালু ফকিরকে নিয়ে।

'ওসি সাহেব, গত তিন-চার বছর ধরে অনেক ধরনের গুজব শুনছি কালু ফকিরের নামে। আপনারা কোনও অ্যাকশনে যাচ্ছেন না কেন?'

'ওই যে বললেন গুজব, সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ তো পাচ্ছি না। অনেক দম্পতি এসে অভিযোগ করে তাদের যমজ বাচ্চার একটি কালু ফকির নিয়ে যাচ্ছেন। ডায়েরি করে চলে যায়, পরে আর কোনও খোঁজ-খবর থাকে না। এ ছাড়া কালু ফকিরকে ধরার জন্যে বস্তিতে কয়েকবার হানা দিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর টিকিটিরও দেখা পাইনি।'

'ঠিকই বলেছেন, তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে কয়েকবার বস্তিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর দেখা পাইনি।'

'জাহিদ সাহেব, আপনাদের পত্রিকায় একটা ধারাবাহিক প্রতিবেদন লিখুন না কালু ফকিরের নামে।'

'সেরকমই ভাবছি, তবে কিছুটা ভয় পাচ্ছি লোকটা সম্পর্কে মানুষের ধারণার কথা শুনে। সবার ধারণা লোকটা কালোজাদুকর। শেষ পর্যন্ত কালু

BanglaBook.org

ফকিরের রোষানলে পড়ে অপঘাতে...'

'সাংবাদিক হয়ে আজগুবি কী সব কথা বলছেন!'

সাংবাদিক জাহিদ হাসান কালু ফকিরকে নিয়ে লেখা প্রতিবেদনটা তাঁদের পত্রিকা অফিসে জমা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন। তাঁর মোটরসাইকেলটাকে একটা কালো মাইক্রোবাস ধাক্কা দেয়। ওটা তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সেদিন রাতেই সমস্ত পলাশপুর বস্তি আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কালু ফকিরের আস্তানাও ধ্বংস হয়ে যায়। সেদিনের পর থেকে কালু ফকিরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই ধরে নেয় আগুনে পুড়ে বিকৃত পঁচিশটা লাশের কোনও একটা হয়তো কালু ফকিরের। তবে কালু ফকিরের আস্তানার শিমুল গাছটা পুড়ে যাওয়া ধ্বংস স্তূপের মধ্যে আগের মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছয়

তিরিশ বছর আগে শৈত্য প্রবাহ আর প্রচণ্ড শীতের মাঘ মাসের এক রাতে, আজকের কালু ফকিরের ওস্তাদ মজিবর পাগলার রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিল। কিশোর কালুর চোখে-মুখে সেদিন ছিল দিশেহারা ভাব। এর পরেও ওস্তাদের নির্দেশ মত করেছিল প্রত্যেকটি কাজ। ওস্তাদকে কবর দিয়েছিল ঘরের মেঝে খুঁড়ে, ঘরের মধ্যে। নির্দেশ মত কবর দেওয়ার আগে লাশের মুখে দিয়েছিল সদ্য প্রসবকৃত শিশুর বলি হওয়া তাজা রক্ত। আর রক্ত ভরা সেই মুখের ভিতর গুঁজে দিয়েছিল শিমুল গাছের বিচি।

কবরের ভিতর থেকে গজানো শিমুলের সবল চারা প্রতিদিনের পরিচর্যা আর যত্নে বিশ বছর পর পরিণত হয় বিশাল এক মহীরুহে। এদিকে কিশোর কালুও ততদিনে পরিণত হয় কালু ফকিরে। ওস্তাদের নির্দেশ মত অমাবস্যার রাতে মাটির প্রদীপে ঘি আর করঞ্জা তেলের মিশ্রণে শিমুল গাছটার তুলা থেকে তৈরি সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপ-ধুনা আর

BanglaBook.org

লোবানের গন্ধ সৃষ্টি করলে, ভয়ঙ্কর সব প্রেতাত্মারা ছুটে আসে। সেই সব প্রেতাত্মারা হয় কালু ফকিরের হুকুমের গোলাম। প্রেতাত্মাদের খুশি রাখতে প্রতি বছর মাঘ মাসের অমাবস্যার রাতে, সদ্য প্রসবকৃত শিশু বলি দিয়ে শিমুল গাছটার গোড়ায় পুঁতে দিতে হয়।

পরিশিষ্ট

পলাশপুরের যে এলাকাটায় বস্তি ছিল, সে এলাকাটা এখন ধনাঢ্য আবাসিক এলাকায় রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু কালু ফকিরের আস্তানার শিমুল গাছটা আগের মতই বিশাল সব অট্টালিকার সাথে পাল্লা দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিমুল গাছটা সংলগ্ন বাড়ির মালিক ক.চ. ডেমিনি নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক জাদুকর। এই জাদুকর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য সব জাদু দেখিয়ে থাকেন। দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণের অধিকারী সেই জাদুকরের চোখ দুটিতে কেমন দুঃখী-দুঃখী ভাব। বহু বছর আগে ওস্তাদ মজিবর পাগলার সাগরেদ কিশোর কালুর চোখ দুটিতে যেমন দুঃখী-দুঃখী ভাব ছিল, ঠিক তেমন!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অতিমানব

এক

গতরাতে খুব ঝড় হয়েছে। একেবারে লণ্ডভণ্ড করা ঝড়। রাতুলের রুমের জানালার পাশের বড় আম গাছটায় একটা কাক তার স্বরে চেঁচাচ্ছে।

কাকটার একগুঁয়ে ডাকের শব্দে রাতুলের ঘুম ভেঙে গেল। রাতুল বিছানা থেকে নেমে ছোট ছোট পা ফেলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কাকটাকে দেখা গেল। কাকটা আম গাছটার এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে উড়ে উদ্বিগ্ন ভাবে ডেকেই যাচ্ছে। কাকটার গায়ের পালক উস্কখুস্ক, চেহারায় কেমন ছন্নছাড়া ভাব। গত রাতের ঝড়ো বাতাসে হয়তো কাকটার অমন অবস্থা হয়েছে।

রাতুল গভীর মনোযোগের সাথে কাকটাকে দেখছে আর কাকটা উদ্বিগ্নভাবে ডেকেই যাচ্ছে।

কাকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাতুলের মনে হলো–সে কাকটার মনের কথা বুঝতে পারছে। কাকটা কাঁদছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে। গতরাতের ঝড় কাকটার বাসা উড়িয়ে নিয়েছে। বাসায় তার সঙ্গিনী আর দুটো বাচ্চা ছিল। ভোর হওয়ার পর থেকে কাকটা তার সঙ্গিনী আর বাচ্চাদের খুঁজে ফিরছে। কোথাও তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। তাই কাকটা এখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে।

রাতুলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে মনে-মনে সৃষ্টিকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে সৃষ্টিকর্তা, তুমি কাকটার সঙ্গিনী আর বাচ্চাদের ফিরিয়ে দাও।'

এক সময় কাকটা ডানা ঝাপটে উড়ে দূরে কোথাও চলে গেল। রাতুলও মন খারাপ নিয়ে তার রুম থেকে বেরুল। সে ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে তাদের বসার ঘরে পৌঁছল।

BanglaBook.org

বসার ঘরে রাতুলের বাবা আরিফ আহমেদ খবরের কাগজ পড়ছেন। রাতুলকে দেখে তিনি খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'হ্যালো, লিট্‌ল্ জিনিয়াস, গুড মর্নিং।'

রাতুল কিছু বলল না। সে গম্ভীর হয়ে রইল। অন্য সব দিনে বাবা 'গুড মর্নিং' বলার পরে সেও গুড মর্নিং বলে প্রতিউত্তর দেয়। আজ তার মন ভাল নেই। কাকটার জন্য তার ভীষণ খারাপ লাগছে।

'কী হলো, লিটল জিনিয়াস, মন খারাপ কেন? কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?'

রাতুল দু'দিকে মাথা নেড়ে জানাল–সে কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখেনি।

'তা হলে আমার লিটল জিনিয়াসের মন খারাপ কেন! দেখি কাছে এসো তো, কপালে একটা পাপ্পা দিয়ে দেই।'

রাতুল তার বাবার কাছে গেল না। সে মাথা নুইয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিদিন সকালে তার বাবা তার কপালে একটা চুমো খায়। এই ব্যাপারটায় তার খুব লজ্জা লাগে। সে এখন আর ছোট নেই, যথেষ্ট বড় হয়েছে। তার বয়স এখন ছয় বছর, সামনের জুলাইতে সাতে পা দেবে।

'লিটল জিনিয়াসের দেখি আজ সত্যি সত্যিই খুব মন খারাপ। মন খারাপ কেন? আমাকে বলো, দেখি তোমার মন ভাল করে দিতে পারি কিনা।'

রাতুল কিছুই বলল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আরিফ আহমেদ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিলেন। তিনি তাঁর দেবশিশুর মত সুন্দর ছোট্ট ছেলেটাকে একেবারেই বুঝতে পারেন না। তাঁর এই বাচ্চা ছেলেটা সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। অন্য সব বাচ্চাদের মত কখনও হৈ-হুল্লোড়, দুষ্টুমি করে না। বাচ্চা ছেলে-পুলে যদি বাচ্চাদের মত আচরণ না করে তা হলে কি ভাল লাগে! তবে ছেলেটা খুবই বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। একটা কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের ক্লাস ওয়ানের ফার্স্ট বয়। তাকে কখনোই তেমন পড়াশুনা করতে দেখা যায় না। অথচ পরীক্ষায় ঠিকই ফার্স্ট হয়। যে কোনও বিষয় একবার শুনলেই মনে রাখতে পারে। তার বয়সী অন্য সব ছেলে-মেয়েদের চেয়ে তার বোঝার ক্ষমতাও অনেক বেশি। ছেলের মেধার এবং বুদ্ধির এমন তীক্ষ্ণ ধার দেখে তিনি ভালবেসে ছেলের নাম

BanglaBook.org

দিয়েছেন–লিটল জিনিয়াস। এমন একটা ছেলের বাবা হতে পেরে তিনি খুবই গর্বিত বোধ করেন। শুধু মাঝে মাঝে ছেলের কিছু কিছু আচরণে তিনি ব্যথিত হন। এই যেমন এখন–ছেলেটার কী জন্যে মন খারাপ কিছুতেই বলছে না। ছোট্ট একটা বাচ্চা ছেলে, সে কেন বড়দের মত নিজের ভাললাগা-খারাপ লাগাগুলো নিজের মনেই গোপন করে রাখবে।

রাতুল গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'বাবা, আমি অন্য সব বাচ্চাদের মত নই বলে তোমার কি খুব খারাপ লাগে?'

ছেলের এমন প্রশ্নে আরিফ আহমেদ থতমত খেলেন। ছেলের চোখের চাহনি দেখে মনে হচ্ছে–তিনি এতক্ষণ যা ভেবেছেন তা সবই সে বুঝে ফেলেছে। তিনি নিজেকে সামলে অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'না মানে, তুমি তোমার মন খারাপের কারণ বলছ না বলে আমার খারাপ লাগছে।'

রাতুল শীতল চোখে কিছুক্ষণ বাবার চোখে চোখ রাখার পর বলল, 'আমার মন খারাপ একটা কাকের জন্য।'

আরিফ আহমেদ অবাক হয়ে বললেন, 'কাকের জন্য! একটা কাকের জন্য তোমার মন খারাপ! কী বলছ!'

'সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, আমার জানালার পাশের বড় আম গাছটায় একটা কাক দেখেছি, সেই কাকটার জন্যই আমার মন খারাপ।'

আরিফ আহমেদ বিস্মিত ভাবটা সামলে বললেন, 'কাকটার জন্য কেন তোমার মন খারাপ?'

'কাকটা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাকছিল। আসলে কাকটা ডাকছিল না, কাঁদছিল। গতরাতের ঝড় ওর বাসা ভেঙে উড়িয়ে নিয়েছে। বাসায় ওর বাচ্চারা আর সঙ্গিনী ছিল। ও এখন ওর বাচ্চাদের আর সঙ্গিনীকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

আরিফ আহমেদ হো-হো করে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা ঝড়ো কাককে দেখে তোমার এত কিছু মনে হলো! এসো আমার কাছে এসো, একটা পাপ্পা দিয়ে দেই, মন ভাল হয়ে যাবে।'

রাতুল তার বাবার কাছে গেল না। সে দৃঢ়তার সাথে বলল, 'আমার যা মনে হয়েছে তা বলিনি, যেটা সত্যি সেটাই বলেছি।'

আরিফ আহমেদ ছেলের কল্পনাশক্তি দেখে মনে মনে খুশিই হলেন।

BanglaBook.org

যার কল্পনাশক্তি যত বেশি সে তত প্রতিভাবান। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যত বড় বড় আবিষ্কার প্রথমে কারও কল্পনায় এসেছে, পরে বাস্তবে।

রাতুলের মা তানিয়া এসে বসার ঘরে ঢুকলেন। তানিয়া, আরিফ আহমেদ এবং রাতুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সকাল সকাল বাবা-ছেলের মধ্যে কী নিয়ে এত গল্প-গুজব হচ্ছে?'

আরিফ আহমেদ হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার ছেলের মন খারাপ। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটা ঝড়ো কাককে দেখে তার মন খারাপ হয়েছে। কাকটাকে দেখে তার মনে হয়েছে...'

তানিয়া রাতুলের কাছে এসে ঝপ করে রাতুলকে কোলে তুলে নিলেন। কোলে তুলে নিয়েই রাতুলের নাক টেনে, রেশমি চুল এলোমেলো করে দিয়ে বিভিন্নভাবে আদর জানাতে লাগলেন। চপ চপ করে দু'গালে দুটো চুমোও খেলেন। আর মুখে বলতে লাগলেন, 'আমার সোনা বাবুটার মন খারাপ কেন দেখি... কেন মন খারাপ... সোনা বাবুটার...'

রাতুলের খুব লজ্জা লাগছে। এত বড় ছেলেকে কোনও মা কোলে তুলে নেয়! কোলে তুলে নিয়েছে তো নিয়েছে আবার বাচ্চাদের মত আদরও করছে! মায়ের কোলে লজ্জায় রাতুল একেবারে চুপসে গেল।

তানিয়া রাতুলকে কোলে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে আরিফ আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নাস্তা করতে এসো, নাস্তা রেডি।'

BanglaBook.org

দুই

বেলা এগারোটা।

রাতুল বসার ঘরের জানালার পাশে বসে আছে।

রাতুলের বাবা-মা কেউই বাসায় নেই। কাজের বুয়া আকলিমার কাছে রাতুলকে রেখে, বাবা-মা দু'জনেই গেছে অফিসে। রাতুলের বাবা আরিফ আহমেদ একটা সরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার আর মা তানিয়া একটা বেসরকারি কলেজের ইতিহাসের লেকচারার।

রাতুলদের কাজের বুয়া আকলিমা প্রতিদিন সকাল নয়টা-দশটার দিকে রাতুলদের বাড়িতে আসে। সারাদিন রাতুলদের বাড়িতেই থাকে। ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে রান্না-বান্না সবই করে। সন্ধ্যার পরে রাতের খাবার নিয়ে ফিরে যায়। কাছেই একটা বস্তিতে তার নিবাস। আকলিমার বয়স একুশ-বাইশ। গায়ের রং শ্যামলা। বেঁটে-খাটো রোগা-পাতলা চেহারা। অবিবাহিতা।

এই মুহূর্তে বাসায় রাতুল একেবারে একা। কাজের বুয়া আকলিমাও বাসায় নেই। আকলিমা রাস্তার মোড়ের মুদি দোকানটায় গেছে–আলু, ডিম, পিঁয়াজ, আদা...আরও কী সব যেন কিনে আনতে।

রাতুল আজ স্কুলে যায়নি। সে প্রায়ই স্কুল কামাই দেয়। স্কুলে যেতে তার ভাল লাগে না। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বড্ড বেশি হৈ-হুল্লোড় আর দুষ্টুমি করে–রাতুলের খুব বিরক্তি লাগে। হৈ-হুল্লোড়, দুষ্টুমি রাতুলের একদমই পছন্দ না। সে একা একা থাকতে পছন্দ করে। একা একা থাকলে অনেক কিছু বোঝা যায়, অনেক কিছু দেখা যায়। এই যেমন এখন সে বসার ঘরের জানালার পাশে বসে তাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখছে। রাস্তা দিয়ে কত লোকজন আসা-যাওয়া করছে। বিভিন্ন ধরনের লোক–কম বয়েসী, বেশি বয়েসী, পুরুষ লোক, মেয়ে লোক, গরিব লোক, ধনী লোক...কত বিচিত্র ধরনের লোক। বিচিত্র সব লোকজনের বিচিত্র সব চিন্তা-ভাবনা। এতটা দূরে বসেও রাতুল প্রত্যেকটা লোকের চিন্তা-ভাবনাগুলো বুঝতে পারছে।

একটু আগে বিশাল ভুঁড়িওয়ালা এক লোক রিকশায় চড়ে যাচ্ছিল। লোকটার পায়ের কাছে বাজারের ব্যাগ ছিল। ব্যাগ ভর্তি ছিল বাজার। লোকটা মনে মনে ভাবছিল, বাসায় গিয়ে আজ স্ত্রীকে বলবে–সরিষা ইলিশ রাঁধতে। অনেক দিন সরিষা ইলিশ খাওয়া হয়নি। সরিষা ইলিশ, লালশাক দিয়ে চিংড়ি মাছ আর ঝাল ঝাল ভুনা গরুর মাংস। মাংসে পিঁয়াজ বেশি দিতে বলবে, পিঁয়াজ বেশি দিলে স্বাদ বেড়ে দ্বিগুণ হবে... লোকটার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা জুড়ে শুধু খাওয়া-খাদ্য। অত্যন্ত পেটুক ধরনের লোক। আর লোকটা যে রিকশায় চড়া ছিল সেই রোগা-পাতলা রিকশাওয়ালার চিন্তা-ভাবনা ছিল–শালার কী এক মোটকুরে রিকশায় লইছি, অহন রিকশা টানতে

BanglaBook.org

অবস্থা কেরোসিন। হালার পুতে কী খাইয়া এত মোডা হইল আল্লায়ই জানে। হালায় মানুষ না হাতি...

আর এক বোরখা পরা মহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাঝ বয়েসী মহিলা। কালো বোরখার অন্তরাল থেকে মহিলার শুধু মুখমণ্ডলটা দেখা যাচ্ছিল। মহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন–অতগুলো টাকা তিন দিনের মধ্যে কী করে তিনি জোগাড় করবেন। মহিলার ছেলের ফরম ফিলাপ। ফরম ফিলাপে টাকাটা লাগবে। মহিলা চিন্তায় অস্থির হয়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন টাকাটা ধার চাইতে। ভাই টাকাটা তো দেয়ইনি উল্টো দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এক বুক কষ্ট নিয়ে মহিলা তাঁর ভাইয়ের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন। দুঃখভারাক্রান্ত মনে মহিলা ভাবছেন–তাঁর স্বামী যদি এমন অল্প বয়সে মারা না যেতেন তা হলে তাঁদের আজ এমন দুরবস্থা হত না। পাঠগার ডট নেট থেকে সংগৃহিত।

বোরখা পরা বিধবা সেই মহিলার জন্য রাতুলের মনটা কেঁদে উঠল। রাতুল সৃষ্টিকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে সৃষ্টিকর্তা, ওই মহিলার টাকাটা জোগাড় করে দিন।'

রাতুল জানে–সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছে করলে সব কিছুই করতে পারেন। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তাকে তেমন কেউ ধারণাও দেয়নি, সে নিজে নিজেই অনুভব করতে শিখেছে–এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনও একজনের ইশারায় চলে। সেই একজনই হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা।

নয়-দশ বছরের একটা ছেলে তার বাবার হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে–এই দৃশ্য দেখার পর রাতুলের মন ভাল হয়ে গেল। ছেলেটার মনে খুব আনন্দ। ছেলেটার বাবা ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে ফুটবল কিনতে যাচ্ছে। ছেলেটার অনেক দিনের শখ একটা ফুটবল কেনা। সে রোজ রোজ বাবাকে বলত, ফুটবল কিনে দেবার জন্য। বাবা কিনে আনত না। ফুটবলের কথা বলে বেশ কয়েকদিন বাবার ধমকও খেয়েছে ছেলেটা। আজ বাবাকে ফুটবলের কথা বলার পর বাবা একটুও রাগ দেখালেন না, কী মনে করে যেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'চল, তোর পছন্দসই ফুটবল কিনে আনি।' বাবার কথা শুনে প্রথমে তো ছেলেটার বিশ্বাসই হলো না। পরে যখন দেখল–সত্যি সত্যিই বাবা ফুটবল কিনে আনার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুচ্ছেন, তখন তো

BanglaBook.org

ছেলেটা আনন্দে একেবারে আত্মহারা।

রাতুল ছেলেটার বাবার দিকে নজর দিল, ছেলেটার বাবা এই মুহূর্তে কী ভাবছেন সেটা বোঝার জন্য।

ছেলেটার বাবার মনেও আনন্দ হচ্ছে। ছেলের খুশি দেখে বাবারও খুশি লাগছে। বাবার মনের ভিতর আনন্দ আর খুশির অন্তরালে শংকাও হচ্ছে। তিনি অতি সামান্য বেতনের একটি চাকরি করেন। বেতনের টাকা দিয়ে সংসার চালাতেই তাঁকে হিমশিম খেতে হয়। প্রতিটা মাস তাঁদের কোনওরকমে টেনে টুনে চলে। এর মধ্যে ছেলের আবদার রক্ষা করতে ফুটবল কিনে দিতে হচ্ছে। অনেকগুলো টাকা চলে যাবে। সবেমাত্র মাসের পনেরো তারিখ, আরও কতগুলো দিন সামনে।

রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করা বিচিত্র সব মানুষের বিচিত্র সব চিন্তা-ভাবনা দেখতে রাতুলের খুব ভাল লাগে। কখনও তার মন খারাপ হয়ে যায়, কখনও মন ভাল হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু মানুষ দেখে মনে আতঙ্ক জন্ম নেয়। কিছু কিছু মানুষের মনের ভিতরটা এত কুৎসিত আর নোংরা যে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। কুৎসিত আর নোংরা মানসিকতার মানুষদের মনের ভিতরটা দেখতে রাতুলের ভালও লাগে না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে। মাথার ভিতরে ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হয়।

এই তো কিছুক্ষণ আগে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একটা লোক আর বারো-তেরো বছরের একটা মেয়ে রিকশায় চড়ে যাচ্ছিল। লোকটা মেয়েটার দূর সম্পর্কের কেমন যেন মামা হয়। দূর সম্পর্কের মামা হলে হবে কী! মেয়েটা লোকটাকে আপন মামার মতই ভাবে। মেয়েটা লোকটাকে খুব পছন্দ করে এবং শ্রদ্ধা করে। কিন্তু লোকটা মনে মনে মেয়েটাকে মোটেই ভাগ্নি মনে করে না। লোকটার মনের ভিতর মেয়েটার প্রতি আদর-ভালবাসা তো দূরে থাক বরং কুৎসিত, নোংরা, লালসা ভরা বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনায় পরিপূর্ণ।

আগে রাতুল মনে করত প্রতিটা মানুষই তার মত অন্যের চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় লক্ষ করে রাতুল বুঝতে পেরেছে কেউই আর তার মত অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে না। এই যেমন—ওই মেয়েটা তার দূর সম্পর্কের মামার মনের কুৎসিত চিন্তা-ভাবনাগুলো বুঝতে

BanglaBook.org

পারছে না। এ ছাড়া আরও কিছু ছোট ছোট বিষয় পরীক্ষা করে রাতুল নিশ্চিত হয়েছে সে ছাড়া আর কেউই মানুষের মনের ভাষা বুঝতে পারে না।

রাতুলের দুধ খেতে মোটেই ভাল লাগে না। এর পরেও রাতুলের মা রোজ রাতুলকে রুটিন মাফিক তিন গ্লাস দুধ খাওয়ান। রাতুল যখন দুধ খেয়ে শেষ করে খালি গ্লাস মায়ের হাতে দেয় মা তখন খুশি হন। মা মনে করেন রাতুল দুধ খেতে খুব পছন্দ করে। রাতুল তো মাকে খুশি করার জন্য অনিচ্ছা সহকারে দুধ খেয়ে শেষ করে। মা একটুও বুঝতে পারেন না যে রাতুল ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুধ খাচ্ছে। মা তার মনের কথা একটুও বুঝতে পারেন না।

রাতুলের বাবা মাঝে মাঝে বলেন, 'এই যে, লিটল জিনিয়াস, তুমি তো একটুও লেখা-পড়া করো না। লেখা-পড়া না করলে তো তুমি আর জিনিয়াস থাকবে না।'

রাতুল বলে, 'আমার লেখা-পড়া করতে ভাল লাগে না।'

বাবা বলেন, 'লেখা-পড়া করতে ভাল না লাগা তো খুব খারাপ কথা! তুমি তো তা হলে আর পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারবে না।'

রাতুল বাবাকে সত্যি কথাটা বলে না। সত্যিটা হলো–রাতুলের সমস্ত বই মুখস্থ হয়ে গেছে। যে বই একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে যায় সেই বই বারবার পড়ে কী লাভ! বাবা তার মনের ভাবনা বুঝতে পারেন না।

এভাবে রাতুল আরও অনেক ধরনের ছোটখাটো পরীক্ষা করে দেখেছে, তার মত কেউ আর অন্যের মনের ভাবনা বুঝতে পারে না। কাজের বুয়া আকলিমা, স্কুলের টিচাররা, সহপাঠিরা... কেউই অন্যের ভাবনা বুঝতে পারে না।

এক ঘণ্টা পর কাজের বুয়া আকলিমা ফিরে এসেছে।

আকলিমা যাওয়ার পর রাতুল দরজার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে, চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল। আকলিমাই ওভাবে দরজা আটকিয়ে দিতে বলেছিল। আকলিমা এখন দরজা খুলতে বলছে। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাকছে, 'ছোড মিয়া...ও ছোড মিয়া...দরজাডা খুলেন...'

BanglaBook.org

রাতুল সোফায় বসে বসে দরজার ছিটকিনির দিকে তাকিয়ে ভাবছে–কী ঝামেলা! এখন আবার চেয়ার টেনে নিয়ে দরজা খুলতে হবে। ছিটকিনিটা এমনি এমনি খুলে যেতে পারে না। ছিটকিনির দিকে তাকিয়ে সে ভাবছে–চাপানো ছিটকিনির বল্টুটা প্রথমে টেনে তুলে, জোরে নীচে টান দিতে হবে। কী অবাক কাণ্ড, সত্যি সত্যিই ছিটকিনিটা এমনি এমনি খুলে যাচ্ছে। রাতুলের ভাবনার সাথে একাত্ম হয়ে ছিটকিনিটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

ছিটকিনি খোলার সাথে সাথেই আকলিমা ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। সে মোটেই লক্ষ করল না রাতুল যে ছিটকিনিটা খোলেনি। রাতুল সোফায় বসে আছে, ছিটকিনি এমনি এমনি খুলে গিয়েছে।

আকলিমা নিজের মনেই বলতে লাগল, 'ছোড মিয়া, অনেক দেরি হইয়া গেছে। অহনই রান্না চড়াইতে হইবে। কী করুম কন! দোহানদার ব্যাডা একটা হারামি, খালি মশকারা করে। হ্যান-ত্যান ধানাই-পানাই কইরা খালি সময় নষ্ট করে। যে সদায় লইয়া দশ মিনিটে আওয়া যায় হেই সদায় দিতে এক ঘণ্টা লাগায়...' কথা বলতে বলতে খিল খিল করে হাসে আকলিমা।

রাতুল আকলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে, আকলিমা মুখে দোকানদারকে হারামি বললেও তার মন বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আকলিমার মনের ভিতর অন্য রকমের এক ধরনের খুশির ঝিলিক দিচ্ছে। দোকানদারের কথা শুনতে, দোকানদারের কাছাকাছি থাকতে তার খুব ভাল লাগে। এই ভাল লাগার ধরনটা রাতুল ঠিক বুঝতে পারে না। রাতুলের বাবা-মায়ের মধ্যেও একে-অপরের প্রতি এই ভাল লাগাটা সে মাঝে মাঝে দেখতে পায়। এই ভাল লাগার মানে হয়তো সে বড় হলে বুঝতে পারবে। এখনই তার বোঝার কোনও ইচ্ছেও নেই। সে বোঝার চেষ্টা করছে অন্য একটা বিষয়–দরজার ছিটকিনিটা এমনি এমনি খুলে গেল কীভাবে!!!

BanglaBook.org

তিন

রাত দশটা।

রাতুল, রাতুলের বাবা আরিফ আহমেদ, রাতুলের মা তানিয়া তিনজনই খাবার টেবিলে। তারা রাতের খাবার খাচ্ছে। খাবারের মেন্যু হচ্ছে–ভাত, করল্লা ভাজা, বেগুন ভাজা, ইলিশ মাছ আর ঘন করে রান্না করা মসুর ডাল।

বাইরে দমকা হাওয়া বইছে। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে।

রাতুল নিজের হাতে ভাত মেখে খাচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে রাতুল নিজের হাতে ভাত খায়। আগে রাতুলের মা তাকে ভাত খাইয়ে দিতেন। মায়ের হাতে ভাত খেতে তার ঘোর আপত্তি। সে এখন বড় হয়েছে, সে নিজে নিজেই খেতে পারে, সে কেন অন্যের হাতে ভাত খাবে? ছেলের এমন দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাতুলের মা আজকাল রাতুলকে নিজ হাতেই খেতে দেন। রাতুল নিজের হাতে বড়দের মতই গুছিয়ে শান্ত ভাবে খায়। খাবারের কোনও আইটেমের প্রতি তার কোনও রকম অনিহাও দেখা যায় না। এই যেমন আজ সে করল্লা ভাজা দিয়েই চুপচাপ খেয়ে ফেলল। সাধারণত দেখা যায় বাচ্চারা করল্লা, সবজি, শাক...এ জাতীয় খাবার খেতে চায় না। কিন্তু রাতুলের মধ্যে তেমনটা দেখা যায় না। সে গম্ভীর হয়ে সব খাবারই খেয়ে ওঠে। সে কাঁটাওয়ালা মাছও নিজ হাতে বেছে খায়। রাতুলের মা মাছের কাঁটা বেছে দিতে চান কিন্তু তাতে রাতুল রাজি হয় না।

করল্লা ভাজা, বেগুন ভাজা খাওয়া শেষে তানিয়া, আরিফ আহমেদ, রাতুল এবং নিজের পাতে যথাক্রমে বড় বড় পিসের ইলিশ মাছ ভাজা এক পিস করে তুলে দিতে লাগলেন। ঠিক তখনই প্রচণ্ড বেগে ঝড় শুরু হলো। শোঁ-শোঁ করে প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ, এর পরেও ভিতরে বসে ঝড়ের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বাইরেটা যেন তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ঝড় শুরু হওয়ার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। সমস্ত ঘর ডুবে গেল নিকষ অন্ধকারে। আরিফ আহমেদ উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'চার্জার ল্যাম্পটা কোথায়?'

তানিয়া বললেন, 'শোবার ঘরে চার্জে দেওয়া। আমি গিয়ে নিয়ে আসছি। তোমরা চুপচাপ বসে থাক, একটুও নড়াচড়া কোরো না। নড়াচড়া করলে অন্ধকারে কোনও কিছুতে ধাক্কা লেগে পড়ে যাবে।'

তানিয়া এতদিনের পরিচিত ঘরে, অন্ধকারের মাঝেই অনুমান করতে করতে শোবার ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন।

আরিফ আহমেদ আর রাতুল অন্ধকারের মাঝে খাবার টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। বাইরে শোঁ-শোঁ করে বইছে ঝড়ো হাওয়া। তানিয়া বোধহয় শোবার ঘরে পৌঁছে গেছেন। শোবার ঘর থেকে ঝন করে একটা শব্দ হলো।

আরিফ আহমেদ গলা উঁচিয়ে তানিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'চার্জার ল্যাম্পটা কি পেলে?'

শোবার ঘর থেকে তানিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল, 'একটু অপেক্ষা করো, এখনই পেয়ে যাব।'

আরিফ আহমেদ তাঁর ডান পাশে বসা রাতুলের কথা খেয়াল করলেন। ভাবলেন–ছেলেটা আবার অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে নাকি? লিটল জিনিয়াস, ভয় পাচ্ছ নাকি? এমনটা জিজ্ঞেস করবেন, এমন সময় লক্ষ করলেন–রাতুলের কাছ থেকে মৃদু চপচপ শব্দ হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন এটা খাবার চিবানোর শব্দ। এর পরেও অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'রাতুল, তুমি কী করছ?'

রাতুল খাবার চিবাতে চিবাতে বলল, 'বাবা, আমি মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছি। মাছটা খেতে খুব ভাল লাগছে।'

'অন্ধকারে তুমি মাছ খাচ্ছ, কী বলছ!!! তোমার গলায় তো মাছের কাঁটা বিঁধে যাবে।'

'না, বাবা, কাঁটা বিঁধবে না, আমি কাঁটা বেছেই খাচ্ছি।'

'এই অন্ধকারে, কাঁটা বেছে খাচ্ছ মানে!!!'

রাতুল গলায় বিস্মিত ভাব নিয়ে বলল, 'বাবা, তুমি বারবার শুধু

BanglaBook.org

অন্ধকার-অন্ধকার বলছ, অন্ধকারটা আসলে কী?'

ছেলের কথা শুনে আরিফ আহমেদ প্রচণ্ড রকমের একটা ধাক্কা খেলেন। কী বলছে এই ছেলে!!! অন্ধকার কী সেটা সে বোঝে না!!!

আরিফ আহমেদ যতটা সম্ভব নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বললেন, 'ইলেকট্রিসিটি চলে যাবার পর সমস্ত ঘর কী হলো?'

রাতুল অবাক হয়ে বলল, 'কী হলো?'

'কেন, সমস্ত ঘর কালো হয়ে গেল না?'

'কই, না তো, বাবা, সামান্য একটু অস্বচ্ছ হলো।'

'তা হলে কি তুমি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, বাবা, আমি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। তুমি ভাত খাচ্ছ না, হাত গুটিয়ে বসে আছ। তোমার পাতে ভাত-মাছ পড়ে আছে, মায়ের পাতেও। তোমার চেহারায় এখন কেমন চিন্তিত ভাব। ইলেকট্রিসিটি চলে যাবার পর-পরই মা চেয়ার ছেড়ে উঠে কেমন এলোমেলো ভাবে তোমাদের শোবার ঘরের দিকে গেল। এই তো এখন আবার মা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে, বসার ঘরের দিকে গেল।'

আরিফ আহমেদ রাতুলের কথা শুনে অবাক হলেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে কোনওক্রমে তিনি বসে রইলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝে তাঁর পাশে নির্বিকার ভঙ্গিতে রাতুল মৃদু চপচপ শব্দ করে ভাত খাচ্ছে। তিনি কিছুটা ঝাঁঝের সাথে গলা উঁচিয়ে তানিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কী হলো, এখন পর্যন্ত চার্জার ল্যাম্পটা পেলে না?'

বসার ঘর থেকে তানিয়ার গলার স্বর শোনা গেল, 'আর বোলো না, মনে হয়েছিল চার্জার ল্যাম্পটা শোবার ঘরে। হাতড়ে হাতড়ে শোবার ঘরে খুঁজে দেখলাম, শোবার ঘরের কোথাও নেই। তখন মনে পড়ল--চার্জার ল্যাম্পটা তো বসার ঘরের শো-কেসের উপরে। এই তো পেয়েছি।'

চার্জার ল্যাম্প জ্বেলে তানিয়া খাবার ঘরে এলেন। অন্ধকার ঘর আলোকিত হলো। আরিফ আহমেদ গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। রাতুলের খাওয়া শেষ। রাতুল চেয়ার ছেড়ে উঠে বেসিনের দিকে গেল হাত ধোয়ার জন্য।

খাবার টেবিলের মাঝখানে ল্যাম্পটা রেখে তানিয়া লজ্জিত গলায়

BanglaBook.org

বললেন, 'কী হলো, রাতুল সোনা, এরই মধ্যে উঠে পড়লে। অন্ধকারে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি বলে রাগ করলে?' আরিফ আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কী হলো, অমন মুখ ভোঁতা করে বসে আছ কেন? আমার কী দোষ, চার্জারটা খুঁজে পেতেই তো দেরি হলো।'

আরিফ আহমেদ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে খেতে বসো, এমনিতেই সব খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

তানিয়া বললেন, 'রাতুল? রাতুল তো না খেয়েই উঠে পড়ল।'

'রাতুলকে নিয়ে ভাবতে হবে না, ও খেয়েছে।'

'অন্ধকারেই খেয়েছে! কী বলছ...' কথা শেষ না করেই রাতুলের এঁটো প্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখেন তানিয়া–সত্যিই প্লেট সম্পূর্ণ শূন্য।

তানিয়া রাতুলের এঁটো প্লেট থেকে চোখ তুলে আরিফ আহমেদের দিকে তাকালেন। চোখে চোখ পড়ল দু'জনার। আরিফ আহমেদের চোখের মাঝে বিস্মিত ভাব। তবে তানিয়াকে তেমন বিস্মিত মনে হলো না। কারণ তানিয়া অনেক দিন আগেই টের পেয়েছেন– রাতুল যে অন্ধকারেও দেখতে পায়। তিনি এতদিন ব্যাপারটা আরিফ আহমেদকে জানাননি।

ঝড় থেমে গেছে কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

ইলেকট্রিসিটি সেই যে গেছে আর আসেনি। বোধহয় কোথাও ইলেকট্রিসিটির লাইন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আজ রাতে যে আর ইলেকট্রিসিটি আসবে না এটা এখন নিশ্চিত।

রাতুল তার বিছানায় শোয়া। ঘুমোবার চেষ্টা করছে কিন্তু ঘুম আসছে না। অন্ধকার কামরা। অবশ্য সবার কাছে অন্ধকার হলেও রাতুলের কাছে নয়। রাতুল স্পষ্টই সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। রাতুলের পড়ার টেবিল, চেয়ার। টেবিলের উপর গোছানো পাঠ্য বই-খাতা। টেবিলের পাশে বুক শেলফ। বুক শেলফে গল্পের বই–ঠাকুরমার ঝুলি, রূপকথার গল্প, রাজা-রাণীর গল্প, আজব জাদুকরের গল্প, কোলা ব্যাঙ ও মাছের গল্প, ঈশপের গল্প, ময়না ও টিয়া কাহিনি, কানী ডাইনীর গল্প... আরও অনেক অনেক গল্পের বই। বুক শেলফের ওপাশে আলনা। আলনায় রাতুলের জামা-কাপড় এবং স্কুল ব্যাগটা ঝোলানো। এরপরে জানালা। বন্ধ জানালা জুড়ে ভারি

BanglaBook.org

পর্দা টানা।

সারা কামরা জুড়ে চোখ বোলাতে বোলাতে রাতুলের চোখ পড়ল গিয়ে তার বিছানার ডান পাশের দেয়ালে। সেখানে একটা টিকটিকি ঘাপটি মেরে বসে আছে। একটুও নড়াচড়া করছে না। দেখে মনে হচ্ছে টিকটিকিটা ঘুমাচ্ছে।

টিকটিকিটা দেখে বিভিন্ন ভাবনা ভর করল রাতুলের মাথায়। টিকটিকিরা অমন নির্বিঘ্নে দেয়াল-সিলিং বেয়ে বেড়ায় কীভাবে? আবার ঘুমুতে ইচ্ছে হলে ঘুমায়ও দেয়াল বা সিলিং-এ স্থির হয়ে। এটা কী করে সম্ভব? পড়ে যায় না কেন? ওদের পায়ে কি আঠা আছে? মানুষরা কেন অমন ভাবে দেয়াল-সিলিং বেয়ে বেড়াতে পারে না?

টিকটিকি বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে দূর করতে রাতুল সিদ্ধান্ত নিল—একটা গল্পের বই পড়বে সে। এমনিতেও ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গল্পের বই পড়লে ঝপ করে চোখে ঘুম নেমে আসে। রাতুলের চোখ পড়ল বুক শেলফের দিকে। কোন্ বইটা পড়া যায়?

অনেক বাছাইয়ের পর রাতুলের মনে ধরল 'চকমকির বাক্স' নামের গল্প বইটা। ভিনদেশি রূপকথার গল্পের বই। লেখক—খসরু চৌধুরী। প্রকাশক—কাজী শাহনূর হোসেন।

'চকমকির বাক্স' নামের গল্পের বইটা রাতুলকে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে শেলফ থেকে আনতে হবে না। বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই তার মনের শক্তির মাধ্যমে শেলফ থেকে শূন্যে ভাসিয়ে তার কাছে নিয়ে আসতে পারবে। আজকাল সে কলম-পেন্সিল, ইরেজার, টেনিস বল, মোমের টুকরো, পাতলা বই-খাতা...অর্থাৎ ছোটখাটো হালকা দ্রব্য কিছুটা দূর থেকেই মানসিক শক্তির মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া বা নড়াচড়া করতে পারে। তার ভিতরে যে এই ক্ষমতা আছে সেটা সে টের পেয়েছে সেদিন কাজের বুয়া আকলিমা আসার পর দূর থেকেই দরজার ছিটকিনি খোলার পর থেকে। সেদিনের পর থেকে সে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে যে—কোনও দ্রব্য বা বস্তুর প্রতি মনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রিভূত করে, কিছুটা দূরে থেকেই বস্তুটিকে নড়াচড়া বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া সম্ভব। তবে সে এখন পর্যন্ত কোনও ভারি বস্তু মনের শক্তির

BanglaBook.org

মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে বা নড়াচড়া করতে পারেনি। এখন সে একটা মোটা বই নিয়ে অনুশীলন করছে মনের শক্তির মাধ্যমে সরানোর। এখনও পর্যন্ত সফলতা পায়নি। তবে সে আশাবাদী–এক সময় সে ভারি বস্তুও মনের শক্তির মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে পারবে।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রাতুল 'চকমকির বাক্স' গল্পের বইটার প্রথম গল্প 'দৈত্যের মাথার সোনার চুল' নামক গল্পটা পড়ছে। খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প। এরপরেও একটু পর পর সে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলছে। তার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে–টিকটিকি কীভাবে দেয়াল-সিলিং বেয়ে বেড়ায়? চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়! টিকটিকি যদি পারে মানুষ পারবে না কেন? মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব।

রাতুল গল্পের বই রেখে দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে দেয়াল বেয়ে উঠতে পারছে না। পারবেই বা কী করে–সে তো আর টিকটিকি নয়। সে চেষ্টা থামিয়ে কামরার ডান পাশের দেয়ালে থাকা টিকটিকিটার দিকে ভালভাবে নজর দিল। সে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করছে–টিকটিকি কীভাবে দেয়াল-সিলিং বেয়ে বেড়ায়। এক পর্যায়ে তার সমস্ত মনকে টিকটিকির মস্তিষ্কের ভিতরে কেন্দ্রিভূত করে, টিকটিকির চিন্তা-ভাবনা বুঝতে লাগল। সেই সাথে বুঝতে লাগল–টিকটিকির দেয়াল-সিলিং বেয়ে বেড়ানোর গোপন কৌশল।

BanglaBook.org

চার

রাতুলদের কাজের বুয়া আকলিমা এসেছে।

আকলিমা রাতুলদের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের সুইচ না টিপে, 'ছোড মিয়া... ও ছোড মিয়া... দরজাডা খুলেন...' বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে। আকলিমা সব সময় রাতুলকে 'ছোড মিয়া' বলেই ডাকে।

এই সময়ে রাতুলদের বাড়িতে রাতুল ছাড়া আর কেউ থাকে না বলে

আকলিমা এসে প্রতিদিন এভাবেই রাতুলকে ডাকে। রাতুল দরজার কাছে চেয়ার টেনে এনে চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়।

ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছে না আকলিমা। চেয়ার টেনে আনার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। আকলিমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত বোধ করছে–পোলাডা তো কহনো দরজা খুলতে এত্ত দেরি করে না। কী হইল! অমন চান্দের টুকরার লাহান পোলারে বাপ-মায় ক্যামনে একলা ঘরে ফালাইয়া যায় হেইডাই একটা চিন্তার বিষয়। বড়লোকে অনেক কিছুই পারে, হ্যাগে দিলে মায়া-মমতা মনে হয় কম থাহে...

আকলিমার ভাবনার ছেদ হলো দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দে। আকলিমা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আশপাশে কেউ নেই। দরজার পাশে চেয়ারও নেই, এমনও হয়নি যে ছোড মিয়াই দরজা খুলে দিয়ে কোথাও পালিয়েছে। আকলিমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল–বাড়িতে ডাহাইত পড়লোনি!!! আইজকাইল তো দিনে-দুফুরেও ডাহাতি হয়...

হঠাৎ আকলিমার চোখ পড়ল বসার ঘরের সিলিং-এ। রাতুল টিকটিকির মত সড়সড় করে সিলিং বেয়ে বেড়াচ্ছে।

আকলিমা 'ও মাগোরে' বলে চিৎকার করে মূর্ছা গেল।

সন্ধ্যায় রাতুলের মা তানিয়া, কাজের বুয়া আকলিমার সামনে রাতুলকে বকাঝকা করছেন।

'রাতুল, এসব কী হচ্ছে? তুমি আকলিমাকে ভয় দেখালে কেন?'

রাতুল কিছু বলল না। সে মাথা নুইয়ে গম্ভীর হয়ে সোফায় বসে রইল।

আকলিমা বলে উঠল, 'আফা, ছাড়েন তো, ছোড মিয়ার কোনও দোষ নাই। মনে হয় চোহে ধান্ধা দেখছি।'

তানিয়া রাগান্বিত গলায় বললেন, 'আকলিমা, তুই কিছুই বুঝছিস না। নিশ্চয়ই ও কিছু করেছে। তা না হলে তুই কি আর এমনি এমন ভয় পেয়েছিস! আমার ছেলেকে আমি ভাল ভাবেই চিনি।'

রাতুল ঝট করে মাথা তুলে একবার শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাথা নুইয়ে ফেলল। তাতেই সে বুঝে ফেলল–মা উপরে

BanglaBook.org

উপরে রাগ দেখালেও মনে মনে কেমন আতঙ্কিত বোধ করছে। বিশেষ করে তার টিকটিকির মত সিলিং বেয়ে বেড়ানোর কথা শুনে।

তানিয়া কঠিন স্বরে বললেন, 'রাতুল, সত্যি করে বলো তো তুমি কী করছিলে? তুমি কি সত্যি সত্যিই সিলিং বেয়ে বেড়াচ্ছিলে নাকি?!'

রাতুল দু-দিকে মাথা নেড়ে জানাল, সে সিলিং বেয়ে বেড়ায়নি।

তানিয়া রাতুলের মাথা নাড়ানো দেখে বেশ স্বস্তি পেলেন। ছেলে যদি বলে উঠত–সত্যি সত্যিই সে সিলিং বেয়ে বেড়াচ্ছিল, তা হলে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপারই না হত। এমনিতেই রাতুলকে তাঁর স্বাভাবিক মনে হয় না। সব সময় মনে হয়, কিছু একটা বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা রয়েছে এই ছেলের মধ্যে।

পাঁচ

জুলাই মাসের চার তারিখ।

রাতুলের জন্মদিন।

সন্ধ্যায় রাতুলদের বাড়িতে ছোট্ট পরিসরে রাতুলের জন্মদিনের আয়োজন করা হয়েছে। অতিথি বলতে রাতুলদের আশপাশের বাড়ির রাতুলের বয়সী দশ-বারোজন ছেলে-মেয়ে আর রাতুলের বাবা-মায়ের অফিসের কলিগরা এবং তাঁদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে।

কেক কাটা শেষে রাতুলের মা তানিয়া ঘোষণা করলেন, ছেলের জন্ম দিনে তিনি একটা গান গাইবেন।

তানিয়াকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। এমনিতেও তিনি যথেষ্ট সুন্দরী। তার উপরে আজ তিনি পার্লার থেকে সেজে এসেছেন। লাল শাড়ি পরেছেন। শাড়ির সাথে ম্যাচ করে লাল টিপ, লাল লিপস্টিক, লাল আইশ্যাডো... এমন কী কানের দুল জোড়াও লাল রঙের পাথর বসানো।

তানিয়া খালি গলায় গান গাইছেন। খুবই মিষ্টি গলার স্বর।

'আজকের আকাশে অনেক তারা,

BanglaBook.org

দিন ছিল সূর্যে ভরা।
আজকের জোছনাটা আরও সুন্দর,
সন্ধ্যাটা আগুন লাগা।
আজকের পৃথিবী তোমার জন্য,
ভরে থাকা ভালোলাগা।
মুখরিত হবে দিন গানে গানে
আগামীর সম্ভাবনায়।
তুমি এই দিনে পৃথিবীতে এসেছো,
শুভেচ্ছা তোমায়।
তাই অনাগত ক্ষণ হোক আরও সুন্দর,
উচ্ছল দিন কামনায়।
আজ জন্মদিন তোমার...'

রাতুল মুগ্ধ হয়ে গান শুনছে। এতক্ষণ রাতুলের তেমন ভাল লাগেনি। তার একা একা থাকতেই ভাল লাগে। লোকজনের মাঝে সে অস্বস্তিবোধ করে। অস্বস্তি ভাবটা কেটেছে মায়ের গাওয়া গান শুনে। মা কী সুন্দর করেই না গানটা গাইছে!

উপস্থিত সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে গান শুনছে। রাতুলের বাবাকেও খুব খুশি খুশি লাগছে। তিনিও বোধহয় গানটা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

রাতুলের বাবার পাশে সোফায় তাঁর এক কলিগ বসা। ভদ্রলোকের গায়ে কালো রঙের কমপ্লিট সুট। ইয়া মোটাসোটা লোকটা। টেকো মাথা। মোটা গোঁফ। ভদ্রলোক তাঁর বিশাল ভুঁড়িটা বাগিয়ে শরীর এলিয়ে সোফায় বসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাতুলের মা তানিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

রাতুলের হঠাৎ চোখ পড়ল মোটা-সোটা টেকো মাথার সেই ভদ্রলোকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাতুল আঁতকে উঠল। লোকটার মনের ভিতর রাতুলের মা তানিয়াকে নিয়ে জঘন্য কুৎসিত আর নোংরা সব ভাবনা খেলা করছে। তড়িৎ গতিতে রাতুলের মেজাজ বিগড়ে যেতে লাগল। প্রচণ্ড আক্রোশে তার মনের ভিতর ঝড় উঠল–লোকটাকে ভয়ানক কোনও শাস্তি দেওয়া উচিত...ভয়ানক কোনও শাস্তি...শাস্তি...

রাতুলের রাগ বাড়ার সাথে সাথে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটতে লাগল।

BanglaBook.org

ঘরের সমস্ত ইলেকট্রিক বালবগুলোর আলো কমে নিভু-নিভু অবস্থা হলো। তানিয়া গান থামিয়ে দিলেন। সবাই হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে বালবের দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ একজন বলে উঠল, 'লোডশেডিং হবার আগে একটু ঠাট্টা-মশকরা করছে।'

হঠাৎ করেই বালবগুলো আবার তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। তীব্রভাবে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে বালবগুলো ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল। ছোট ছেলে-মেয়েরা এবং মহিলারা ভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল। সেই সাথে তীব্র মাথা ব্যথায় ককিয়ে উঠল মোটাসোটা টেকো মাথার সেই লোকটা।

সমস্ত ঘর ডুবে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারের মাঝে চিৎকার-চেঁচামেচি আর মোটাসোটা টেকো মাথার লোকটার গোঙানির শব্দ।

রাতুলের বাবা ছুটে গিয়ে চার্জার ল্যাম্প নিয়ে এলেন। চার্জার ল্যাম্পের আলোতে দেখা গেল সবাই যে যার অবস্থানে অক্ষত, শুধু আজিজ সাহেব অর্থাৎ মোটাসোটা, টেকো মাথার সেই লোকটা দু-হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর নাক দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে তাজা রক্ত।

আজিজ সাহেবকে নিয়ে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। ধরাধরি করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হলো। রাতুলের দিকে কেউ লক্ষ করল না। যদি লক্ষ করত, দেখতে পেত—রাতুল পাথরের স্ট্যাচুর মত শক্ত হয়ে বসে আছে। তার সমস্ত মুখমণ্ডল রাগে লাল হয়ে বিন্দু বিন্দু ঘামে পরিপূর্ণ। সমস্ত শরীরও ঘামে ভিজে নেয়ে গেছে।

BanglaBook.org

ছয়

আজিজ সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না। ডাক্তাররা আজিজ সাহেবের সমস্যাটা ঠিক ধরতে পারছেন না।

প্রাথমিকভাবে ডাক্তারদের ধারণা–আজিজ সাহেব স্ট্রোক করেছেন।

রাতুলের বাবা-মা দু'জনেই প্রচণ্ড মন খারাপ করে বসার ঘরে বসে আছেন। রাতুল তার নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। তার শরীর ভাল লাগছে না। নিজেকে কেমন ভর শূন্য-ভর শূন্য লাগছে।

রাতুলের বাবা আরিফ আহমেদের চোখ পড়ল দেয়াল ঘড়িতে–রাত বারোটা বেজেছে। এখন পর্যন্ত কারও রাতের খাওয়া হয়নি। রাতুলের জন্মদিন উপলক্ষে অনেক খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। অতিথিরাও সবাই না খেয়েই চলে গেছে। এমন একটা কাণ্ডের পর কি আর কারও খাওয়া-দাওয়া করা সম্ভব!

আরিফ আহমেদ তানিয়াকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'মন খারাপ করে বসে থেকে আর কী লাভ! দেখ গিয়ে ছেলেটা বোধহয় না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

তানিয়া অস্ফুট স্বরে বললেন, 'সব কিছুর জন্য দায়ী ইলেকট্রিসিটি। ইলেকট্রিসিটি যদি অমন অদ্ভুত আচরণ না করত তা হলে আজিজ সাহেব স্ট্রোক করতেন না। আজিজ সাহেব বালব বার্স্ট হতে দেখে আতঙ্কে স্ট্রোক করেছেন।'

'যা হবার তা তো হয়েছেই। এখন আল্লা আল্লা করো লোকটা যাতে বাঁচে। লোকটা মারা গেলে আমাদের অনেক বদনাম হবে–সবাই বলাবলি করবে, লোকটা আমাদের বাসায় দাওয়াতে এসে মারা গেছে।'

তানিয়া ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই রাতুলের কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। ইশ, অতটুকু বাচ্চা ছেলেটাও এত রাত পর্যন্ত না খেয়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছে! তানিয়া সোফা ছেড়ে উঠে ব্যস্ত ভঙ্গিতে রাতুলের রুমের দিকে গেলেন।

রাতুলের রুমের দরজা ভেজানো। তানিয়া দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চমকে কেঁপে উঠলেন। রাতুল তার বিছানার এক থেকে দেড় ফুট উপরে শোয়া অবস্থায় শূন্যে ভাসছে।

তানিয়ার বসে যাওয়া গলা থেকে কোনওক্রমে বেরুল, 'রাতুল!!!' অমনি রাতুল শূন্যে ভেসে থাকা অবস্থান থেকে বিছানায় নেমে গেল। পাশ ফিরে সে মায়ের দিকে তাকাল। রাতুলের মুখটা কেমন শুকনো, রক্তশূন্য,

BanglaBook.org

ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। চোখ দুটো ঈষৎ লাল।

তানিয়া ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি বিভ্রম দেখেছেন। রাতুল বিছানার উপরেই শোয়া ছিল। তিনি যা দেখেছেন–দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তির ফল। তবে ছেলেটাকে অমন রুগ্ন আর মনমরা দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?

তানিয়া রাতুলের শিয়রের পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন এই ভেবে রাতুলের কপালে হাত ছোঁয়াতেই তিনি আঁতকে উঠলেন। ছেলের গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! তিনি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে আরিফ আহমেদকে ডাকলেন, 'এই, দেখে যাও রাতুলের খুব জ্বর।'

বসার ঘর থেকে আরিফ আহমেদ ছুটে এলেন। রাতুলের কপালে হাত রেখে দেখলেন সত্যিই খুব জ্বর। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দিশেহারা হয়ে উঠলেন।

রাতুল মা-বাবার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সহজ-স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তোমরা এতটা উতলা হয়ো না তো। আমার কিচ্ছু হয়নি। কাল সকালেই দেখবে জ্বর ঠিক হয়ে যাবে।'

আরিফ আহমেদ গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার সাহেব রাতুলকে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিলেন। আর মুখে বললেন–গরম কিছু খাইয়ে ওষুধগুলো খাইয়ে দিতে আর ভেজা তোয়ালে দিয়ে একটু পর পর সমস্ত গা মুছে দিতে। সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া সব ঘটনা ডাক্তার সাহেবকে খুলে বলা হলো। তা শুনে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ওই ঘটনায় রাতুল প্রচণ্ড শকড হয়েছে আর তা থেকেই এই জ্বর উঠেছে। চিন্তার কিছু নেই, জ্বর যেমন হঠাৎ করে উঠেছে তেমনি আবার হঠাৎ করেই নেমে যাবে।'

ডাক্তার সাহেব রাতুলের বাবা-মাকে চিন্তিত হতে বারণ করেছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি নিজেই বেশ চিন্তিত হয়েছেন। থার্মোমিটারে রাতুলের গায়ের তাপমাত্রা এসেছে ১০৮০-এর উপরে। এতটা তাপমাত্রায় কোনও মানুষের স্বাভাবিক থাকার কথা নয়–সেন্সলেস হবার কথা। তবে এটা ঠিক, বড়দের চেয়ে বাচ্চারা অনেক বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। তাই বলে ১০৮০-এর উপরে! নিশ্চয়ই থার্মোমিটারে কোনও সমস্যা হয়েছে।

BanglaBook.org

তানিয়া এক গ্লাস গরম দুধ কোনওরকমে রাতুলকে খাইয়ে ডাক্তার সাহেবের দেওয়া ওষুধগুলো খাইয়ে দিলেন। ভেজা তোয়ালে দিয়ে দুইবার রাতুলের গা মোছানোও হলো।

রাতুল বেশ স্বাভাবিক। সে সুস্থ স্বাভাবিকের মতই কথাবার্তা বলছে। রাত দুটোর সময় সে বাবা-মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমরা এখন ঘুমোতে যাও। আমারও খুব ঘুম পেয়েছে, আমি এখন ঘুমাব।'

তানিয়ার ইচ্ছে ছিল আজ রাতে তিনি ছেলের কাছে শোবেন। কিন্তু রাতুল ঘোর আপত্তি করল। রাতুল দৃঢ়তার সাথে বলল তার পাশে কেউ ঘুমালে তার ঘুম আসে না। কেউ যেন তার কাছে না শোয়।

অগত্যা আরিফ আহমেদ আর তানিয়া তাঁদের শোবার ঘরে চলে গেলেন। যাবার আগে রাতুলের রুমের আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

খুব ভোরে তানিয়ার ঘুম ভাঙতেই, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে রাতুলের রুমে গেলেন। রাতুলের রুমে ঢুকে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন–তাতে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

রাতুলের বিছানায় রাতুল নেই। রাতুলের বদলে বিছানার উপর পড়ে আছে রাতুলের অবয়বের মত ছাইয়ের স্তূপ!!!

পরিশিষ্ট

রাতুল আরিফ আহমেদ এবং তানিয়ার সন্তান ছিল না। কী এক সমস্যার জন্য তানিয়া কোনও দিনও মা হতে পারবেন না। রাতুলকে তাঁরা চাঁনমারী এতিমখানা থেকে এনেছিলেন। তখন রাতুলের বয়স ছিল দুই মাস।

রাতুলের ওভাবে অন্তর্ধানের পর আরিফ আহমেদ এবং তানিয়া সেই এতিমখানায় গিয়েছিলেন রাতুলের প্রকৃত বাবা-মায়ের পরিচয় জানতে। এতিমখানার সুপারেইন্টেনডেন্ট ফাইলপত্র-রেজিস্ট্রার বই ঘেঁটে জানায়–রাতুলকে এতিমখানায় দিয়েছিল এক বৃদ্ধা মহিলা। বৃদ্ধা মহিলার নাম–মাজেদা বেগম। বাড়ি–পশ্চিম নয়াকান্দা গ্রামে।

BanglaBook.org

আরিফ আহমেদ এবং তানিয়া পশ্চিম নয়াকান্দা গ্রামে যান সেই বৃদ্ধা মহিলার খোঁজ করতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা সেই বৃদ্ধার খোঁজ পান। বৃদ্ধা একজন ভিক্ষুক। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষা করে বৃদ্ধা জীবন চালায়। বৃদ্ধা সেই গ্রামে হাসুর মা নামে পরিচিত। হাসু নামে নাকি বৃদ্ধার এক ছেলে ছিল। বৃদ্ধার ছেলে প্রায় বিশ বছর ধরে নিরুদ্দেশ।

গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হারান মল্লিকের আম কাঁঠালের বাগানের পাশে বৃদ্ধার কুঁড়েঘর। হারান মল্লিকের আম-কাঁঠালের বাগান নামে পরিচিত বাগানকে বাগান না বলে পরিত্যক্ত জঙ্গল বলাই শ্রেয়। হারান মল্লিকের সেই বাগান নিয়ে গ্রামের লোকজনের মধ্যে অনেক লোকগাথা রয়েছে। ইংরেজ আমল থেকে এখন পর্যন্ত, কেউ বলছে তিনবার, কেউ বলছে চারবার সেই বাগানের মধ্যে গোল চাকতির মত (ফ্লাইং সসারের মত) এক রকম উড়ন্ত যান এসে নামতে দেখা গিয়েছে। তখন সমস্ত বাগান উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায়। উজ্জ্বল আলোর মাঝে দেখা যায় সেই চাকতির মত যান থেকে দানব আকৃতির লম্বা, স্ফটিকের মত গায়ের রং, লম্বা মাথা, সুচালো চিবুক, ভ্রুহীন বড় বড় নীল চোখের অধিকারী কিছুটা মানুষের আকৃতির সাথে মিল এক ধরনের আজব প্রাণী নেমে আসে। তারা নিজেদের মধ্যে অবোধ্য বিচিত্র ভাষায় নাকি কথাও বলে। কিছু সময় অবস্থান নেয়ার পরই তারা আবার ফিরে যায়। গোল চাকতির মত যানটা চোখের পলকে আকাশের বহুদূরে মিলিয়ে যায়। নিমিষে বাগানটা আবার তলিয়ে যায় গভীর অন্ধকারে।

গ্রামের লোকজন ব্যাপারটাকে ভৌতিক কাণ্ড বলেই বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা এসব ঘটে জিন-ভূতের কারণে। ওই বাগানে জিন-ভূতের আস্তানা হয়েছে।

বৃদ্ধার কুঁড়েঘরের আশপাশে প্রায় আধ মাইলের মধ্যে কোনও বাড়ি-ঘর নেই। বৃদ্ধা একাই সেই কুঁড়েঘরে থাকেন। বৃদ্ধার আপন বলতে কেউ নেই। থাকার মধ্যে এক ছেলে ছিল সে-ও তো বহু বছর ধরে নিরুদ্দেশ। (বৃদ্ধার ছেলে নিরুদ্দেশ হবার আগের রাতেও নাকি বাগানে উজ্জ্বল আলো আর বিচিত্র প্রাণীগুলোকে দেখা গিয়েছিল)

রাতুল সম্পর্কে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়—এই গ্রামে মালেকা

BanglaBook.org

বানু নামে যুবতী এক পাগলি ছিল। পাগলিটা প্রায়ই রাতে এসে বৃদ্ধার কুঁড়েঘরের খোলা বারান্দায় ঘুমাত। বৃদ্ধা কিছুই বলতেন না বা তাড়িয়ে দিতেন না। পাগলি এসে থাকায় বৃদ্ধা এক ধরনের ভরসা পেতেন। পাগলি হোক আর যা-ই হোক, মানুষ তো। এমন নির্জন জায়গায় একা একা থাকার চেয়ে আর একটা মানুষ আশপাশে থাকলে ভাল লাগে। এভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন দেখা যায় পাগলিটা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। গ্রামের মানুষের মধ্যে ছিঃ ছিঃ রব উঠে যায়। অবোধ পাগলিটার এমন সর্বনাশ কে করল?! কৌতূহল মেটাতে পাগলিকে সবাই জিজ্ঞেস করত–কে তোর এই সর্বনাশ করল? পেটের এই সন্তানের বাপ কে? পাগলি প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারত না। হাসত, কাঁদত, পাগলামি করত। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু কথা বলত। যে কথার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝত না কেউ। পাগলি বলত, 'অনেক রাইতে আমার ধারে একটা কুকপক্ষী আইত, হেই কুকপক্ষীর বাচ্চা আমার প্যাটে।' কোথা থেকে আসত জিজ্ঞেস করলে, আঙুল তুলে বাগানের দিকে দেখাত।

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগে পাগলিটাকে গ্রামের লোকজন সামান্য কিছু যাও বা খেতে দিত, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর তাও আর দিত না। সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। মাঝে মাঝে বৃদ্ধা পান্তা ভাত-টাত থাকলে খেতে দিত। তাতে ক্ষুধা না কমে আরও বেড়ে যেত। ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াত পাগলিটা। ওদিকে পেটের মধ্যে বড় হতে থাকে পিতৃপরিচয়হীন অনাগত সন্তান।

এভাবেই একদিন শেষ রাতে বৃদ্ধার কুঁড়েঘরের বারান্দায় পাগলি জন্ম দেয় ফুটফুটে এক শিশুর। দাই-এর দায়িত্বও পালন করেন বৃদ্ধা। শিশুটার জন্মের কিছুক্ষণ পরই পাগলি মারা যায়।

মা হারানো নবজাতককে নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েন বৃদ্ধা। তিনি নিজেই চলেন কোনওরকমে, এতটুকু শিশুকে তিনি কী করে লালন-পালন করবেন! অবশেষে পশ্চিম নয়াকান্দা জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের সহায়তায় শিশুটিকে তিনি দিয়ে আসেন চাঁদমারী এতিমখানায়।

BanglaBook.org

হিলা

এক

আষাঢ় মাস। ঝুপ-ঝুপ করে সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। পাঁচদিন ধরে সূর্যের দেখা নেই। সবাই বলাবলি করছে–এ বছর ভয়াবহ বন্যা হবে, গরিব মারার বন্যা। কাশিপুর হাইস্কুলের হেড স্যর জমির উদ্দিন ছাতা মাথায় স্কুলের দিকে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য গায়ে বর্ষাতিও চাপিয়েছেন। এর পরেও তাঁর পায়ের প্রায় হাঁটু অবধি ভিজে গিয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন আজ রিকশায় চড়ে যাবেন, কিন্তু পথে একটাও খালি রিকশার দেখা মেলেনি। সি.এণ্ড.বি-র বড় রাস্তা ধরে তিনি হাঁটছেন। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই, যানবাহনও খুব একটা যাতায়াত করছে না। একটানা বৃষ্টির মাঝে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ তুলে তিনি একাকী হেঁটে চলছেন।

জমির উদ্দিন স্যর অত্যন্ত ভদ্র, নির্বিরোধী, স্বল্পভাষী, শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি কারও সাতে-পাঁচে নেই। তাঁর রোজকার কাজ স্কুলে যাওয়া, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ন্যায় এবং নিষ্ঠার সহিত স্কুলের দায়িত্ব পালন করা, ফেরার পথে বাজার করে বাড়িতে ফেরা। বাকি সময়টা বাড়িতে বসে খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রিকা আর বই পড়ে কাটানো।

জমির উদ্দিন স্যরের তিন মেয়ে এক ছেলে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছোট মেয়েটি আগামীবার এইচ.এস.সি দেবে। বড় মেয়ে দুটির খুব ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ের জন্যেও বেশ কয়েকটি সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু জমির উদ্দিন স্যর এত জলদি ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে চান না। ছোট মেয়েটি লেখা-পড়ায় বেশ ভাল। ছেলেটাকে নিয়েই তাঁর যত দুশ্চিন্তা। ছেলেটা স্বাভাবিক নয়, সব কিছুতেই সে ভয় পায়। দিনের বেলা যেমন-তেমন, সন্ধ্যার পর থেকে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে থাকে। সারাক্ষণ

BanglaBook.org

ছেলের মাকে ছেলেকে আগলে রাখতে হয়। ছেলেটা ছোট মেয়েটার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। স্বাভাবিক মানুষ হলে এতদিনে হয়তো অনার্স কমপ্লিট হত। ভয় রোগের কারণে ছেলেটার পড়াশুনাই হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই তার এই ভয় রোগ। ঢাকা নিয়ে গিয়ে মানসিক রোগের বড়-বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ডাক্তাররা বলেছেন–এই রোগের নাম অটিজম। এই রোগে আক্রান্তদের বলা হয় অটিস্টিক। অটিস্টিক ছেলে-মেয়েরা নিজস্ব একটা গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে। বাইরের জগতের সাথে তারা সহজে মিশতে পারে না। অন্য স্বাভাবিক ছেলে-মেয়েদের মত তাদের মানসিক বিকাশ হয় না। নিয়মিত সাইকোথেরাপি দিলে কিছুটা উন্নতি সম্ভব।

জমির উদ্দিন স্যারের তাঁর ছেলে সম্পর্কে ডাক্তারদের ধারণা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে মনে হয়–সমস্যাটা অন্য কোথাও। পর-পর দুটো মেয়ে হওয়ার পর একটা ছেলের জন্য এক পীরের মাজারে মানত করেছিলেন তিনি। মানত করেছিলেন–ছেলে হলে পীরের মাজারে একটা ছাগল দেবেন। ছেলে হয় কিন্তু ততদিনে এক বিশিষ্ট আলেম মওলানার কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন–পীর, আউলিয়া, পাগলা বাবা, এ ধরনের কারও মাজারে কিছু মানত করা মহা গোনার কাজ। এতে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। পৃথিবীতে যা কিছু হয় তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তাও আল্লাহর ইচ্ছেতে। মানত করলে আল্লাহর নামেই করতে হয়। মানত করতে হয় এমন ভাবে–হে আল্লাহ, আমার অমুক ইচ্ছেটা পূরণ হলে আমি এত রাকাত নফল নামাজ পড়ব, আমার অমুক ইচ্ছেটা পূরণ হলে আমি এতটা রোজা রাখব, অমুক ইচ্ছেটা পূরণ হলে আমি এত টাকা গরিব, মিসকিন, এতিমদের দান করব বা এতজন গরিব-মিসকিনদের পেট পুরে খাওয়াব...

জমির উদ্দিন স্যার মানত সম্পর্কে এমনটা জানায় তাঁর ছেলে হওয়ার পর, তিনি আর পীরের মাজারে ছাগল দেননি। তবে আজকাল মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হয়–পীরের মাজারে মানত করে সেই মানত পূরণ না করার জন্যেই হয়তো ছেলের এই অবস্থা। পরক্ষণেই আবার মনে হয়–এমনটা ভাবাও হয়তো পাপ।

BanglaBook.org

বৃষ্টি আরও বেড়েছে। জমির উদ্দিন স্যর ভাবছেন–এমন বৃষ্টির মাঝে স্কুলে না গেলেও হত। বাড়ি থেকে বের হওয়াটাই ভুল হয়েছে। এত বৃষ্টির মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ আসবে না। দেখা যাবে শিক্ষকরাও কেউ আসেনি।

জমির উদ্দিন স্যর স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। এতদূর এসে এখন আর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং কিছুটা সময় স্কুলে কাটিয়ে যাওয়া যাক।

স্কুলের গেটের পাশের বড় রেন্ট্রি গাছটার সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। একটা মেয়ে জবুথবু হয়ে গাছের গোড়ায় বসে আছে। মেয়েটার গায়ে ছেঁড়া ময়লা একটা কামিজ। চুল আলুথালু। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডায় মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে। ঠাণ্ডায় মেয়েটার ঠোঁটেও সামান্য নীলচে ভাব। মেয়েটা কেমন উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জমির উদ্দিন স্যর কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে যান। মনে-মনে ভাবেন, মেয়েটা বোধহয় পাগলি।

যা ভেবেছেন তাই–স্কুলে কেউ আসেনি। ছাত্র-ছাত্রী তো নয়ই, কোনও শিক্ষকও না। শুধু মাত্র স্কুলের পিয়ন নুরু এসেছে।

নুরু জমির উদ্দিন স্যরকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'স্যর, আপনে আইছেন! এই বৃষ্টির মধ্যে তো কুত্তা-বিলাইও ঘর থেকে বের হয় না। ভাবছি আইজ কেউ আসবে না, আমার আসাটাই বৃথা। ভাল কইরা তালা মাইরা চইলা যামু।'

জমির উদ্দিন স্যর নুরুকে কিছুই বললেন না। নুরুর বেশি কথা বলার অভ্যেস। আশপাশে কেউ থাকলে সারাক্ষণ বকবক করেই যাবে। তিনি নিঃশব্দে ছাতা আর বর্ষাতি নুরুর হাতে দিয়ে তাঁর রুমে গিয়ে বসলেন। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। এতক্ষণ বর্ষাতি গায়ে থাকায় ঠাণ্ডাটা ঠিক অনুভব করতে পারেননি। হঠাৎ তাঁর রেন্ট্রি গাছের গোড়ায় বসা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল। এমন ঠাণ্ডার মাঝে মেয়েটা ওভাবে বৃষ্টিতে ভিজছে! মেয়েটা তাঁর ছোট মেয়ের বয়সী। পাগলি হোক আর যা-ই হোক একটা বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটাকে সাথে করে স্কুলের ভিতরে নিয়ে আসতে পারতেন। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে যায়। তিনি গলা উঁচিয়ে নুরুকে ডাকেন। বেশ কয়েকবার

BanglaBook.org

ডাকার পর নুরু এসে উপস্থিত হয়। নুরুর গা থেকে বিড়ির উটকো গন্ধ আসছে।

নুরু ভিতরে ঢুকেই বলল, 'স্যর, চা খাইতে চাইলে পারুম না। এই বৃষ্টির মধ্যে দোকান থেইক্যা চা আনা সম্ভাব না।'

জমির উদ্দিন স্যর গম্ভীর গলায় বললেন, 'চা আনতে হবে না। ছাতা নিয়ে স্কুলের সামনের রেন্ট্রি গাছটার গোড়ায় গিয়ে দেখ একটা মেয়ে বসে আছে, মেয়েটাকে নিয়ে আয়।'

'কোন ম্যাইয়া! এই বৃষ্টির মধ্যে ম্যাইয়ামানুষ! কী কন, স্যর! শেষে একটা কেলেঙ্কারি...'

জমির উদ্দিন স্যর চোখ গরম করে নুরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশি কথা বলিস না। তোকে যা বলছি কর।'

জমির উদ্দিন স্যর স্কুলের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন, নুরু পাগলি মেয়েটার চুল ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে।

মেয়েটাকে সহ নুরু বারান্দায় আসার পর জমির উদ্দিন স্যর ধমক দিয়ে বললেন, 'ওভাবে চুল ধরে মেয়েটাকে টেনে আনলি কেন?'

'স্যর, বদমাইশ ম্যাইয়া, আসতে চায় না। মেয়েছেলের আবার চুল ছাড়া অন্য কোথাও হাত দিলে পাপ হইব। আমি তো বদ পুরুষ না, আমার চরিত খুব...'

'ঠিক আছে বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' স্যর গলার স্বর কোমল করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই মেয়ে, তোর নাম কী?'

মেয়েটা তার হাত দুটো ভাঁজ করে বুকের উপর রেখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছে। জমির উদ্দিন স্যরের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না।

স্যর আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোর বাড়ি কোথায়?'

কোনও উত্তর নেই। নুরু বলে উঠল, 'স্যর, ঠাশ কইরা একটা চড় বসান। বেয়াদপ কোথাকার...আপনে না পারলে কন, আমি দিয়া দেই।'

জমির উদ্দিন স্যর রাগী চোখে নুরুর দিকে তাকালেন। নুরু স্যরের চাহনি দেখে আমতা-আমতা করে বলল, 'স্যর, জিগাজিগি কইরা লাভ নাই। মনে হয় পাগল। রাস্তার পাগল রাস্তায়ই রেখে আসি।'

BanglaBook.org

স্যর নুরুকে উপেক্ষা করে নরম গলায় আবার মেয়েটাকে প্রশ্ন করলেন, 'এই মেয়ে, তোর কি ক্ষুধা পেয়েছে?'

মেয়েটা এবারে চোখ তুলে সরাসরি জমির উদ্দিন স্যরের দিকে তাকাল। মুখে কিছুই বলতে হলো না, মেয়েটার আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়েই স্যর বুঝে ফেললেন, মেয়েটার পেটে ভীষণ ক্ষুধা। প্রচণ্ড মায়া হলো তাঁর। এতটুকু বাচ্চা একটা মেয়ে...

জমির উদ্দিন স্যর নুরুকে রিকশা আনতে পাঠিয়েছেন। রিকশায় চড়ে মেয়েটাকে নিয়ে তিনি বাসায় চলে যাবেন।

দুই

জমির উদ্দিন স্যরের স্ত্রী সুরমা বেগম আছেন মহা বিপদে। বৃষ্টিতে সুমনের ভীতি রোগ আরও বেড়েছে। আর মেঘ ডাকলে তো কথাই নেই! মেঘের গুম-গুম শব্দে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে হয়। এদিকে ছোট মেয়েটা আবদার করেছে, আজ খিচুড়ি রাঁধতে হবে। খিচুড়ি আর ডিম ভুনা, ঘরে কাগজি লেবুও আছে। কিন্তু ছেলের জন্য তিনি রান্নাঘরে যেতে পারছেন না। মেয়েটা একা একাই রান্নাঘরে বসে কী যেন করছে। বোধহয় ডিম সিদ্ধ করে ডিমের খোসা ছাড়াচ্ছে।

সুরমা বেগম তাঁর ছেলে সুমনের হাত ধরে বসে আছেন। সুমন বৃষ্টির শব্দে ভয়ে কুঁকড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। সুরমা বেগম ছেলের কপালে হাত বুলাচ্ছেন। তিনি চেষ্টা করছেন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

ছেলেটা সুরমা বেগমের মতই ফর্সা গায়ের রং পেয়েছে। নাকটাও তাঁর মত তীক্ষ্ণ, চোখ দুটো ভাসা-ভাসা। অনেক দিন চুল কাটানো হয়নি বলে চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যুবক বয়সে দেখতে যেমন লাগত, ছেলেটাকে দেখতে এখন কিছুটা তেমন লাগে। কী সুপুরুষ চেহারা! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সুরমা বেগমের। এত বড় ছেলে, এত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, কিন্তু স্বভাবটা! স্বভাবটা একেবারে বাচ্চা শিশুদের

BanglaBook.org

মত! তাও সাধারণ শিশু হলেও হত! ভয় পাওয়া ভীতু শিশু!

ক্রিং-ক্রিং করে কলিংবেল বেজে উঠল। নিতু গিয়ে দরজা খুলল। দরজায় বাবা দাঁড়িয়ে আছে। সাথে একটা পাগলি টাইপের মেয়ে। মেয়েটা তাঁর বড়-বড় ময়লা নখ দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। নিতু অবাক চোখে বাবার দিকে তাকাল।

নিতুর বাবা জমির উদ্দিন স্যর লজ্জিত গলায় বললেন, 'মেয়েটা স্কুলের সামনের রেন্ট্রি গাছটার নীচে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিল, তাই সাথে করে নিয়ে এলাম। তোর মা কোথায়?'

'মা ভাইয়াকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে।'

সুরমা বেগম তাঁর স্বামীর কর্মকাণ্ডে মোটেই অবাক হলেন না। এটা নতুন কিছু নয়। এরকম কাণ্ড সে এর আগেও বহুবার করেছে। রাস্তা থেকে পাগল, ভিক্ষুক টাইপের লোকজন ধরে এনে বাড়িতে উঠিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই পাগল বা ভিক্ষুক বাড়ির কিছু একটা চুরি করে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। তবে সুরমা বেগম অবাক হয়েছেন এবারের পাগলি মেয়েটাকে দেখে। মেয়েটাকে নিতু গরম পানি দিয়ে সাবান মাখিয়ে ভালভাবে গোসল করিয়ে, নিতুর এক সেট পুরানো লাল সালোয়ার-কামিজ পরিয়েছে। এখন আর মেয়েটাকে পাগলি মনে হচ্ছে না। অপরূপ রূপবতী লাগছে তাকে। লাল পোশাকে মনে হচ্ছে একটা লাল পরী। মেয়েটার গা থেকে রূপ-লাবণ্য যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। এতই সুন্দর যে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মাথা ঝিম-ঝিম করে। রাস্তার একটা পাগলি এত সুন্দর হতে পারে না! নিশ্চয়ই বড় ঘরের মেয়ে, কোনও কারণে হয়তো হারিয়ে গিয়েছে। এর চেয়েও অবাক ব্যাপার–দুপুরে সুমনকে যখন সুরমা বেগম খাওয়াচ্ছিলেন তখন সুমন খেতে চাচ্ছিল না, ভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল। চিৎকার শুনে পাগলি মেয়েটাও সুমনের ঘরে এসেছিল। সুরমা বেগম মনে-মনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। বাইরের অপরিচিত মানুষ দেখলে সুমন ভয়ে আরও চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে। কিন্তু ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সুমন মেয়েটার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর শান্ত ছেলের মত সব খাবার খেয়েছিল। অন্য সব দিনের চেয়ে এরপর সুমন

BanglaBook.org

অনেক শান্ত থাকে।

সুরমা বেগম ভেবে কূল পাচ্ছেন না–কে এই মেয়েটা! কোথা থেকে এসেছে! কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে মেয়েটার মাঝে। কিন্তু তাঁতে তাকে পুরোপুরি পাগল বলা যায় না। খাবার টেবিলে মেয়েটা হাত দিয়ে খাবার তুলে না খেয়ে পশুর মত মুখ দিয়ে ঘেঁটে-ঘেঁটে খেতে শুরু করে। পরে নিতু তাকে শিখিয়ে দেয় কীভাবে হাত দিয়ে খেতে হয়। এই একটি অস্বাভাবিকতা ছাড়া তেমন কিছুই আর চোখে পড়েনি। এমনিতে মেয়েটা শান্ত, ভদ্র, লাজুক টাইপের। শুধু কোনও কথা বলে না। অনেকবার প্রশ্ন করা হয়েছে–কে সে? কোথায় বাড়ি? আত্মীয়-স্বজন? কোনও প্রশ্নেরই সে উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে বসে থাকে। তা হলে মেয়েটা কি বাক শক্তিহীন, বোবা!

তিন

মাঝ রাত। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দানবের মত হিস-হিস শব্দের প্রলয়ংকরী ঝড়, পাথরের ছোট-ছোট টুকরো ঝরে পড়ার মত ভারী বৃষ্টি আর ভয়ঙ্কর বিকট শব্দের বজ্রপাত। সুমন ভয়ে কুঁকড়ে মা-মা করে কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। সুরমা বেগম ছেলেকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দিচ্ছেন। মা পাশে থাকায়ও সুমন মোটেই শান্ত হচ্ছে না। ভয়ে গুটিসুটি মেরে কাঁপছে আর কাঁদছে। সুমনের অবস্থা দেখে সুরমা বেগমের বার-বার মনে হচ্ছে–এই বুঝি ছেলেটা দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

ছেলেকে সামাল দিতে সুরমা বেগমের যখন হিমশিম অবস্থা তখন পাগলি মেয়েটা এসে ঘরে ঢুকল। মোমের আধো আলো আধো অন্ধকারেও মেয়েটার গা থেকে যেন আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। মেয়েটা এসে সুমনের খাটে বসল। সুরমা বেগমকে ইশারায় সুমনকে ছেড়ে একটু সরে বসতে বলল। সুরমা বেগম সরে বসলেন। মেয়েটা সুমনের আরও কাছে গিয়ে

BanglaBook.org

নিষ্পলক চোখে সুমনের চোখের দিকে তাকাল। সুমনও মন্ত্রমুগ্ধের মত শান্ত হয়ে এক দৃষ্টিতে মেয়েটার চোখের দিকে চেয়ে রইল। বেশ কিছু সময় ধরে দুজনে দুজনার চোখে-চোখে চেয়ে রইল। এক সময় মেয়েটা যান্ত্রিক কণ্ঠে ভাঙা-ভাঙা ভাবে বলে উঠল, 'তু...মি...ভ...য়...পে...য়ো...না,...আ...মি... তো...মা...র... পা...শে...আ...ছি...' এই একটি বাক্যই ভাঙা-ভাঙা ভাবে মেয়েটা বলতেই থাকল। কিছু সময় পর সুমন ধীরে-ধীরে চোখের পাতা বন্ধ করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সুরমা বেগম এক রাশ বিস্ময় নিয়ে একবার ছেলের দিকে তাকান আর একবার পাগলি মেয়েটার দিকে। মেয়েটা এর আগে কখনও কথা বলেনি, এই প্রথম! মেয়েটা যেভাবে ভাঙা-ভাঙা ভাবে বলল তাতে মনে হচ্ছে সে বাংলা ভাষা ঠিক ভাবে জানে না! কী অদ্ভুত ভাবে সুমনকে সম্মোহনের মত করে ঘুম পাড়িয়ে দিল! সুরমা বেগম চিন্তিত হয়ে ভাবেন–নিশ্চয়ই মেয়েটার মধ্যে কোনও রহস্যময়তা আছে! ভাঙা-ভাঙা ভাবে হোক আর যেভাবেই হোক কথা যখন বলেছে, কাল সুমনের বাবাকে নিয়ে মেয়েটাকে প্রশ্ন করে জানতে হবে, সে আসলে কে!

জমির উদ্দিন স্যর এবং সুরমা বেগম পাগলি মেয়েটাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন। মেয়েটা মাথা নত করে বসে আছে। কোনও প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে, সুরমা বেগম চটে গিয়ে বললেন, 'কাল রাতে তুমি কথা বলেছ, তুমি কথা বলতে জানো। তা হলে এখন কথা বলছ না কেন?'

মেয়েটা মুখ তুলে জমির উদ্দিন স্যর এবং সুরমা বেগমের দিকে তাকিয়ে ভাঙা-ভাঙা ভাবে বলতে শুরু করে। সে যা বলল শুদ্ধ উচ্চারণে তা হলো, 'আমার নাম হ্রিলা। আমি এসেছি এই পৃথিবী থেকে বহু দূরের এক গ্রহ থেকে। আমাদের সেই গ্রহটাও এই পৃথিবী গ্রহের মতই। আমাদের সেই গ্রহ থেকে এই পৃথিবীর দূরত্ব অকল্পনীয়। সেই দূরত্বকে পিছনে ফেলে পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে আমাদের সেই গ্রহে যাওয়া কোনও দিনই হয়তো সম্ভব হবে না। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পৃথিবীবাসীদের চেয়ে অনেক-অনেক গুণ এগোনো। আমাদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাশূন্যে বিশেষ এক ওয়ার্মহোল সৃষ্টি করে, দূরত্বকে পরাজিত করে আমি

BanglaBook.org

আপনাদের এই পৃথিবীতে এসেছি। আমি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। আমাদের গ্রহের বিজ্ঞান সংস্থা আমাকে বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে।'

এই পর্যায়ে জমির উদ্দিন স্যর এবং সুরমা বেগম একই সাথে বলে উঠলেন, 'সেই বিশেষ দায়িত্বটা কী?'

'আমি আপনাদের ছেলেকে সুস্থ করে তুলব। নিয়মিত সাইকোথেরাপির মাধ্যমে তাঁর মস্তিষ্কের নিউরোনের পরিবর্তন করব। ধীরে-ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার দায়িত্ব শেষ হবে। আমি চলে যাব।'

কথা শেষ করে মেয়েটা সুমনের রুমের দিকে চলে গেল। সুরমা বেগম আর জমির উদ্দিন স্যর একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন।

নীরবতা ভেঙে সুরমা বেগম বিস্মিত গলায় বললেন, 'মেয়েটার কথা শুনে তুমি কী বুঝলে? অন্য গ্রহ থেকে এসেছে! সুমনকে সুস্থ করবে! এর মানে কী!'

জমির উদ্দিন স্যর মাথা নেড়ে বললেন, 'আমিও কিছুই বুঝতে পারিনি। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার তেমন জ্ঞান নেই। তবে যতটুকু জানি তা হলো–বিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করেও এখন পর্যন্ত আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে পৃথিবীর মত মানুষ বাসের উপযুক্ত আর কোনও গ্রহের সন্ধান পাননি। সে ক্ষেত্রে মেয়েটা দূরের গ্রহ বলতে কত দূর বুঝিয়েছে কে জানে! আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির পাশের গ্যালাক্সি এন্‌ড্রোমিডার কোনও গ্রহ বা তার চেয়েও দূরের কোনও গ্যালাক্সির অচেনা এক গ্রহ থেকেও সে আসতে পারে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিজ্ঞানীরা প্যারালাল ইউনিভার্সের কথা বলেন। অর্থাৎ এই জগৎ-এর মত আরও জগৎ থাকতে পারে! সে ক্ষেত্রে মেয়েটা সেরকম কোনও জগৎ থেকেও আসতে পারে! প্যারালাল ইউনিভার্স মানে একই রকমের ভিন্ন ভিন্ন জগৎ। হ্রিলা নামের মেয়েটার মত একটা মেয়ে হয়তো আমাদের জগতেও আছে। সাধারণ কোনও মেয়ে, সে হ্রিলা মেয়েটার মত সাইকিয়াট্রিস্ট নয়। আবার হ্রিলা মেয়েটার জগতেও হয়তো একজন জমির উদ্দিন আছে, একজন সুরমা বেগম আছে, একজন সুমন আছে। কিন্তু তাদের সামাজিক অবস্থান, ভাষা, জাতীয়তা হয়তো ভিন্ন। এখানে আমি একজন স্কুল শিক্ষক, সে

BanglaBook.org

জগতে হয়তো ডাক্তার। সুমন এখানে অটিস্টিক ছেলে, সেখানে হয়তো সুস্থ। তুমি সুরমা বেগম সেখানে হয়তো একজন...'

সুরমা বেগম অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'কী যে আবোল-তাবোল কথা বলছ! পাগলি একটা মেয়ে যা মনে হলো, তা-ই বলে গেল, সেটাই সত্যি মনে করলে!'

জমির উদ্দিন স্যর মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, 'আমরা সাধারণ মানুষরা অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন কাউকে দেখলে, আপাতদৃষ্টিতে পাগল মনে করি।'

পরিশিষ্ট

জমির উদ্দিন স্যরের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া হ্রিলা নামের পাগলি মেয়েটার জন্যেই হোক আর অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, তাঁর ছেলে সুমন এখন সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ। সুমনের অটিজম রোগটা পুরোপুরি সেরে গিয়েছে। সে এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে। তবে সুমন পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর হঠাৎ একদিন হ্রিলা নামের পাগলি মেয়েটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুমন এখন ব্যবসা করে। বলতে গেলে সফল একজন ব্যবসায়ী। কিছুদিন আগে সে হীরা নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, হীরা নামের মেয়েটার চেহারা হুবহু সেই হ্রিলা নামের পাগলি মেয়েটার মত!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অশুভ এক রাতে

পৌষ মাসের মাঝ রাত।

তুহিনের মোটর বাইকটা ফাঁকা রাস্তায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলছে। শোঁ-শোঁ করে চোখে-মুখের উপর আছড়ে পড়ছে হিম শীতল ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা। ছুটন্ত বাইকে তুহিনের কাছে শীতটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুহিনের পরনে থাকা লেদার জ্যাকেট, জিন্সের প্যান্ট ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঠাণ্ডা বাতাস সুচের মত গায়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। পায়ে জুতো, হাতে হাতমোজা, মাথা-কান-গলা একটা উলের মোটা মাফলার দিয়ে পেঁচানো বলে তবু কিছুটা রক্ষে। তা না হলে বোধহয় ঠাণ্ডায় জমে যেতে হত।

তুহিন লেবুখালি গ্রাম থেকে তাদের রূপাতলির বাড়িতে ফিরছে। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ কিলোমিটারের পথ। লেবুখালি গ্রামে তুহিনের বড় বোনের শ্বশুর বাড়ি। তুহিনের বড় বোনের ননদের আজ বিয়ে হয়েছে। সেই বিয়েতে অংশগ্রহণ করতেই তুহিন লেবুখালি গিয়েছিল। কথা ছিল রাত দশটার মধ্যেই বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে। গ্রামের বিয়ে বলে কথা, রাত দশটার জায়গায় রাত একটা বেজে যায়।

অনেক রাত হয়ে গেছে দেখে তুহিনের বোন তুহিনকে থেকে যেতে বলেছিলেন। তুহিন রাজি হয়নি। সরগরম বিয়ে বাড়িতে রাত কাটানো মানে রাতের ঘুম হারাম করা। এটা নিশ্চিত, ও বাড়ির কেউ আজ রাতে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারবে না। এ ছাড়া কাল সকাল সাড়ে নয়টায় তুহিনের একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে। তুহিন হাজী আব্দুল কাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। বিয়ে বাড়িতে থেকে গেলে সকালের ক্লাসটা মিস হত।

বিয়ে বাড়িতে সারাদিনে অনেক হাসি-তামাশা, আমোদ-ফুর্তি, ছোটাছুটি

BanglaBook.org

হয়েছে। তুহিন এখন খুবই ক্লান্ত। ক্লান্ত শরীরটা চাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব বাড়িতে পৌঁছে, নিজের পরিচিত বিছানায় গরম লেপের ভিতরে ঢুকে পড়তে।

শীত যতটা সে হিসেবে কুয়াশা নেই বললেই চলে। অনেক দূর পর্যন্ত বাইকের হেড লাইটের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায়।

হঠাৎ তুহিন বেশ চমকে উঠল। রাস্তার মাঝ বরাবর কুচকুচে কালো রঙের মোটাসোটা একটা বিড়াল নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে। বিড়ালটা স্থির চোখে সোজা বাইকের হেড লাইটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হেড লাইটের আলোতে বিড়ালটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তুহিন বাইকের গতি কমিয়ে ফেলল। বিড়ালটার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই বিড়ালটা অলস ভঙ্গিতে রাস্তার পাশে নেমে গেল। তুহিনের মনে একটা ভাবনা ঢেউ খেলে গেল—ওর দাদীজান বলতেন, 'নিশুতি রাইতে পথের মইধ্যে বিলই দেহা খুবই অলক্কুনে।' দাদীর বলা কথা মনে করে তুহিন নিজের মনেই একটু হাসল। আগের দিনের মানুষের কত ধরনেরই না কুসংস্কার ছিল!

ফাঁকা রাস্তায় ভোঁ-ভোঁ শব্দ তুলে তুহিনের বাইকটা একটানা ছুটেই চলছে। তুহিন সাধুর বটতলা নামক জায়গায় পৌঁছে গেছে। এখানে রাস্তার পাশে অনেক দিনের পুরানো একটা কবরস্থান রয়েছে। বর্তমানে কবরস্থানটা বোধ হয় পরিত্যক্ত।

তুহিন কবরস্থানের পাশ ঘেঁষে ছুটছে। অনেক দূর থেকেই হেড লাইটের আলোতে চোখে পড়ল কবরস্থানের গেটের সামনে সাদা রঙের বোরখা পরিহিতা এক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহিলার কোলে সাদা কাপড়ে পেঁচানো পোঁটলার মত যেন কী একটা। মহিলা হাত উঁচিয়ে তুহিনকে বাইক থামানোর জন্য ইশারা করছেন।

তুহিন মহিলার সামনে গিয়ে বাইক দাঁড় করাল। অমনি তুহিনের নাকে ধাক্কা মারল আতর, লোবান, কর্পূরের মিশ্র তীব্র গন্ধ। মহিলার মুখ নেকাব দিয়ে ঢাকা। এমন কী চোখ দুটোও দেখা যাচ্ছে না। মহিলা কেমন যেন পাথরের মূর্তির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মহিলার বেশভূষা আর আতর, লোবান কর্পূরের গন্ধে তুহিনের প্রচণ্ড

BanglaBook.org

অস্বস্তি লাগতে লাগল। তুহিন অস্বস্তি মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'আমাকে থামালেন কেন? কী দরকার বলুন?' বাইকটা স্টার্ট অবস্থায় বলে প্রশ্নগুলো গলা উঁচিয়ে করতে হলো।

মহিলা কেমন রুক্ষ ধাতব কণ্ঠে আদেশের মত করে বললেন, 'আপনি তো বেলায়েতপুর বড় রাস্তা হয়ে যাবেন। আমাকে আপনার সাথে বেলায়েতপুর বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত নিয়ে যান।'

তুহিন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, 'এত রাতে আপনি এখানে কেন এসেছিলেন?'

মহিলা তাঁর কোলে থাকা সাদা কাপড়ে পেঁচানো পোঁটলাটাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই বাচ্চাটাকে কবর দেওয়ার জন্য। কবরস্থান বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ নেই। তাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

তুহিনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এতক্ষণ সে ভালভাবে লক্ষ করেনি, মহিলার কোলে থাকা যেটাকে সে পোঁটলা বলে মনে করেছে, সেটা আসলে একটা ছোট বাচ্চার কাফন পেঁচানো লাশ। লাশটার গা থেকেই আতর, লোবান, কর্পূরের গন্ধ আসছে।

তুহিন কিছুটা ভীত গলায় বলল, 'আপনি একা একটা মেয়ে মানুষ, এত রাতে লাশ দাফন করতে এসেছেন, এসব কী বলছেন!?'

'আমাদের বাড়িতে কোনও পুরুষ লোক নেই। আমার বোনের দুই মাস বয়সী এই বাচ্চাটা আজ রাতে মারা গেছে। মরা বাচ্চা তো আর ঘরে ফেলে রাখা যায় না। তাই দাফন করতে নিয়ে এসেছিলাম।'

তুহিনের কাছে মহিলার কথা তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। যত যা-ই হোক এত রাতে একা একটা মেয়ে মানুষ লাশ দাফন করতে কবরস্থানে আসতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনও ফন্দিফিকির সাজিয়েছে। আজকাল প্রায়ই পেপারে-পত্রিকায় দেখা যায়, এক দল সংঘবদ্ধ চক্র গভীর রাতে, যাত্রাপথে লাশ সাজিয়ে, অসুস্থ রোগী দেখিয়ে...বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করিয়ে, অটোরিকশা, ট্যাক্সি ক্যাব, প্রাইভেটকার, মোটর বাইক ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এই মহিলাও বোধহয় তেমন কোনও চক্রের সদস্য।

তুহিন কঠিন স্বরে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে সঙ্গে নিতে পারব না।' বলে বাইকের গিয়ার তুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা

BanglaBook.org

থমথমে গলায় বলে উঠলেন, 'এই গভীর রাতে, বাচ্চার লাশ সহ একটা অসহায় মহিলাকে একা ফেলে, তুই চলে যাচ্ছিস!! এর ফল ভাল হবে না। সামনে তোর অনেক বিপদ।'

তুহিন কবরস্থানের সীমানা ছেড়ে একটানে অনেক দূর চলে এল। কিন্তু তার মনের ভিতরে মহিলার বলা শেষ কথাটা খচখচ করতে লাগল, 'সামনে তোর অনেক বিপদ, সামনে তোর অনেক বিপদ, সামনে...'

তুহিনের মনে ভাবনা জাগল, মহিলাকে সে যা ভেবেছে, মহিলা হয়তো তা নয়। হয়তো মহিলা সত্যি সত্যিই বিপদগ্রস্ত, অসহায়। সে বোধহয় কাজটা ঠিক করল না। মহিলাকে সাথে করে নিয়ে আসাই উচিত ছিল।

তুহিন বাইক ঘুরিয়ে আবার কবরস্থানের দিকে যেতে লাগল। অনেক দূর থেকেই হেড লাইটের আলোতে মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। মহিলা এখনও কবরস্থানের গেটের সামনে দাঁড়ানো। এ কী করছেন মহিলা! মহিলা বাচ্চার লাশের গা থেকে কাফনের কাপড়টা খুলে ফেলছেন। সত্যিই ছোট্ট একটা বাচ্চার লাশ। তবে বাচ্চাটা আজ রাতে মারা যায়নি। মারা গেছে অন্তত দুই-তিন দিন আগে। কারণ লাশটা কেমন ফোলা-ফ্যাকাসে।

মহিলা কাফনের কাপড়টা সম্পূর্ণ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ফুলে ঢোল হওয়া বাচ্চার উলঙ্গ লাশটার হাত-পা শক্ত হয়ে রয়েছে। মহিলা তাঁর দু-হাতে বাচ্চার লাশটার পায়ের নলা দুটো ধরে, উল্টিয়ে ঝুলিয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় দু-দিকে হ্যাঁচকা টান দিলেন। হ্যাঁচকা টানে বাচ্চার লাশটার দুই উরুর সংযোগ স্থল থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেল। ছেঁড়া দুই ভাগের এক ভাগের সাথে সংযুক্ত রইল গলা সহ বাচ্চাটার মাথাটা। ছেঁড়া দুই খণ্ড দিয়ে টপ টপ করে ঝরতে লাগল জমাট বাঁধা থিকথিকে কালচে রক্ত।

মহিলা মুখ থেকে নেকাবটা খুলে ফেললেন। এ কী দেখছে তুহিন!!! মহিলার ভয়ঙ্কর বীভৎস একটা মুখ। চোখের জায়গায় চোখবিহীন দুটো গাঢ় অন্ধকার কোটর। নাকের জায়গায় পাশাপাশি দুটো ফুটো। ঠোঁটের আবরণবিহীন উন্মুক্ত মুখ ভর্তি সুচালো দাঁতের সারি।

বীভৎস চেহারার মহিলা, ছিঁড়ে দুই ভাগ করে ফেলা বাচ্চার লাশটার একটা ভাগ মুখে তুলে চপচপ করে খেতে লাগল। বাচ্চার লাশটার গা থেকে বের হওয়া পচা কালচে রক্তে মহিলার মুখ, হাত, সাদা বোরখা

BanglaBook.org

মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। আর সহ্য করা যায় না। এ কি সত্যি না কোনও দুঃস্বপ্ন! তুহিনের বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাতে-লাফাতে ফেটে যাবার উপক্রম। এত শীতের মাঝেও সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। বাইকের মুখ ঘুরিয়ে সে ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল।

কবরস্থানের এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে তুহিন। এখনও তার বাইকটা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছে। মনে হচ্ছে সে যেন শূন্যে ভেসে ছুটছে। সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। এ কী দৃশ্য দেখল সে!!! যা দেখেছে তা কি সত্যিই না বিভ্রম?

হঠাৎ বাইকটা ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে কয়েকটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল।

রাস্তার এক পাশে বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে আবার স্টার্ট করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল তুহিন। বাইকের তেলের ট্যাংকিতে রিজার্ভ তেল ঠিক মত আছে। প্লাগেও ময়লা জমেনি। অন্য কোনও সমস্যাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কিছুতেই বাইকটা স্টার্ট নিচ্ছে না। কিকারে কিক করতে করতে তুহিনের পা ব্যথা হয়ে গেল।

বাইকটা যে একেবারেই স্টার্ট নিচ্ছে না তা নয়। মাঝে মাঝে ঠিকই স্টার্ট হচ্ছে কিন্তু গিয়ার তুলে রানিং করতে চাইলেই রানিং না হয়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বাইকটা স্টার্ট হওয়ার পর গিয়ার তুলে রানিং করতে গিয়ে যখন স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন যদি তুহিন বাইকের পেছনে তাকায়, তা হলে সে দেখতে পাবে–তার বাইকের পেছনের চাকাটা দুটো ছোট ছোট হাত টেনে ধরছে। কনুই থেকে ছিঁড়ে ফেলা ছোট বাচ্চার দুটো ছিন্ন হাত।

তুহিন যখন বীভৎস চেহারার মহিলাকে বাচ্চার লাশটা ছিঁড়ে দুই ভাগ করে খেতে দেখে বাইক ঘুরিয়ে পালিয়ে এসেছিল তখন সেই মহিলা তুহিনকে পালাতে দেখে বাচ্চার লাশটার হাত দুটো কনুই থেকে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। অমনি হাত দুটো জীবন্ত প্রাণীর মত পিলপিল করে বাইকের পিছনে ছুটতে শুরু করে। বাইকের পিছনে ছুটতে ছুটতে এই পর্যন্ত পৌঁছনোর পর হাত দুটো বাইকটার নাগাল পেয়ে পেছনের চাকা টেনে ধরে বাইকটা থামিয়ে ফেলে। এখনও স্টার্ট তুলে রানিং করতে চাইলে পেছনের

BanglaBook.org

চাকা টেনে ধরছে। তুহিন যখন বাইক থেকে নেমে, বাইকের সামনে-পেছনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সমস্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, তার আগেই হাত দুটো অতি দ্রুততার সাথে পিলপিল করে রাস্তার পাশের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে। তুহিনের চোখে ফ্যাকাসে হাত দুটো ধরা পড়ছে না।

আধ ঘণ্টা ধরে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা কৌশল খাটিয়ে গায়ের ঘাম ছুটিয়েও বাইকটার আর স্টার্ট তোলা সম্ভব হলো না। তুহিন নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। বাইক রেখে রাস্তার মাঝ বরাবর দাঁড়াল, যদি এই পথে কোন বাস-ট্রাক বা অন্য কোনও যান রূপাতলির দিকে যায় সেটাকে থামিয়ে লিফট চাওয়ার উদ্দেশ্যে।

নীরব নির্জন একটা জায়গা। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। আকাশে কৃষ্ণ পক্ষের মরা চাঁদ। চাঁদের আলোতে রাস্তার দু-পাশে যতদূর চোখ যায় শুধু ধু-ধু ফসলের খেত।

তুহিন পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল। ফোন করে বাড়িতে জানাবে, বাইক নষ্ট হয়ে সে যে পথের মাঝে আটকা পড়েছে। কী আশ্চর্য! মোবাইল সেটটা কখন যেন পকেটেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। তুহিন অনেক টেপাটিপি করল কিন্তু মোবাইল ফোনটা আর অন হলো না। বোধহয় চার্জ ফুরিয়ে গেছে। অথচ বিয়ে বাড়ি থেকে রওনা দেবার আগেও ফুল চার্জ ছিল।

তুহিনের বুকের ভিতরে এখনও ধক-ধক করছে। সে কী দৃশ্য দেখে এসেছে!!! তা কি এত সহজে ভোলা যায়! এখানে এসে বাইক নষ্ট হয়ে আবার এই দুর্ভোগ। তার উপর মোবাইল ফোনটাও কাজ করছে না। আজ রাতে কপালে আরও কত কী আছে কে জানে? এর চেয়ে বিয়ে বাড়িতে থেকে গেলেই হত। একটা রাত না ঘুমালে আর কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত! নিজের উপরই নিজের এখন রাগ লাগছে তুহিনের।

তুহিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দূর থেকে দুটো হেড লাইটকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তুহিন সঙ্গে সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে দু-হাত তুলে যানটাকে থামার ইশারা করতে লাগল।

যানটা এসে একেবারে তুহিনের সামনে থামল। একটি ট্রাক। ট্রাকে

BanglaBook.org

ট্রাকের ড্রাইভার এবং ড্রাইভারের পাশের সিটে দুজন রোগা চেহারার হেলপার বসা। তিনজনের গায়েই সাদা রঙের পাঞ্জাবি-টুপি পরা। আজব দৃশ্য! পাঞ্জাবি-টুপি পরা ট্রাক ড্রাইভার-হেলপার– সাধারণত দেখা যায় না।

ড্রাইভার লোকটা জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, 'কী সমস্যা? গাড়ি থামালেন কেন?'

লোকটার গলার স্বরটা যেন কেমন রসকষহীন রুক্ষ। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। পাথরের মত স্থির চোখের মণি। বোধহয় নেশাটেশা করেছে।

তুহিন অসহায় গলায় বলল, 'ভাই, আপনারা কত দূর যাবেন? আমার বাইকটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।'

ড্রাইভার লোকটা একই রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা রূপাতলি পেট্রোল পাম্প হয়ে ঝালকাঠির দিকে যাব।'

তুহিন বলল, 'আমাকে রূপাতলি পেট্রোল পাম্পের সামনে নামিয়ে দিলেই হবে।'

'ওঠেন তবে।' হেলপার দুটোর দিকে তাকিয়ে, 'তোরা যা মোটর সাইকেলটা গাড়ির পেছনে উঠিয়ে, তোরাও পেছনে উঠে বস।' আবার তুহিনের দিকে তাকিয়ে, 'আসেন, আপনে আমার পাশে এসে বসেন।'

ট্রাক ছুটে চলছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে তুহিন বসে আছে।

ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার এদের সাথে কথা বলে, এদের সংস্পর্শে এসে বীভৎস দৃশ্যটা দেখে পাওয়া ভয়টা অনেকটাই কেটে গেছে তুহিনের। অবশ্য এদের কাছে সে সেই ভয়ানক দৃশ্যটার কথা বলেনি। বললে এরা আবার তার সম্পর্কে কী ভাববে কে জানে? তার চেয়ে না বলাই ভাল।

চলন্ত ট্রাকে ড্রাইভারের পাশের সিটে মাথা এলিয়ে নিজের অজান্তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল তুহিন। হঠাৎ ট্রাকটা থেমে যাওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল। আশপাশে তাকিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কোথায় এসে পৌঁছেছে। না রূপাতলি পেট্রোল পাম্পে পৌঁছয়নি, অন্য কোথাও। রাস্তার দু-পাশে ঘন অন্ধকার।

রাস্তার বাম পাশ ঘেঁষে ট্রাকটা দাঁড় করানো। তুহিন হতচকিত দৃষ্টিতে

BanglaBook.org

লোকগুলো এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। লোকগুলোর চোখ থেকে মণি গায়েব হয়ে বিড়ালের চোখের মত চোখগুলো জ্বলে উঠেছে। ট্রাকের ড্রাইভার-হেলপার তাদের চোখেও একই রূপ।

তুহিনের ভীত-বিহ্বল চেহারা দেখে লোকগুলো হঠাৎ একসঙ্গে বিকট শব্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির শব্দে আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠল। হাসতে-হাসতে লোকগুলোর ঘাড়ের উপরে মুণ্ডুটা সামনে থেকে পিছনে ঘুরতে লাগল। যেন প্রতিটা লোকের মুণ্ডু ঘাড়ের উপরে আলগা ভাবে বসানো।

বাঁচতে হলে আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। পালাতে হবে। ঝেড়ে দৌড় লাগাল তুহিন। পিছনে সকলের মিলিত হাসির শব্দও তাড়া করতে লাগল।

তুহিন রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান-শূন্য হয়ে উন্মাদের মত। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের ম্লান চাঁদের আলোতে কাঁটা ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল মাড়িয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছুটেই চলছে। ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গলে হোঁচট খেয়ে পড়ে হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ না করে ছুটেই চলছে। তার মনে একটাই ভাবনা, কবরস্থানের সীমানা অতিক্রম করে তাকে পালাতে হবে।

দৌড়াতে-দৌড়াতে হঠাৎ কীসের সাথে যেন পা হড়কে ছিটকে একটা খাদের মধ্যে পড়ে গেল তুহিন। গাঢ় অন্ধকার গভীর একটা খাদ। খাদের মধ্যে লম্বা-লম্বি ভাবে সটান হয়ে পড়ল সে। তার বুক হাপরের মত ওঠা-নামা করছে। খাদটা থেকে ওঠার মত জোর আর তার গায়ে অবশিষ্ট নেই। ততক্ষণে সাদা পোশাকধারী ভয়ঙ্কর চেহারার সেই লোকগুলো চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। লোকগুলোর হাতের লণ্ঠনের আলোতে বোঝা গেল এতক্ষণ যেটাকে খাদ বলে মনে হয়েছে সেটা আসলে নতুন খোঁড়া সেই কবরটা। বিশাল কবরস্থানের সীমানার মধ্যে দিগজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে ঘুরে-ফিরে তুহিন নতুন খোঁড়া কবরটার ভিতরেই ছিটকে পড়েছে।

তুহিন কবরের ভিতর থেকে 'বাঁচাও-বাঁচাও' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চাইছে কিন্তু তার গলা দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে এক জাতীয় দম বন্ধ হওয়া শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হচ্ছে না। আর লোকগুলো গম-গম করে আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে সমস্বরে হাসতে-হাসতে ধীরে ধীরে তুহিনকে মাটি চাপা দিয়ে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

তিথি

একটা নরম হাতের আলতো ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভাঙল। তার চুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। আমি চোখ বন্ধ অবস্থায়ই বুঝতে পারছি এটা কার হাতের স্পর্শ। এ হাত আমার প্রাণপ্রিয়া তিথির হাত। সে আমাকে প্রতিদিনই এভাবে সকালে ঘুম থেকে জাগিয়ে সময় মত অফিসে পাঠায়। মাঝে-মাঝে ভাবি তিথি যদি আমাকে এভাবে ঘুম থেকে তুলে অফিসে না পাঠাত তা হলে আমি একদিনও ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারতাম না। আমি সোনালী ব্যাংকের একজন জুনিয়র অফিসার। ঠিক সময় মত অফিসে না যেতে পারলে অনেক সমস্যা হত। তিথি যে আমার কী তা আমি বলে বুঝাতে পারব না। সে আমার সব কিছু।

তিথির সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় আজ থেকে সাত বছর আগে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, ভাললাগা, প্রেম। তিথিকে আমি কতটা ভালবাসতাম সেটা আমি ঠিক জানি না, তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমি ভাবতাম বিয়ে করার বয়স হয়েছে, একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে হবে–অন্য সবার চেয়ে একটু আগেই। কারণ, আমি আমার বিধবা মায়ের এক মাত্র সন্তান, তাই তিথির সাথে লেগে থাকা উচিত, কারণ তিথির চেয়ে সুন্দরী বা ভাল মেয়ে আমার জুটবে না। সব কিছু ভালই চলছিল। তিথির পরিবার ও আমার মা আমাদের সম্পর্ক মেনে নেয়। শুভ একটি দিন দেখে শীঘ্রি আমাদের দু'জনার হাত এক করে দেবে এমন সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ফোন আসে তিথি এক্সিডেন্ট করেছে। ও রিকশায় চড়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে একটি ট্রাক রিকশাটাকে ধাক্কা দেয়। আমি খবরটা শুনে ছুটে শেরে বাংলা হসপিটালে চলে যাই। গিয়ে দেখি আমি যেতে যেতে সব শেষ। আমার তিথির দেহটা সাদা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। কাপড়টা তুলে দেখি তিথি বিষণ্ন মুখে ঘুমিয়ে আছে যেন। নাকের

BanglaBook.org

নীচে রক্ত জমা আছে। ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ডাক্তাররা কোন ভুল করছে, সত্যিই তিথি ঘুমিয়ে আছে। আমি তিথির কানের পাশে গিয়ে কয়েকবার 'তিথি, তিথি' বলে ডেকেছি। কিন্তু তিথি আর আমার ডাকে সাড়া দেয়নি! তার পর তিন-চার দিন কীভাবে কেটেছে তা আমার মনে নেই।

তিন-চার দিন পর একদিন রাতে, মন খারাপ করে আমি ছাদে বসে আছি আর তিথির কথা ভেবে কাঁদছি এমন সময়, 'তুমি কাঁদছ কেন, আমি তো তোমার পাশেই আছি,' এমন কথা তিথির কণ্ঠে শুনে অবাক হয়ে আশপাশে তাকাই, দেখি আমার পাশে তিথি দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভয় পেয়ে যাই, ভাবি তিথি তো মরে গেছে। সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কী ভাবে? তিথি আবার বলে ওঠে, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি আমার হাত ছুঁয়ে কথা দিয়েছিলে না যে সারা জীবন আমি তোমার সাথে থাকব, পাশাপাশি থাকব, কখনও ভুলে যাব না, দূরে যাব না?'

আমি বলি, 'তুমি তো মরে গেছ, তুমি কী করে আবার ফিরে এলে?'

তিথি বলে, 'আমি পৃথিবীর সবার কাছে মরে গেলেও তোমার কাছে মরিনি।' তাতে আমার ভয় আরও বেড়ে যায়। তিথি বলে ওঠে, 'তুমি এক সময় বলতে না আমি তোমার জন্য মরে যেতেও পারি, তুমি যদি আমার জন্য মরতে পার তা হলে আমি কেন তোমার জন্য মরে গিয়েও আবার ফিরে আসতে পারব না? তুমি আমার হাত ধরো, তোমার ভয় কেটে যাবে।' এই বলে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তার হাত ধরি এবং সত্যিই আমার ভয় কেটে যায়। কেঁদে কেঁদে বলি, 'তুমি কেন মরে গেলে?'

তিথি বলে, 'তোমায় আগেই বলেছি না, আমি সবার কাছে মরে গেলেও তোমার কাছে চিরদিন বেঁচে রব।'

এরপর থেকে প্রথম প্রথম রাতে, পরে ধীরে ধীরে যখন আমি একা হই তখনই তিথি আমার কাছে আসতে থাকে। অনেক কথা হয়– দুঃখের কথা, সুখের কথা, ভালবাসার কথা, ভাললাগার কথা। সে আমাকে প্রতিদিন রাতে, পাশে শুয়ে গল্প করে, গায়ে হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে আদর করে, মোট কথা একজন স্ত্রী স্বামীর জন্য যা করে তাই করে। বেশি রাত জাগলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে বলে, আবার সকালে আদর করে ডেকে তুলে

BanglaBook.org

নিজের পছন্দের রং-এর শার্ট প্যান্ট পোশাক পরিয়ে সময় মত অফিসে পাঠায়। ধীরে ধীরে এক সময় সব স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবুও আমার মনে খটকা লেগে থাকে, এটা হতে পারে না। কোথাও ভুল হচ্ছে, আমি সাহস করে কাউকে এ কথা বলিও না, এমন কী মাকেও না। মা এমনিতেই বৃদ্ধ মানুষ, অনেক রোগে জর্জরিত, তার উপর আমাকে নিয়ে এমনিতেই অনেক চিন্তা করে। প্রায়ই বলে, 'বাবা, সব ভুলে গিয়ে একটা বিয়ে কর, তোকে তো সংসার ধর্ম করতে হবে, ভাগ্যের লিখন তো আল্লার হাতে, আমাদের তো সেটা মেনে নিতেই হবে।'

আমি চুপ করে থাকি আর মনে মনে ভাবি, একটি বউ থাকতে কেউ আবার আর একটি বিয়ে করে নাকি? তিথির এভাবে আসার পর থেকে আমি বিছানায় দুটি শোয়ার বালিশ ব্যবহার করি। কাজের মেয়ে এই দেখে প্রায়ই বলে, 'ভাইজান, আপনে তো একা, দুইটা বালিশ বিছানায় পাইতা রাখেন কেন?'

আমি চুপ করে থাকি, আর মনে মনে অস্বস্তি আরও বাড়তে থাকে। একদিন অস্বস্তি আর চাপা না দিতে পেরে আমার খুব কাছের এক বন্ধুর কাছে সব কথা খুলে বলি। সব শুনে বন্ধুটি আবোল-তাবোল প্রশ্ন করতে থাকে। আমি চুপ করে থাকি আর মনে মনে ভাবি কেন যে বলতে গেলাম, বলা উচিত হয়নি–এটা একান্ত আমার ব্যাপার।

এর কিছুদিন পর একদিন বিকেলে সেই বন্ধুটি আমার অফিসে এসে উপস্থিত, বলে, 'তোর কোন কাজ আছে? না হলে চল তোকে নিয়ে আমি এক আত্মীয়ের বাসায় যাব।'

আমি প্রথমে রাজী হই না, পরে ওর পীড়াপীড়িতে না গিয়ে পারি না। বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েই বুঝি বন্ধু আমাকে মিথ্যে কথা বলে এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে এসেছে। মনে মনে আমি খুব রাগ করি, বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কেন করলি?'

বন্ধু বলে, 'এই ডাক্তার আমার খুব পরিচিত। আর তুই তো রোগী হিসাবে দেখাতে আসিসনি। জাস্ট তোর সাথে আলাপ আলোচনা করবে।'

রাগ চেপে অনেক কষ্টে বসে থাকি।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের সাথে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা শেষে

BanglaBook.org

ভদ্রলোক, আমার বাড়িতে কজন লোক, আমি কী করি এবং আমার সমস্যা সম্পর্কে জানতে চান। আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বলি, 'না, ওইটা আমার কোন সমস্যা নয়।'

সাইকিয়াট্রিস্ট অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'আপনার প্রেমিকা যে আপনার কাছে আসে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন?'

আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি দিতে পারব। তা হলো যে আমার বিছানায়, বালিশে মাঝে মাঝে মেয়েদের চুল লেগে থাকে, এ ছাড়া আমি যখন বাড়িতে থাকি না, বাড়িতে ফেরার পর তিথি আমাকে বাড়িতে কে কে এসেছিল, মায়ের শরীরের অবস্থা কেমন, এমনকী কী রান্না হয়েছে তাও বলে দেয়। এ ছাড়া বিশেষ তারিখগুলোর কথা, যেমন তিথির সাথে আমার প্রথম দেখা হওয়ার কথা, বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার দিনের কথা, এমন কী ওর মৃত্যুর তারিখের কথা আমায় মনে করিয়ে দেয়।'

সাইকিয়াট্রিস্ট আমার সব কথা শুনে বলেন, 'আসলে সত্যি কথা কি জানেন, আপনার প্রেমিকা কখনোই আপনার কাছে আসেন না, সবটাই আপনার কল্পনা, আপনার অবচেতন মন দিয়ে তৈরি করা স্বপ্ন। যেমন ধরুন, আপনি যে প্রমাণগুলো দিয়েছেন তা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে কী দাঁড়ায় দেখুন, প্রথমে বিছানায় বালিশে চুল, এটা আপনার বাসার কাজের মেয়ের মাথার চুল হতে পারে।

মায়ের শরীরের অবস্থা, মন থেকে কল্পনা করে তিথির কথা বলে ধরে নেন। এ ছাড়া রান্নার গন্ধ থেকে অনুমান করে নিয়ে রান্না কী হয়েছে ধরে নেন। দিন-তারিখ মনে করিয়ে দেয়া, কে-কে বাড়িতে এসেছে সবটাই কল্পনা, আপনার অবচেতন মনের খেলা। আপনি বরং একটি বিয়ে করে ফেলুন বা কোন প্রেমিকা জুটিয়ে ফেলুন, তা হলে দেখবেন আপনার সমস্যা শেষ হয়ে যাবে।'

সাইকিয়াট্রিস্ট টেনিল, রেংজিট এই জাতীয় কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দিয়ে বলেন, প্রতিদিন রাতে নিয়ম মাফিক খেতে।

ওষুধ খাওয়ার পর আমার কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু রাতে খুব জলদি ঘুমিয়ে পড়ি। রাত জেগে তিথির সাথে গল্প হয় না, সকালে তিথির স্পর্শে ঘুম ভাঙে।

BanglaBook.org

আমার বন্ধুটি পরে অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এখন কেমন বুঝিস?' আমি মিথ্যে করে বলেছি, 'হ্যাঁ, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে।

তিথি আমাকে বলছে, 'কী, এখনও চোখ বন্ধ করে আছ কেন? কী ভাবছ? আজ অফিসে যাবে না?'

আজ শুক্রবার আমার ঠিকই মনে আছে, কিন্তু তিথির মনে নেই। আরে, একথা তো সাইকিয়াট্রিস্টকে বলা হলো না, তিথি যে মাঝে মাঝে দিন তারিখ ভুলও করে।

চোখ খুলে দেখি, আমার প্রিয়া এক রাশ এলোমেলো চুল নিয়ে আমার উপর ঝুঁকে বসে আছে। অপরূপ লাগছে তাকে! মনে মনে ভাবছি তিথির হাত ধরে আবার কথা নিতে হবে সে যেন কখনও আমাকে ছেড়ে না যায়। আমার একান্ত গোপন সঙ্গিনী হয়ে থাকে চিরদিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অসমাপ্ত রহস্য

এক

যখন ছাত্র ছিলাম, তখন একটু সুযোগ পেলেই বা পরীক্ষা শেষ হলে, কিছুদিনের জন্য বেড়াতে চলে যেতাম আমার ছোট খালার বাড়িতে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো এখন আর বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়ে ওঠে না। তবে আমার খালা প্রতি বছর শীতের শুরুতেই সুদীর্ঘ এক চিঠি লিখে পাঠায়। সেই চিঠিতে থাকে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ, আরও থাকে লোভনীয় বিভিন্ন প্রস্তাব। খেজুরের কাঁচা রস, বিভিন্ন পিঠা-পায়েস, অতিথি পাখি শিকার, খালার বাড়ির বড় পুকুরটা যেটা বর্ষার সময় নদীর সাথে মিশে যায় সেটায় বড় বড় মাছের উপস্থিতি!

আমার এই ছোট খালা এমন এক মহিলা যার চেহারার মাঝে মা-মা একটা ভাব আছে। এমন কী তার চিঠির মাঝেও সেই মা রূপটি ফুটে ওঠে। প্রতি বছরই চিঠি পাওয়ার পর কিছুদিন ব্যস্ত হয়ে উঠি বেড়াতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

গত বছর চিঠি পেয়ে অটল সিদ্ধান্ত নিলাম এবার যাবই। সব ঠিক করে ফেলি। কবে রওনা দেব, কাকে সাথে নেব, খালাকে কী উপহার দিয়ে মুগ্ধ করব, এইসব। খালার জন্য দামি একটা শাল কিনে ফেলি। শেষ পর্যায়ে মনে পড়ে, খালা বেশি খুশি হবে গল্প-উপন্যাসের বই পেলে। হুমায়ূন আহমেদ বা ইমদাদুল হক মিলনের বই পেলে।

বইয়ের বিশাল এক স্তূপ করে ফেলি। খালার জন্য বেশ কয়েকটি হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস, খালাতো ভাই রিয়াজের জন্য মাসুদ রানা সিরিজের বেশ কিছু বই, তার সাথে তিন গোয়েন্দা ভলিউমও বেশ কিছু এবং সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার নির্বাচিত গল্পের দুটি বই। মনে মনে ভেবে রাখি খালাতো ভাইয়ের জন্য কেনা মাসুদ রানা সিরিজের "সর্পলতা" বইটির

BanglaBook.org

উপর আমারও ভাগ বসাতে হবে, কারণ ওই বইটি তখন পর্যন্ত পড়া হয়নি আমার। আমার ছোট খালু আর্মির রিটায়ার্ড পার্সন। বেশ গম্ভীর ধরনের লোক। তাঁর জন্য আহসান হাবীব এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর বেশ কয়েকটি বই কিনি। খালুর জন্য আরও তিনটি বই নিয়েছি যা আমার নিজের সংগ্রহেই ছিল। তা হলো, হেল কমাণ্ডো, টম ক্ল্যান্সির দ্য হান্ট ফর রেড অক্টোবর এবং পচান্দি গাজীর সুন্দরবনের মানুষখেকো।

আমার সাথে যাবে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাইফুল্লাহ। সে আমার ছেলে বেলা থেকেই খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই কবে, তার নাকে ঝুলে পড়া সর্দি রহস্য থেকে। ব্যাপারটা খুলেই বলি, আমি তখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি। প্রতিদিন আমার পাশে গাট্টা-গোট্টা একটা ছেলে এসে বসে। তার নাক দিয়ে হলদে রঙের পাকা সর্দি ঝুলে ঠোঁট পর্যন্ত নেমে আসে। শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ যখন ঠোঁট বেয়ে নেমে যায়-যায় অবস্থা, ঠিক তখনই সে নাক দিয়ে হড়ৎ করে এক ধরনের শব্দ করে, অমনি হলদে সেমি থিকথিকে অদৃশ্য। আবার কিছুক্ষণ পর হলুদ সর্দি ঝুলে পড়ে, আবার হড়ৎ শব্দ, আবার অদৃশ্য। ছেলেটার এই ব্যাপারটা আমাকে খুব আকর্ষণ করে। আমার ঘৃণা লাগে না, বরং মনে হয় এটা একটা আর্ট, নিমেষেই সর্দি গায়েব করার জাদু। তার সাথে আলাপ জমাই। নাম জানা হয় তার, সাইফুল্লাহ। সে মুখ গোল করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলে, 'জানো! সাইফুল্লাহ নামের অর্থ কী?'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'না!'

সে অহংকারী ভঙ্গিতে বলে, 'সাইফুল্লাহ অর্থ আল্লার তরবারী।'

বর্তমানে আমার বন্ধুটি তরবারী না হলেও মুগুর হয়েছে সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তার গোল-গাল শরীর সেই কথাই বলে। বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধুটি শিকারি হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সারাদিন এয়ারগান হাতে ঘুরে বেড়ায়। চোখের সামনে যা পড়ে ইঁট, পাথর, কলা গাছ, বিদ্যুৎ-এর খুঁটি সেদিকেই গুলি ছুঁড়ে বলে, 'এইমটা ঠিক করছি।' বন্ধু মনের কথা অবশ্য আমাকে বলে, তার ইচ্ছে জিম করবেট-এর মত শিকারি হবে। বন্ধু তার শিকারি জীবনে এখন পর্যন্ত দুটি প্রাণী শিকার করতে পেরেছে, তা হলো:—পাশের বাড়ির পোষা একটা কবুতর আর ছাদে কাপড় শুকাতে

যাওয়া মধ্য বয়স্কা এক মহিলার পিঠ। দুটি ক্ষেত্রেই বন্ধুকে যথেষ্ট অপদস্থ হতে হয়েছে। তার পরেও বন্ধুটি হাল ছাড়েনি। খালার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুটিকেই উত্তম সঙ্গী মনে হলো। বন্ধুও গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। গুলি টুলি কিনে এয়ারগান নিয়ে সে পুরোপুরি প্রস্তুত। কিন্তু যাওয়ার আগের দিন এসে বলে, সে বিশেষ কাজে আটকে গিয়েছে, যেতে পারবে না। সে না বললেও আমি বুঝতে পারলাম তার বিশেষ কাজটা কী, ইদানীং সে বিয়ে করার জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করেছে। অনেক মেয়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোন মেয়েই তার পছন্দ হচ্ছে না। সে একটু কম বয়সী মেয়ে বিয়ে করতে চায়, এই নাইন কি টেনে পড়া। ঘটকের মাধ্যমে নাইন-টেনে পড়া মেয়ের খোঁজও পাচ্ছে, কিন্তু মেয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায় সে মেয়ে ঠিকই নাইনে পড়ে কিন্তু তার যে বয়স তাতে মাস্টার্স কমপ্লিট করা উচিত ছিল। আর সত্যিকারের অল্প বয়সী মেয়ে পেলেও দেখা যাচ্ছে সে মেয়ে আমার বন্ধুকে 'মামা' বলে সম্বোধন করছে। বন্ধু হাল ছাড়েনি, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধু সাথে যাবে না, শুনে আমার উৎসাহ কিছুটা মিইয়ে যায়। এতগুলো বই-টই নিয়ে একা যেতে খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু খালার লেখা চিঠির শেষে বিঃ দ্রঃ লিখে যে কথাটা রয়েছে, সেই ব্যাপারটা আমাকে খুবই আকর্ষণ করছে। লেখা রয়েছে, 'গ্রামে আবু নামের এক রহস্যময় লোকের আগমন, তাঁর অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা রয়েছে, মৃত আত্মার সাথে নাকি তাঁর যোগাযোগ। আমাদের এখানে এলে তাঁর সম্পর্কে আরও ভাল জানতে পারবি।'

BanglaBook.org

দুই

আমি অনেক ঝামেলা সহ্য করে একাই চলে গেলাম খালার বাড়িতে। অনেক আগেই সূর্য ডুবে গিয়েছে, সন্ধে বেলার কালো আঁধারের মাঝেই আমি গিয়ে পৌঁছালাম খালা বাড়ির সুবিশাল উঠানে। উঠানে দাঁড়িয়েই

খালাতো ভাইয়ের নাম ধরে ডাকলাম। আমার গলার স্বর শুনে খালা ও খালাতো ভাই রিয়াজ মোমবাতি হাতে ছুটে এল। খালা তো আমাকে দেখেই আদরমাখা বকা-ঝকা শুরু করে। 'এত দিন পরে মনে পড়ল আমার কথা, মরে গেলেও জানবি না, গ্রামের মানুষ, মানুষ না,' আরও কত কী।

মোমের আলোতেই রাতের খাওয়া সারলাম। আলু ভাজি, ডিম ভুনা আর বেগুন কাঁচকি মাছের ঝোল দিয়ে খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খালার রান্নার হাত অসাধারণ। খালা একটু পর পরই শুধু বলছে, 'কখন যে কারেন্ট আসবে? তুই শহরের মানুষ, মোমের আলোতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে তোর।'

আমি খালাকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'মোটেই খারাপ লাগছে না। মোমের আলোর অভিজ্ঞতা আমারও কম নেই, তোমাদের পল্লী বিদ্যুৎ-এর চেয়ে শহরের বিদ্যুৎ কোন অংশে কম বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে না।'

খালাদের এখানকার পল্লী বিদ্যুৎ-এর সিস্টেম হচ্ছে রাত দশটার পর আসবে এবং ফজরের আযান পর্যন্ত থাকবে অর্থাৎ গ্রামের মানুষের ঘুমানোর সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে, বাকি সময় বিদ্যুৎহীন।

খাওয়া শেষ হলো অনেকক্ষণ পর। খালা, আমি আর খালাতো ভাই রিয়াজ বসার ঘরে, মোমের মিটি-মিটি আলোতে বসে আছি। আমাদের মধ্যে নিচু স্বরে কথা হচ্ছে। খালা খুঁটি-নাটি অনেক প্রশ্ন করছে। আমি ক্লান্ত দেহে হাই তুলতে তুলতে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আর রিয়াজ আমার আনা বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছে আর ভ্রু কুঁচকাচ্ছে। তবে তিন গোয়েন্দা ভলিউমগুলো বেশ আগ্রহ নিয়ে মোমের কাছে গিয়ে খানিকটা পড়ার চেষ্টা করছে। খালুজান এখন পর্যন্ত ফেরেননি। তিনি নাকি প্রতি সন্ধ্যায়ই বাদল পাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক জমির উদ্দিনের বাসায় যান। সেখানে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁদের দাবার আসর চলে।

খালার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ঘুম একেবারে ভাল ভাবেই আমাকে পেয়ে বসে। সারাদিন নৌকা, বাস, ভ্যান জার্নির ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। খালুজানের সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা না করে ঘুমিয়ে যাব ভাবছি। হঠাৎ মনে পড়ল খালার চিঠিতে বিঃ দ্রঃ লিখে যে আধ্যাত্মিক লোকের কথা লেখা ছিল সেটা।

BanglaBook.org

খালাকে প্রশ্ন করলাম, 'কী এক আধ্যাত্মিক লোকের কথা লিখলে চিঠিতে?'

খালার কণ্ঠস্বর নীচে নেমে গেল, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'আবু মিয়া খুবই ভয়ানক লোক, রাতের বেলা তার কথা আলোচনা না করাই ভাল।'

খালার এমন ভয় পাওয়া কণ্ঠস্বর শুনে মনে পড়ে গেল আমার ছোট বেলার কথা। ছোট সময় খালা আমাকে ভাত খাইয়ে দেওয়ার সময় বা ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার সময় এমন ভীত কণ্ঠে বিভিন্ন ভৌতিক গল্প বলত। সত্যিই খালার এইসব গল্প বলার ধরন খুবই চমৎকার। ভয় পেতেই হবে। রিয়াজ এতক্ষণ আমাদের থেকে একটু দূরে বসে বই নেড়ে-চেড়ে দেখছিল। আবু মিয়ার কথা উঠতেই সে-ও কৌতূহলী হয়ে আমাদের কাছে এসে বসল।

আমি বললাম, এই আবু মিয়াটা কে? অর্ধেক কথা না বলে একটু ভালভাবে বুঝিয়ে বলো।

খালা আবার ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামের চেয়ারম্যান খালেক সিকদারের কাছারি ঘরের খোলা বারান্দায় ভোর বেলা এক ঘুমন্ত লোককে দেখা যায়। অপরিচিত মুখ, এর আগে কেউ কখনও তাঁকে এই বাদল-পাড়া গ্রামে দেখেনি। অনেক ঠেলে-ঠুলে, তার ঘুম ভাঙানো হয়। ঘুম থেকে উঠে ফ্যাল-ফ্যাল করে সবার দিকে তাকাতে থাকে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে, কেডা তুমি? কই থেকে আসছ? এই সব। কিন্তু লোকটা কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, শুধু কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে সবাইকে দেখে আবার শুয়ে পড়ে এবং সাথে সাথেই ঘুমিয়ে যায়। সারা দিনই লোকটা বেঘোরে ঘুমায়। দিনভর চেয়ারম্যানের লোকজন শত চেষ্টা করেও তার ঘুম ভাঙাতে পারে না। সন্ধ্যায় চেয়ারম্যান এসে তাঁর কাছারি ঘরের বারান্দায় জরা জীর্ণ চেহারার ওই লোককে ঘুমাতে দেখে খুবই রেগে যায়। চেয়ারম্যানের রাগ করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। ঘুমন্ত লোকটার মুখের উপর মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। আর উৎসুক গ্রামবাসী তাকে ঘিরে জটলা করে আছে। চেয়ারম্যানের নিজস্ব লোকদের কাছ থেকে সব শুনে, চেয়ারম্যান রেগে, তেড়ে যায় লোকটার দিকে, 'শুয়োরের বাচ্চা, মামু বাড়ির আবদার পেয়েছে?' বলে, কষে ঘুমন্ত লোকটাকে একটা লাথি মারে। এক লাথিতেই ধড়-মড়িয়ে উঠে বসে লোকটা,

BanglaBook.org

আবার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। চেয়ারম্যানের অগ্নিদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু একটা হাসি দেয়। লোকটার হাসির সাথে সাথেই চেয়ারম্যানের মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে, ব্যথায় ককিয়ে ওঠে, চিৎকার করে বলে, 'ওরে আমার ডান পা-টা ছিঁড়ে যাচ্ছেরে, আমাকে ধর।'

চেয়ারম্যানের চোখে-মুখে পানি ছিটালে কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু ব্যথায় ডান পা নাড়াতে পারেন না। তাঁর ডান পায়ের পেশি খিঁচ দিয়েছে। পুরানো ঘি দিয়ে মালিশ করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু পায়ে হাত ছোঁয়ানোই যাচ্ছে না। ছোঁয়া লাগলেই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠছেন।

চেয়ারম্যানের নির্দেশে কাছারি ঘরের বারান্দার সেই অপরিচিত লোককে পেট পুরে ভাত খাওয়ানো হয়। খেয়ে-দেয়ে লোকটা বারান্দার ওয়ালে পিঠ ঠেসে, চোখ বুজে বসে, বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াতে থাকে।

শেষ রাতের দিকে চেয়ারম্যানের পায়ের পেশির খিঁচ সেরে যায়। এর পর দুই তিন দিন অচেনা লোকটা চেয়ারম্যানের বারান্দায় ঘুম, জেগে উঠা, খাওয়া, বিড়বিড় করা, এভাবেই কাটিয়ে দেয়।

চেয়ারম্যান সহ গ্রামের সব মানুষের মনেই একটা ভাবনার সৃষ্টি হয়, তা হলো আগন্তুক লোকটার মধ্যে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। চেয়ারম্যান তাঁর আম বাগানের পাহারাদারের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটায় লোকটার থাকার ব্যবস্থা করেন। এই কুঁড়ে ঘরটায় আগে জাকির নামে এক লোক ছিল। সে এই আম বাগানের চৌকিদার ছিল। তার বয়স ছিল ২৪/২৫। হঠাৎ একদিন চৌকিদারের কাজ ছেড়ে ঢাকা চলে যায় সে।

কিছুদিনের মধ্যে আগন্তুক অপরিচিত লোকটা আগের চৌকিদার জাকিরের স্থান দখল করে নেয়। জাকিরের মত সে-ও পাহারাদারির কাজের সাথে বাগানের পরিচর্যার কাজেও হাত লাগায়। তবে তার খেয়াল খুশি মত। মাঝে মাঝে একনাগাড়ে তিন চার দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়, আবার সারা দিন-রাত কাজ করে। বাগানেরও ব্যাপক উন্নতি হয়। আগের চেয়ে আমের ফলন অনেক গুণ বেড়ে যায়। তবে তার চরিত্রটা সেই প্রথম দিনের মতই থাকে। কারও সাথেই এখন পর্যন্ত তার কোনও কথা হয়নি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আগের মতই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। গ্রামের

BanglaBook.org

সবাই বুঝে যায়, সে বাক শক্তিহীন, বোবা। চেয়ারম্যান লোকটার উপর খুব সন্তুষ্ট কারণ লোকটা আসার পর তাঁর বাগান থেকে আয় অনেক বেড়েছে এ ছাড়া বাগানের আম চুরির ঘটনাও একেবারেই ঘটছে না। চেয়ারম্যান খুশি হয়ে লোকটার একটা নামও রেখে দেয়। এরপর লোকটা গ্রামের মানুষের কাছে আবু নামেই পরিচিত হয়। তবে যেকোন কারণেই গ্রামের মানুষ তাকে শুধু আবু বলে ডাকে না, সম্মানসূচক মিয়া যোগ করে আবু মিয়া বলে ডাকে।

গ্রামের লোকজন চেয়ারম্যানের দৃষ্টির বাইরেও রহস্যময় কিছু দেখতে পায় লোকটার মাঝে, ছোট-খাট আকৃতির, বড় বড় চুল দাড়িওয়ালা বোবা আবুর মাঝে কী এক রহস্য যেন লুকিয়ে আছে। লোকটা হিন্দু না মুসলমান তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে যেদিন থেকে আম বাগানের পাহারাদারির দায়িত্ব নেয় সেইদিন থেকে গ্রামের কোন ছেলে ছোকরা আম চুরি করে নিচ্ছে না, বা বলা যায় চুরি করতে পারছে না। কেউ আম চুরির উদ্দেশ্যে গাছে উঠলেই গাছ থেকে পড়ে হাত বা পা ভেঙে যাচ্ছে এমন কী কেউ যদি নীচে পড়ে থাকা আমও নিয়ে খাচ্ছে তো ডাইরিয়া, বমি হয়ে যা-তা অবস্থা হয়। এখন পর্যন্ত যে সব ছেলে আম চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছে তারা সবাই একটাই কথা বলে, 'তাকে কেউ ঠেলে গাছ থেকে ফেলে দিয়েছে।' কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে গাছ থেকে পড়ার সময় কেউ তাদের আশপাশে ছিল না। তাই কোন ছেলে ছোকরাই এখন আর আম বাগানের ধারে-কাছেও আম চুরির উদ্দেশ্যে আসে না। তার সাথে আরও একটা বিষয় লক্ষ করল গ্রামবাসী, আম বাগানে কোন পাখি বা বাদুড়ও আসে না। আগে অনেক আম পাখি ও বাদুড়ের উপাদেয় খাদ্য হত, কিন্তু আবু আসার পর তা হচ্ছে না। আবুকে নিয়ে আরও একটা কথা শোনা যায়, রাতের বেলা সে কখনও আলো জ্বালায় না, অন্ধকারে বসে থাকে। চেয়ারম্যান বাড়ির পুরানো কাজের লোক ধলা মিয়া প্রতিদিন বাড়ি সংলগ্ন আম বাগানের কুঁড়েঘরে আবুর খাবার দাবার দিয়ে আসে। একদিন রাতের খাবার দিয়ে আসার পর ধলা মিয়ার মনে পড়ে তার হাতের টর্চ আবু মিয়ার ঘরে ফেলে এসেছে। সে আবার টর্চ আনতে যায়। গিয়ে দেখে আবু তার স্বভাবসুলভ অন্ধকারে বসে আছে। সে তার টর্চটা খুঁজে পেয়ে আবুর গায়ে

BanglaBook.org

আলো ফেলে দেখতে পায় আবু অন্ধকারেই ভাত খাচ্ছে নির্বিকার ভঙ্গিতে। এরপর থেকে গ্রামের মানুষের ধারণা জন্মে আবু অন্ধকারেও দেখতে পায়।

এসব কথায় চেয়ারম্যান আমল দেন না। আবু মিয়াকে পেয়ে তিনি মহাখুশি। কারণ আবু মিয়া আসার পর থেকে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। চেয়ারম্যানের দুই মেয়ে। মিনা ও দিনা। মেয়েদের মা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। বড় মেয়ে মিনার খুব ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। চেয়ারম্যান মনে করেন আবু তাঁর বাড়িতে আছে বলেই তাঁর মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে।

চেয়ারম্যানের এখন সুদিন। বড় মেয়ের প্রথম বাচ্চা হবে। সে এসেছে বাবার বাড়িতে। গ্রামের একটা নিয়ম হচ্ছে মেয়েদের প্রথম বাচ্চা বাপের বাড়িতে জন্ম দিতে হয়। এরই মধ্যে একদিন ঘটে যায় অঘটন। শেষ বিকেলে দুই বোন মিনা ও দিনা বাগানের দিকটায় একটু পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। দিনা মিনার চেয়ে একটু দূরে ছিল, হঠাৎ মিনা বিকট চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। দিনার ডাকাডাকিতে বাড়ি থেকে ধলামিয়া ও কুসুমের মা ছুটে আসে। তারা মিনাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যায়। মিনা ঘোরের মধ্যে বিলাপ করতে থাকে, 'কালো–কালো লম্বা হাত, লাল জিহবা, রক্তচোষা, আমার সমস্ত রক্ত চুষে নেবে।'

মাঝ রাতে মিনার পেটের চার মাসের বাচ্চাটা গর্ভপাত হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় রক্ত ক্ষরণ। ভোরবেলা নিয়ে যাওয়া হয় সবুজছাতা ক্লিনিকে, সেখান থেকে বরিশাল সদর হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, মেয়েটা অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে মারা যায়।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ে দিনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। একা-একা হাসে, একা-একা কাঁদে, ভয় পেয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়, আবার কখনও আপন মনে উল্টা-পাল্টা বকতে থাকে, 'কে বলেছে আমার মিনা আপু মারা গিয়েছে, মিনা আপু আছে, আম বাগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে, বাগানের মধ্যে থেকে রাতের বেলা আমি তার হাসির শব্দ শুনতে পাই।' এক সময় তার পাগলামি আরও বেড়ে যায়; তাকে একটা কামরার মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়। বন্ধ কামরার মধ্য থেকে দিনা জানালার সামনে যাকে দেখে তাকেই বলে, 'মিনা আপু বলেছে, সব

BanglaBook.org

শেষ হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, অভিশাপ লেগেছে, অভিশাপ!...'

দিনা অসুস্থ বিকারগ্রস্ত, তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে না নেওয়ারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, কোন কোন গ্রামবাসী দিনার সাথে একমত। তারা বলে, অনেক রাতে আম বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, আবু মিয়ার পাহারাদারির ছোট্ট কুঁড়েঘরটা যথারীতি অন্ধকারে ডুবে থাকে এবং তার মধ্য থেকে, ফিসফিসে মেয়েলি কণ্ঠ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সাহসী অনেকে আবার টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আবু মিয়ার কুঁড়েঘরে গিয়ে দেখতে পায়, আবু মিয়া একা আলোহীন অন্ধকারের মধ্যে স্টোভে চা বানিয়ে খাচ্ছে, আশপাশে কেউ নেই। আগের পাহারাদার জাকিরও এই স্টোভটায় চা বানিয়ে খেত।'

খালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর আরও নিচু করে বলে, 'অনেকে বলে, চেয়ারম্যানের বড় মেয়ে মিনার সাথে পাহারাদার জাকিরের কোন সম্পর্ক ছিল। এমনকী মিনা জাকিরের সাথে পালাতে যাচ্ছিল। চেয়ারম্যান খালেক সিকদার তা টের পেয়ে, তাঁর লোকজন দিয়ে জাকিরকে খুন করিয়ে লাশ গুম করে ফেলে। আর সবার কাছে বলা হয় জাকির ঢাকা চলে গিয়েছে। পাশের গ্রামে জাকিরের বাড়ি। জাকিরের বিধবা মা গত তিন বছর ধরে জাকিরের অপেক্ষা করে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। চেয়ারম্যান বাড়ির লোকজনের মুখে শুনেছে তার ছেলে হঠাৎ একদিন ঢাকা চলে গিয়েছে। সেই থেকে ছেলের আর কোন খোঁজ পায়নি সে।'

BanglaBook.org

তিন

চিরাচরিত নিয়মমত, খালার বাড়িতেও আমার ঘুম ভাঙল সকাল ১০টায়। গত রাতে খালার কাছে আবু মিয়ার গল্প শুনতে-শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। খালার গল্প শেষ হয় না, গল্পে কখনও প্রধান চরিত্র আবু মিয়া, কখনও জাকির, কখনও বা চেয়ারম্যান নিজেই। গ্রামের মানুষের নানা জনের নানা সন্দেহ। কেউ বলে জাকিরের অতৃপ্ত আত্মাই প্রতিশোধ নিতে

আবু মিয়া রূপে এসেছে। আবার কেউ বলে আবু মিয়া সাধারণ কেউ নয়, জিন বা পিশাচ জাতীয় কিছু। পশু-পাখি, ইতর প্রাণী বুঝতে পারে, আর বুঝতে পারে শিশুরা, তাই এদের কেউ আবু মিয়ার কাছাকাছি ঘেঁষে না। আবার অনেকে এমনও বলে, আবু মিয়া রোদের মধ্যে হেঁটে গেলেও তার গায়ে রোদের আলো পড়ে না, আবার বৃষ্টির মাঝেও দেখা যায় তার চলার পথের বৃষ্টি থেমে যায়।

মনে মনে ভাবি অদ্ভুত সব কথা, গ্রামের মানুষের বাড়িয়ে বলার স্বভাব এখনও রয়ে গিয়েছে। স্বচক্ষে একবার আবু মিয়াকে দেখতেই হবে।

খালা আমার জন্য ধোঁয়া ওঠা গরম ভাপা পিঠা, ডিমের অমলেট, আর চা নিয়ে এল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'তুই ঘরের মধ্যে বসে আছিস কেন! বড় পুকুরটায় জাল ফেলানো হয়েছে, বড় একটা আইড় মাছ ধরা পড়েছে!'

খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই! বাড়ির সবাই ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে। কেমন একটা উৎসব-উৎসব ভাব চারদিকে। উঠানের পুব পাশের কাঁঠাল গাছের সাথে বড় সাইজের কালো একটা জবাই দেয়া ছাগল ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়াচ্ছে একজন। পাশেই আমার খালুজান উচ্চৈঃস্বরে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন। আমাকে দেখে খালুজান বলেন, 'আফজাল, এদিকে এসো, দেখে যাও।'

আমি গিয়ে খালুজানের পাশে দাঁড়ালাম। খালুজান উৎসাহিত কণ্ঠে বলেন, 'এই খাসিটা তোমার খালা অনেক দিন ধরে পুষেছে, তোমার আসার অপেক্ষা করে।'

আমি মৃদু হাসি দিলাম। খালুজান আবার বলেন, 'দেখেছ খাসিটার গায়ে কী পরিমাণে চর্বি হয়েছে।'

মনে মনে ভাবি ঘাস খাওয়া প্রাণীটার গায়েই এত চর্বি আর আমরা যারা এই চর্বিযুক্ত মাংস খাব, আমাদের অবস্থা কী হবে। এরই মধ্যে দেখি আমার খালাতো ভাই কাদামাখা অবস্থায় দৌড়ে এসে আমাকে বলে, 'ভাইয়া, পুকুর পাড়ে চলো, বড় বড় মাছ ধরা পড়ছে।'

দুপুরে জম্পেশ খাওয়া হলো। খাওয়া শেষে একটু বিশ্রাম নিতেই দেখি, গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে। শীতের দিনে খুব দ্রুতই বিকেল নেমে আসে। আগে থেকেই খালাকে বলে রেখেছি, বিকেল বেলা রিয়াজকে নিয়ে

BanglaBook.org

চেয়ারম্যান বাড়ি যাব, আবু মিয়ার সাথে দেখা করার জন্য। খালা শর্ত দিয়েছে আবু মিয়াকে যেন দূর থেকে দেখেই চলে আসি, কাছে গিয়ে খাতির জমানোর চেষ্টা যেন না করি। আর চেয়ারম্যানের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় খালা দোয়া-দরূদ পড়ে আমার আর রিয়াজের মাথায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছে।

রিয়াজের সাথে গুজুর গুজুর গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম চেয়ারম্যান বাড়ি। বাড়ি থেকে আরও কিছুটা দূরে আম বাগান। আম বাগানের মধ্য দিয়ে আমরা দুই ভাই শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ তুলে হেঁটে চলছি। বাগানে ঢোকার পর রিয়াজ একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে। এর আগে রিয়াজের সাথে আমার ভালই গল্প চলছিল। বেশিরভাগই ক্রিকেট সংক্রান্ত। ক্রিকেট সম্পর্কে নতুন কিছু জানলাম রিয়াজের কাছ থেকে। রিয়াজের ধারণা ভাল ক্রিকেটার হতে হলে আগে ভাল চুইংগাম চিবুতে শিখতে হবে। এ ছাড়া আরও কিছু নতুন খবর জানলাম, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের আশরাফুলকে নাকি জাদু টোনা করা হয়েছে, যাতে সে ভাল ক্রিকেট না খেলতে পারে। তবে কে তাকে জাদু টোনা করেছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সন্দেহের তালিকায় ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধনী সবার প্রথমে। আরও একটা ব্যাপার জানলাম, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে সকালে নাস্তা দেওয়া হয় শুধু এক মগ রং চা আর দুটো টোস্ট বিস্কিট। তাই তো ওরা সবাই অমন রোগা-পাতলা।

আম বাগানের ভিতর কুঁড়েঘরটার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। দূর থেকেই দেখছি একটা লোক কুঁড়েঘরের সামনে বসে কী যেন করছে। রিয়াজ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওই তো আবু মিয়া।' আবু মিয়ার কাছে পৌঁছে গেলাম। সে সম্ভবত কোদালের হাতল বানাচ্ছে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। ছোট-খাট একটা লোক, বড়-বড় চুল, দাড়ি, চোখ দুটোও ভাসা-ভাসা, চেহারায় ভালমানুষী ভাব। এমন লোককে দেখে ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আবু মিয়া ঘর থেকে মাদুর এনে বিছিয়ে দিল। তার ভাব দেখে বুঝলাম বসতে বলছে। আমি মাদুরের উপর আসন করে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে রিয়াজও বসল। আবু মিয়া খুশি মনে আবার ঘরের

BanglaBook.org

ভিতরে গেল। একটু পরে এক বাটি আমের আচার নিয়ে এসে আমার হাতে দিল। সাথে দুটো ছোট চামচও রয়েছে। বুঝলাম আমাকে আর রিয়াজকে খেতে বলছে। আমি রিয়াজকে চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম খাবে কি না। রিয়াজ বুঝিয়ে দিল সে খাবে না। আমি এক চামচ আচার মুখে দিলাম। অপূর্ব! এত সুস্বাদু আচার এর আগে খেয়েছি কি না মনে করতে পারলাম না। আবু মিয়ার দিকে তাকালাম, চোখে চোখ পড়ল। তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ইচ্ছে হলো তাঁকে কিছু প্রশ্ন করি, কে আপনি? আপনার ছেলে-মেয়ে বা আপনজন কেউ কি নেই? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল আবু মিয়া কথা বলতে পারে না। আবার ভাবলাম, যারা কথা বলতে পারে না তারা ইশারায় অনেক কিছু বলে, আবু মিয়া কি ইশারায়ও কিছু বলবে না। জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, আপনি কে? আবু মিয়ার কোন ভাবান্তর হলো না, ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ আমি কেঁপে উঠলাম, আবু মিয়ার সহজ সরল চোখ দুটোর মাঝে কী এক গভীর শূন্যতা, চোখ সরিয়ে নিলাম।

শেষ বিকেলের সোনালি আলো খুব সামান্যই প্রবেশ করছে আম বাগানে। কেমন একটা আলো আঁধারির মেলা। আমরা দু'ভাই ফিরে চলছি। আমার হাতে আচার ভরা একটা বয়াম। আসার আগে আবু মিয়া হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে আসার পর দেখি একটা মেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে এদিকে আসছে। পিছনে এক বয়স্ক লোক আর এক মহিলাও ছুটে আসছে। রিয়াজ বলল, 'এই তো চেয়ারম্যান কাকুর ছোট মেয়ে।'

মেয়েটা আমাদের সামনে এসে থ হয়ে থেমে গেল। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হয়তো আমি অপরিচিত বলে। কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম! অদ্ভুত রকমের সুন্দর মেয়েটা। উস্কোখুস্কো, এলোমেলো একরাশ চুলের মাঝে মায়া কাড়া দুটি চোখ, ঠোঁট দুটো যেন শিশিরে ভেজা ফুলের পাপড়ির মত। মুহূর্তের জন্য মনে হলো এমন একটা মেয়ের হাত ধরে যদি গোধূলি বেলার এই আলো আঁধারের মাঝে হেঁটে বেড়াতে পারতাম! পিছনের বয়স্ক লোকটি আর মহিলা এসে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। তারা দুজনে মেয়েটাকে দুদিক দিয়ে ধরে জোর

BanglaBook.org

করে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা বিলাপের মত করে বলছে, 'আমি থাকব না এই অভিশপ্ত নরকে...'

পরের দিন আমি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। আসার আগে খালা কান্না জুড়ে দিল, 'এত অল্প সময় হাতে নিয়ে এসেছিলি কেন? ভালমন্দ একটু খাওয়াব, তা আর হলো কই। ও পাড়ার সামসু দুই এক দিনের মধ্যে অতিথি পাখি দিয়ে যাবে।'

আমি খালাকে আশ্বস্ত করলাম আবার এসে বেশিদিন থাকব। আর বললাম, অতিথি পাখি তোমরাও খেয়ো না, কারণ অতিথি পাখি শিকার করা এমনিতেই অন্যায়, তার উপর বর্তমানে অতিথি পাখি বার্ড ফ্লুর জীবাণু বহন করে।

পরিশিষ্ট

এ বছরও খালার চিঠি এসেছে। তাতে প্রলুব্ধ করার মত অনেক বিষয় রয়েছে। ভাবছি কাজের ব্যস্ততা রেখে কয়েক দিনের জন্য ঘুরে আসব নাকি। বন্ধু সাইফুল্লার সাথেও সেদিন দেখা হলো। আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'দোস্ত, শেষ পর্যন্ত একটা টুনটুনি শিকার করলাম।' আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি টুনটুনি শিকার করার মধ্যে এত অহংকার কোথায়। পরে বন্ধু আমাকে বোঝাল, সে টেনে পড়া একটা মেয়ের সঙ্গে এনগেজমেন্ট করেছে। পৌষ মাসের ৮ তারিখে তার বিয়ে, কারণ সেদিন বছরের সবচেয়ে বড় রাত।

খালার লেখা এবছরের চিঠিতেও আবু মিয়া কিছু স্থান দখল করে রেখেছে। লেখা রয়েছে, তুই চলে যাওয়ার কিছু দিন পর কী এক ব্যাপারে ধলা মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে আবু মিয়ার গালে কষে একটা চড় মারে। চড় খাওয়ার পর আবু মিয়া যথারীতি ভাবলেশহীন ভাবে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সেই রাতেই ধলা মিয়া রক্ত বমি করতে করতে মারা যায়। ধলা মিয়ার মৃত্যুতে গ্রামের সব লোক আবু মিয়ার উপর প্রচণ্ড খেপে যায়। অবশেষে চেয়ারম্যান ও গ্রামের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন আবু মিয়াকে আর এ গ্রামে রাখা যাবে না। আবু মিয়ার হাত-পা বেঁধে শহরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটে আবু মিয়া যাওয়ার পর, চেয়ারম্যানের আম

BanglaBook.org

বাগানের সমস্ত গাছ হলুদ হয়ে যেতে শুরু করে। একে-একে সব গাছের হলুদ পাতা ঝরে পড়ে। শুকিয়ে যাওয়া, পাতাহীন গাছগুলোকে মনে হয় গাছের কঙ্কাল। বাগানের সমস্ত গাছ এভাবে মরে যাওয়ায় হয়তো চেয়ারম্যানের মনটাও মরে যায়। চেয়ারম্যান দিনে দিনে অসুস্থ হতে থাকেন। শেষ দিকে চেয়ারম্যান কেমন ঘোরের মধ্যে চলে যান, কাউকে চিনতে পারেন না। যাকে দেখেন তাঁকেই বলেন, 'আমার আবু মিয়া আসছে!'

চেয়ারম্যানের মৃত্যুর পর, তাঁর ছোট মেয়ে দিনাকে, তাঁর আপন বড় ভাই মালেক সিকদার, যে ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা, সে তাঁর কাছে নিয়ে যায়। দিনার বড় চাচা দিনার ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। শুনেছি মেয়েটা নাকি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

এদিকে চেয়ারম্যানের খালি বাড়ি, মরা আম বাগান প্রতি মুহূর্তে যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে। আম বাগানের শুকনো, প্রাণহীন গাছগুলোকে মানুষ আগের চেয়ে আরও বেশি ভয় পায়।

কয়েক মাস আগে শিশির ভেজা এক ভোরে গ্রামবাসী আবার হতবাক হয়ে যায়। আবু মিয়া ফিরে এসেছে। আম বাগানের কুঁড়েঘরটায় সে আগের মত আশ্রয় নিয়েছে। চরম উৎসাহ নিয়ে আম বাগানের পরিচর্যার কাজে নেমে পড়ে। মরা গাছগুলোর গোড়ার মাটি কুপিয়ে, নিয়মিতভাবে পানি দিতে শুরু করে।

কেউ কেউ বলছে শুকনো গাছগুলোতে ধীরে ধীরে কচি পাতার মুকুল দেখা যাচ্ছে।

খালার চিঠিটা যতবার পড়ি ততই সেখানে যাওয়ার জন্য মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। রহস্যঘেরা আবু মিয়াকেও আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই রহস্যকে ভেদ করতে।

আবু মিয়া আমাকে এক বয়াম আচার দিয়েছিল, এই আচারের মাঝেও রহস্য আছে। আমি যেদিন এই আচার খাই সেদিন রাতেই একটা স্বপ্ন দেখি। প্রতিবার একই স্বপ্ন। স্বপ্নটা এমন, আমি চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ে দিনার হাত ধরে আম বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে চলছি। দুজনার পিছনে অশুভ কিছু একটা তাড়া করছে। প্রাণপণে ছুটতে চাইছি দুজন। কিন্তু পা

BanglaBook.org

যেন এগোচ্ছেই না, আর বাগানটাও যেন আরও বড় হয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করে যখন বাগানের শেষ প্রান্তে চলে যাই তখন আমাদের সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায় আবু মিয়া। আবু মিয়ার চোখ দুটিতে তখন আর সহজ সরল ভাবটা নেই, চোখ জুড়ে থাকে শুধু অশুভ ভয়ংকর চাহনি। চোখ দিয়ে যেন আমাদের দুজনকে ভস্মীভূত করে ফেলবে। এক পর্যায়ে ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এত উত্তেজনা, এত ভয়ের এই স্বপ্ন, তার পরেও এই স্বপ্ন আমার বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, কারণ চেয়ারম্যানের মেয়ে দিনার হাতের স্পর্শ আমার সমস্ত অনুভূতিতে ছোঁয়া দিয়ে যায়। সারাদিনেও ভুলতে পারি না সেই স্পর্শ। কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে, মাঝে-মাঝেই হারিয়ে যাই সেই স্বপ্নের মাঝে।

মাঝে মাঝে ভাবি, জীবনের এই মহোৎসবের নিমন্ত্রণে এসে আমরা কত বিচিত্র স্বাদে, কত বিচিত্র রূপে, কত অভাবনীয়, কত অনির্বচনীয় চেতনায়, বিস্ময়ে, কতবার আত্মহারা হয়ে উঠি, এর কি শেষ আছে? প্রকৃতি কিছু-কিছু রহস্য নিজেই রহস্য দিয়ে ঘিরে রাখে, সে রহস্য কী করে মানুষ ভেদ করবে। আবু মিয়াও হয়তো তেমনই এক রহস্য, যে রহস্যের জট কোনদিনই খুলবে না।

পাঠক–পাঠিকা, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ বছরও আমি ছোট খালার বাড়ি বেড়াতে যাব। রহস্য ভেদ করতে না পারি, মৃত আমগাছ যে আবার নতুন করে সজীব হয়ে উঠছে, এই অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্য যাব। আপনারা চাইলে যে কেউ আমার সঙ্গে আমার ছোট খালার বাড়ি বেড়াতে যেতে পারেন। কারণ আমার বন্ধু সাইফুল্লাহ এবারও আমার সঙ্গে যাবে না। সে ব্যস্ত, তাঁর হবু স্ত্রীকে নিয়ে কবিতা লেখায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভয়ানক সমাপ্তি

ছোট খালার বাড়িতে তিন দিন কেটে গেল।

গতবার কম সময় হাতে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম বলে, খালার অভিযোগ-অনুযোগ আর নিজের মনের অস্বস্তি দূর করতে এবার পনেরো দিনের লম্বা ছুটি নিয়ে চলে এলাম। গত বছর খালার এখানে চার দিন ছিলাম। কী যে আনন্দের মাঝে কেটেছিল সেই চারটা দিন–খেজুরের কাঁচা রস খাওয়া, গরুর গরম ঝাল মাংস দিয়ে শীতের রাতে চুলোর পাশে বসে গরম-গরম চালের আটার রুটি খাওয়া, ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাটি সাপটা পিঠা, পুলি পিঠা, চ্যাপা পিঠা, চুই পিঠা, মালপোয়া, খেজুরের রসের পায়েশ। খাওয়া-দাওয়ার চ্যাপ্টার বাদ-ই দিলাম–খালা বাড়ির দিঘি আকৃতির পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা, গ্রামের দুরন্ত কিশোরদের সাথে ডাণ্ডা-গুলি খেলা, গুলতি দিয়ে পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে সারা গ্রাম চষে বেড়ানো, জমিদার বাড়ির দিঘির পাড়ের দূর্বা ঘাসের উপরে বসে ঝিমধরা নির্জন দুপুরে গল্পের বই পড়া, রাত জেগে খালার কাছে আবু মিয়া নামে গ্রামের রহস্যময় এক লোকের গল্প শোনা, শেষ বিকেলে চেয়ারম্যান বাড়িতে সেই রহস্যময় আবু মিয়াকে দেখতে গিয়ে রূপবতী এক নারীর সাথে দেখা হওয়া। সব মিলিয়ে বলতে হয়–গত বছরের চার দিনের স্মৃতি এবারে সারা বছর আমাকে তাড়া দিয়েছে, খালার এখানে লম্বা ছুটি নিয়ে বেড়াতে আসার।

এবারে এখন পর্যন্ত তেমন কোনও রোমাঞ্চকর কিছু করা হয়নি। তিনটা দিন কেটে গেল ঘরে বসে গল্পের বই পড়েই। সেবা'র অনেকগুলো নতুন বই নিয়ে এসেছি সাথে করে। শুধু সেবা'র বই-ই এনেছি। সেবা প্রকাশনী সম্পর্কে কয়েকটা গুণগান না করলেই। তা হলো–কম দাম। সহজে বহনযোগ্য। বেড়াতে যাওয়ার পথে অনেকগুলো বই বহন করা যায়। হেনরি

BanglaBook.org

রাইডার হ্যাগার্ড, স্যর আর্থার কোনান ডয়েল, ব্রাম স্টোকার, জুলভার্ন, এরিক মারিয়া রেমার্ক, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, মার্ক টোয়েন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, জ্যাক লণ্ডন, রাফায়েল সাবাতিনি–এদের মত অসংখ্য বিশ্ব সাহিত্যের বিখ্যাত সব লেখকদের বই প্রকাশ করা, এবং এই বইগুলো সহজ-সাবলীল ভাষায় অনুবাদ হওয়া কম কথা নয়। মোট কথা–বিশ্ব সাহিত্যের নতুন-নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে সেবা প্রকাশনী।

খালার বাড়িতে বেড়াতে আসার আগে এবারও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাইফুল্লার খোঁজ নিয়েছিলাম। গ্রামে বেড়াতে আসার ব্যাপারে বরাবরই সাইফুল্লার বেশ আগ্রহ ছিল। গত বছর তার বিয়ের বছর ছিল বলে আসেনি। এবার হয়তো আসবে, এই ভেবে তার খোঁজ নিতে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সাইফুল্লাহ খালি গায়ে, পেটের উপরে পানি ভর্তি কাঁসার বাটি চেপে শুয়ে রয়েছে। ওই অদ্ভুত অবস্থায় তাকে শুয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে তোর?'

'আর বলিস না, দোস্ত, পেটের ভিতর কামড়াচ্ছে।'

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'কীসে কামড়াচ্ছে?'

'ডায়রিয়া হয়েছে। দুই দিন ধরে লোটা প্যারেডের উপরই আছি।'

'কীভাবে এমন ভয়াবহ ডায়রিয়া বাধালি?'

'শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে।'

'এর আগে তো কখনও শুনিনি, শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে লোকে ডায়রিয়ায় ভোগে! কী বলছিস আবোল-তাবোল!'

'শ্বশুর বাড়ি যেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেদিনই ওই বাড়ির একটা গাভী বাচ্চা প্রসব করে। আমার অফিসের পিয়ন আজিজের কাছে শুনেছি–গাভীর বাচ্চা হওয়ার পর প্রথম যে শাল দুধ হয় সেটা কাঁচা অবস্থায় খেলে, গায়ে সুপারম্যানের মত শক্তি পাওয়া যায়। বউকে ধরলাম তাদের সদ্য প্রসবকৃত গাভীটার শাল দুধ খাওয়ানোর জন্যে। প্রথমে বউ রাজি হতে চায়নি, পরে আমার পীড়াপীড়ি দেখে শাল দুধ এনে খেতে দিল। খাওয়ার পর এই অবস্থা। ভেবে রেখেছি সুস্থ হওয়ার পর প্রথমে আইজ্যা হারামজাদার ঘাড় মটকাব। ও মা গো, আবার পেটের ভিতর কামড়াচ্ছে...'

BanglaBook.org

'তা হলে তুই শাল দুধ খেয়ে সুপারম্যান না হলেও সুপার হাগুম্যান হয়েছিস, কী বলিস।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বন্ধু-পত্নী চা-নাস্তা নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ট্রে থেকে পাকা পেঁপের টুকরো ভরা দুটো প্লেট যথাক্রমে আমার এবং সাইফুল্লার হাতে দিতে-দিতে বলল, 'আফজাল ভাই, আপনার বন্ধুকে একটু বোঝান–বয়স হয়েছে, এখনও যদি ছোট ছেলে-পুলেদের মত উদ্ভট সব কাজ করে বেড়ায়!'

আমি কাঁটা চামচ দিয়ে পেঁপের টুকরো মুখে পুরে চিবুতে-চিবুতে বললাম, 'ভাবি, ও আর কী-কী উদ্ভট কাজ করে?'

'সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে, বাতির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। জিজ্ঞেস করলে বলে–"আমার পোষা টিকটিকি জোড়া খাবার খাচ্ছে।" ভাই, কোনওদিন শুনেছেন কেউ টিকটিকি পোষে! আজকাল আবার বলছে, "টিকটিকির পুষ্টিকর খাদ্য"–এই শিরোনামে বই লিখবে। সেই বইতে, কোন্ পোকা থেকে কী ধরনের পুষ্টি পাওয়া যায় তার উপর গবেষণামূলক লেখা থাকবে। প্রয়োজনে নিজে পোকা খেয়ে, পোকার পুষ্টিমান সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।'

আমি আড়চোখে সাইফুল্লার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে পেঁপের প্লেট হাতে নিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বসে আছে। চড়া গলায় শাসন করার ভঙ্গিতে বললাম, 'কীরে, পেঁপে খাচ্ছিস না কেন? পেঁপে তো পেটের জন্যে খুব ভাল।'

'নারে, দোস্ত, কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। যা-ই খাই, কেমন যেন ঘাস-ঘাস লাগে।'

'ঘাস-ঘাস লাগে বুঝলি কী করে? তুই কি আগে কখনও ঘাস খেয়েছিস?'

যাই হোক, সাইফুল্লাকে এবারও খালার বাড়িতে বেড়াতে আনা গেল না। সেদিন তার স্ত্রীর কাছ থেকে তার আরও অনেক কীর্তিকলাপ শুনলাম। ওর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'দোস্ত, টিকটিকিরও কী ডায়রিয়া হয় নাকি, এখন থেকে সেই ব্যাপারটা লক্ষ করতে হবে।'

BanglaBook.org

সাইফুল্লার ডায়রিয়া নিয়ে মনে-মনে অনেক হাসাহাসি করেছি। আশ্চর্য ব্যাপার, খালা বাড়ি বেড়াতে এসে আমি নিজেও ডায়রিয়ায় পড়েছি। অবশ্য বিশেষ কোনও খাবার খেয়ে নয়। বিশেষ দৃশ্য দেখে। ঘটনাটা খুলেই বলি–

খালা বাড়ি আসতে হলে বাসে চড়ে নিমতলা নামে এক জায়গায় নামতে হয়। তারপর নিমতলা থেকে রিকশা-ভ্যানে চড়ে খালা বাড়ি পৌঁছাতে হয়। নিমতলা নামার পর টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম। প্রচণ্ড বেগ এসেছে। বাধ্য হয়ে একটা পাবলিক টয়লেটে ঢুকে পড়ি। কিন্তু সেই টয়লেটে তিন সেকেণ্ডও অবস্থান করতে পারিনি। টয়লেটের অবস্থা ভয়াবহ–প্যানের উপরে বিশেষ হলুদ দ্রব্য অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেই সাথে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। তবে বের হওয়ার আগে টয়লেটের দেয়ালে আর একটি দৃশ্য দেখলাম। একটি চিত্রকর্ম। ইটের টুকরো দিয়ে আঁকা ছবি। একটি তরুণী টয়লেটের প্যানের উপরে পাজামা নামিয়ে বসে রয়েছে। তরুণীর বব করা চুল, চোখে সানগ্লাস, কানে বড়-বড় দুল। অর্থাৎ এক দেখাতেই বোঝা যায়, চিত্রশিল্পী একটি শহুরে আধুনিকা তরুণীকে বোঝাচ্ছে। ছবির পাশে শিল্পীর মন্তব্য লেখা রয়েছে। মন্তব্য পড়ে আমি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা এবং দর্শনের প্রশংসা না করেই পারছি না। বলতেই হবে সে একটি কালজয়ী জীবনমুখি ছবি এঁকেছে।

মন্তব্যটা হচ্ছে: হে রূপসী ললনা, তুমি যতই অহংকারী, দেমাগী হও না কেন, এই ছোট্ট ঘরটায় তোমাকে এই অবস্থায়ই পাওয়া যাবে।

নিমতলার টয়লেটের নোঙরা প্যানের দৃশ্য দেখার পর থেকে অদ্ভুত ভাবে আমিও ডায়রিয়ায় ভুগছি। কিছু খেতে বসলেই ওই দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায় এবং যথারীতি পেট খারাপ হয়। মহাজাতকের 'জীবন বদলের চাবিকাঠি' গ্রন্থ থেকে অর্জন করা অটোসাজেশন দিই নিজেকে–আমি সুস্থ আছি, আমার কিছু হয়নি, আমি কোনও বিশেষ দৃশ্য দেখিনি। কোনও কাজ হয় না। অথচ মহাজাতকের 'কোয়ান্টাম মেথড' বইটির ধূমপান বর্জন অধ্যায়ের নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আজ আমি সফল। ধূমপানকে আজ চিরতরে বিদায় জানিয়েছি।

বৃহৎ বাদলপাড়া গ্রামের সেই রহস্য-মানব আবু মিয়া প্রসঙ্গে চলে

BanglaBook.org

আসি। চেয়ারম্যানের আম বাগানের পাহারাদার আবু মিয়া। গতবছরই তো আবু মিয়ার রহস্যময়তা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছিলাম। বাক শক্তিহীন আবু মিয়া ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝেও সবকিছু দেখতে পায়। রোদের ভিতর সে যখন হেঁটে যায় তখন তার ছায়া পড়ে না। বৃষ্টির মধ্যে ছাতাহীন হেঁটে যায়, কিন্তু তার গায়ে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে না। কারণ তার চলার পথের বৃষ্টি থেমে যায়। চেয়ারম্যানের আম বাগানের দায়িত্ব যেদিন থেকে সে নিয়েছে সেদিন থেকে আমের ফলন অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যায়। বাড়বেই বা না কেন–সে আম বাগানের কুঁড়ে ঘরে অবস্থান নেয়ার পর থেকে বাদুড়, পাখি কোনও কিছু আম বাগানের ধারে কাছে আসে না। এমনকী গ্রামের ছেলে-ছোকরাও আম চুরির উদ্দেশ্যে বাগানের ধারে-কাছেও পা ফেলে না। সবাই প্রচণ্ড ভয় পায় আবু মিয়াকে। অথচ তার চেহারায় সহজ-সরল আত্মভোলা ভাব। বেশ কয়েক বছর আগে চেয়ারম্যানের কাছারি ঘরের খোলা বারান্দায় অলৌকিকভাবে আবির্ভাব ঘটেছিল আবু মিয়ার। আজ পর্যন্ত কেউ তার পরিচয় জানতে পারেনি। সে কোত্থেকে এসেছে, কোথায় তার বাড়ি-ঘর কিছুই জানা যায়নি।

আবু মিয়া আসার পর থেকে চেয়ারম্যান বাড়িতে একটার পর একটা অঘটন ঘটতে শুরু করে। চেয়ারম্যানের বড় মেয়ে, বিবাহিতা মিনার গর্ভপাত হয়ে চেয়ারম্যান বাড়িতে মারা যায়। ছোট মেয়ে দিনা পাগল হয়ে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃত দিনা, আবু মিয়া সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা বলতে থাকে। বাড়ির অনেক দিনের পুরানো কাজের লোক ধলা মিয়া কী এক কারণে একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে আবু মিয়াকে চড় দিয়েছিল। চড় দেওয়ার পর মুহূর্তে ধলা মিয়া রক্ত বমি করতে-করতে মারা যায়। এই ঘটনায় চেয়ারম্যান খুবই খেপে যান। তাঁর নির্দেশে আবু মিয়ার হাত-পা বেঁধে শহরে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। অবশ্য গ্রামবাসীর অনেকে গোপনে বলেন, আবু মিয়াকে হাত-পা বেঁধে মাঝ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, আবু মিয়াকে শহরে ছেড়ে দেওয়া হোক আর মাঝ নদীতে ফেলা হোক, এই ঘটনার কিছুদিন পরই চেয়ারম্যানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে চেয়ারম্যান পাগলের মত সারাক্ষণ বিলাপ করতে থাকেন, 'আবু কই...আবুকে নিয়ে আয়...এই যন্ত্রণা থেকে আবুই মুক্তি দিতে পারবে।'

BanglaBook.org

চেয়ারম্যানের মৃত্যুর পর্ আম বাগানের সব আম গাছগুলোও পাতা ঝরে একই সাথে মরে যায়। হঠাৎ একদিন আম বাগানের কুঁড়ে ঘরে অলৌকিকভাবে আবার আবু মিয়ার আবির্ভাব ঘটে। আবু মিয়া আগের মত আম বাগানের পরিচর্যা শুরু করে। মরা গাছের কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে থাকা শুকনো খটখটে গাছগুলোর গোড়ার মাটি কুপিয়ে নিয়মিত ভাবে পানি দিতে শুরু করে। কিছু দিনের মধ্যেই আম বাগান আবার আগের মত সবুজ হয়ে ওঠে।

আবু মিয়ার আধ্যাত্মিক এত ক্ষমতার কথা শুনলেও নিজের চোখে আমি কিছুই দেখিনি। গতবছর খালাত ভাই রিয়াজকে সাথে নিয়ে আবু মিয়ার আম বাগানের কুঁড়ে ঘরে একদিন গিয়েছিলাম। খুব খাতির করেছিল আবু মিয়া আমাকে। আমের আচার খেতে দিয়েছিল। সেই আচার আমার খালাত ভাই ছুঁয়েও দেখেনি। আমি একাই খেয়েছিলাম। খুব তৃপ্তি সহকারেই খেয়েছিলাম। অসাধারণ স্বাদ ছিল সেই আচারের। তার কাছ থেকে ফেরার সময় বড় এক বয়াম আচার আমাকে দিয়েও দিয়েছিল। আমার কাছে আবু মিয়াকে সেদিন অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন রহস্যমানব বলে মোটেই মনে হয়নি। মনে হয়েছে গ্রামের সহজ সরল বাকশক্তিহীন মানুষ। তাকে দেখে আমি একটুও ভয় পাইনি। বরং তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ফেরার পথে অপ্রত্যাশিতভাবে চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ে, মস্তিষ্ক বিকৃত দিনার সাথে দেখা হয়েছিল। মেয়েটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর। উস্কোখুস্কো এলোমেলো এক রাশ চুলের মাঝে টানা-টানা মায়া কাড়া দুটো চোখ। শিশিরসিক্ত ফুলের পাপড়ির মত দুটো ঠোঁট। ভাসা-ভাসা সেই চোখ দুটি দিয়ে, স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আজও আমি ভুলতে পারিনি সেই চোখ দুটির কথা। কর্মস্থলে ইট আর কংক্রিটের শহরে আধুনিকা অনেক মেয়েকেই দেখেছি জীবনে, কিন্তু অমন নিষ্পাপ মিষ্টি মুখ আর একটিও দেখিনি। হয়তো সেই মিষ্টি মুখটা আর একবার দেখার সুপ্ত বাসনায় আর আবু মিয়া রহস্যের কূল-কিনারা খুঁজতেই আবার আমি ফিরে এসেছি বাদলপাড়া গ্রামে।

BanglaBook.org

দুই

একবারই ফাঁসি হয়, দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট, দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস, সলোমানের গুপ্তধন, মেন এগেইনস্ট দ্য সী, ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড এবং রানা সিরিজের গুপ্ত আততায়ী এক এবং দুই, বিপদে সোহানা, ড্রাগ লর্ড, চাই ঐশ্বর্য বইগুলো পড়ে শেষ করলাম। বুক শেলফ থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে সেবা'র অনেক বছর আগের অনুবাদ করা হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের–শী, রিটার্ন অভ শী, নেশা, অ্যালান কোয়াটারমেইন বের করলাম। এই বইগুলো বহুবার পড়া হয়েছে আমার। কিন্তু এর পরেও বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। 'শী' এবং 'রিটার্ন অভ শী' গল্পের আয়শাকে গল্প পড়ার সময় আফ্রিকার গহীন অরণ্যের মাঝে চোখের সামনে দেখতে পাই। আর 'নেশা' বইটা পড়ার সময় মনে হয় তাদুকি যদি পেতাম তা হলে জীবনে একবারের জন্যে হলেও তাদুকির নেশা করতাম।

বইগুলো ঝেড়ে-মুছে ধুলো পরিষ্কার করছি আর হাঁচি দিচ্ছি। বোধহয় অনেক দিন বইগুলোতে কেউ হাত লাগায়নি। এমন সময় ধোঁয়া ওঠা গরম ভাপা পিঠা হাতে খালা ঢুকল।

আমাকে বই ঝাড়তে দেখে বলে উঠল, 'তুই বই-এর নেশা এখনও ছাড়তে পারলি না? আসার পর থেকে সারাক্ষণই দেখছি বই হাতে বসে আছিস।'

'খালা, কোনও কিছুর নেশা কি খুব সহজে ছাড়া যায়? বই-এর নেশা হয়েছে বলেই আর অন্য কিছুর নেশা হয়নি। বই পড়া কি খারাপ?'

'বই তো অনেক পড়েছিস, এখন বই রেখে একটা বউ-এর জোগাড় কর।'

বউ-এর কথা শুনে লজ্জা পেয়ে হাসি দিলাম। শুনেছি আশি বছরের বুড়োও বিয়ের কথা শুনলে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসি দেয়। চোখে সুরমা লাগিয়ে, গায়ে আতর মেখে প্রস্তুতি নেয়। তা হলে আমি কেন বাদ যাব!

BanglaBook.org

ভাপা পিঠা দিয়ে সাজানো প্লেট আমার হাতে দিতে-দিতে খালা বলল, 'তোর প্রিয় ভাপা পিঠা। গরম-গরম খেয়ে নে।'

আমি পেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পেটের অবস্থা তো খুব একটা সুবিধে ঠেকছে না।'

'বিস্‌মিল্লাহ বলে খেয়ে নে। দেখবি কিচ্ছু হবে না। এক্কেবারে কুটুমিয়ার মত রেঁধেছি, খেয়ে খুব মজা পাবি।'

'কুটুমিয়া' হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের একটা উপন্যাসের নাম। এই গল্পে কুটুমিয়া নামে অদ্ভুত চরিত্রের একটা লোক থাকে। সে যা-ই রান্না করে প্রচণ্ড সুস্বাদু হয়। উপন্যাসটা খালাও পড়েছে। পড়ার পর থেকে খালা যে কোনও রান্না খুব ভাল হলে কুটুমিয়ার রান্নার সাথে তুলনা করে।

ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছি। খালা আমার সামনে বসে মমতা ভরা চোখে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। ছেলেবেলা থেকেই খালা আমাকে খুব ভালবাসে। মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় তার নিজের ছেলে রিয়াজের চেয়েও হয়তো আমাকে বেশি ভালবাসে।

হঠাৎ আবু মিয়ার কথা মনে পড়ল। আবু মিয়া সম্পর্কে খালা অনেক কিছু জানে। খালার কাছ থেকে আবু মিয়ার গল্প শোনা যাক।

'খালা, আবু মিয়ার সম্পর্কে তো কিছুই বললে না এবার। বর্তমানে আবু মিয়ার কী অবস্থা চলছে?'

আবু মিয়ার কথা শুনে মুহূর্তে খালার চেহারা পাল্টে গেল। কিছুটা ভীত দেখাচ্ছে তাকে। গলার স্বর নিচু করে, থমথমে গলায় বলল, 'না, আবু মিয়া সম্পর্কে তোকে কিছুই বলব না। তুই যে পাগলের পাগল, গল্প শুনে শেষে আবার চলে যাবি সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে। শুধু এই টুকুই বলি: লোকটা একটা জলজ্যান্ত পিশাচ। তার সম্পর্কে বেশি কৌতূহল দেখানোর দরকার নেই।'

আমার গলায় মিনতি ঝরে পড়ল। কিন্তু খালা কিছুতেই রাজি হতে চাইল না। শেষে উপায় না পেয়ে বললাম, 'তুমি যে ভাল-ভাল এত খাবার-দাবারের আয়োজন করো আমার জন্যে, আবু মিয়ার কাহিনি না বললে তা কিছুই খাব না।'

খালা অনেকক্ষণ ইতস্তত করে অস্বস্তি নিয়ে নিচু গলায় আবু মিয়ার গল্প

BanglaBook.org

শুরু করল–

'তুই তো আগেই শুনেছিস, চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ে দিনা পাগল হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার চাচা মেয়েটাকে ঢাকায় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উন্নত চিকিৎসা করান। শুনেছি মেয়েটা নাকি এখন পুরোপুরি সুস্থ। দিনাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার পর থেকে চেয়ারম্যানের অত বড় বাড়ি, আম বাগান সব কিছু জন-মানবহীন পোড়ো বাড়ির মত খাঁ-খাঁ করছিল। আম গাছগুলো মরে শুকনো খটখটে হয়ে দানবের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ একদিন আবু মিয়ার আবির্ভাব ঘটে। সে আগের মত মরা গাছগুলোর পরিচর্যা শুরু করে এবং গাছগুলো আবার সজীব হয়ে ওঠে। লোকজন ভয়ে চেয়ারম্যান বাড়ি এবং বাড়ি সংলগ্ন আম বাগানের ধারে-কাছেও যায় না। তবে দূর থেকে খোঁজ-খবর রাখে। লোকজন খেয়াল করে আবু মিয়া সারাক্ষণ আম বাগান এবং আম বাগানের কুঁড়ে ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সে এর বাইরে কখনও যায় না। হাট-বাজার কিছুই করে না। তা হলে সে খায় কী? জানা যায় সে দিনের পর দিন না খেয়ে কুঁড়ে ঘরের সামনে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করে। পনেরো দিন, একুশ দিন, এক মাস পরপর ধ্যান ভাঙে। ধ্যান ভেঙে শুধু অনেক মধু খায়। মনে-মনে তো ভাবছিস এত মধু পায় কোথায়! আম বাগানের প্রতিটি গাছে ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছিরা মধুর চাক তৈরি করে যাচ্ছে। সেই চাক ভেঙেই মধু সংগ্রহ করে আবু মিয়া। যেদিন আবু মিয়ার ধ্যান ভাঙে সেদিন কোত্থেকে যেন মিসমিসে কালো রঙের একটা হুলো বিড়াল তার কাছে আসে। সারা রাত ধরে বিড়ালটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে আদর করে। শেষ রাতের দিকে আগুন জ্বেলে সেই আগুনের মধ্যে পা বেঁধে বিড়ালটাকে ফেলে দেয়। এভাবেই চলছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'বিড়ালটাকে যদি পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়, তা হলে পরে আবার আসে কোত্থেকে?'

'জানি না! এটাই তো রহস্য। তবে অনেকে বলে, বিড়ালের পোড়া দেহটা কবরস্থানে চেয়ারম্যানের ভাঙা কবরের মধ্যে ফেলে আসে। আবার নির্দিষ্ট দিনে বিড়ালটা জীবিত হয়ে ভাঙা কবর থেকে বেরিয়ে আসে।'

'কী সব আজগুবি কথা বলছ, খালা! মরা বিড়াল আবার কীভাবে জীবিত হয়!'

BanglaBook.org

খালা চটে যাওয়া গলায় বলল, 'তোকে এই আজগুবি কথা কে শুনতে বলেছে! ইচ্ছে হলে বিশ্বাস করবি না হলে নাই। সবই শোনা কথা, নিজের চোখে তো আর কিচ্ছু দেখিনি। অনেক বেলা হয়ে গেছে, যাই রান্না চড়াই। তোর খালু বড়-বড় দুইটা রিঠা মাছ এনেছে। চম্পার মাকে কুটতে দিয়ে এসেছি, দেখি গিয়ে কত দূর করল।'

তিন

আমার শোবার ব্যবস্থা বাংলা ঘরে। বাংলা ঘর হলেও খুব সাজানো গোছানো ঘর। বার্নিশ করা চকচকে নতুন খাট। বিশাল কাঠের বুক শেলফ। শেলফ ভর্তি বই। সেগুন কাঠের আলনা। জানালার পাশে টেবিল-চেয়ার। তার ওপাশে ইজিচেয়ার। ঘরের সাথে লাগোয়া টয়লেট। আসলে ঘরটা নামে বাংলা ঘর হলেও ব্যবহার হচ্ছে অতিথি ঘর হিসেবে। আমার জন্যে খুব সুবিধেই হয়েছে, রাত জেগে নির্বিঘ্নে বই পড়তে পারি। এ ছাড়া নিরিবিলি একা-একা থাকতেই আমি বেশি পছন্দ করি।

বর্তমানে বাংলা ঘরে থাকায় আর একটি সুবিধে ভোগ করছি। গত পাঁচ রাতে, রাত বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে আম বাগানের আবু মিয়ার কুঁড়ে ঘরের ওখানে যাচ্ছি। খালাত ভাই রিয়াজকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলেছিলাম। সে রাজি হয়নি। এমনিতেই সে আবু মিয়াকে ভয় পায়, তার চেয়েও বেশি ভয় পায় খালাকে। খালার কড়া নির্দেশ—আমরা দু-ভাইয়ের কেউ যেন আবু মিয়ার ধারে কাছেও না যাই। সেখানে রাতে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে লুকিয়ে যেতে হয়।

রাত বারোটা-সাড়ে বারোটা বাজলে আগে থেকে সরিয়ে রাখা খালুজানের চার্জার বড় টর্চ লাইটটা হাতে নিয়ে, নিঃশব্দে দ্রুত পা ফেলে চলে যাই আবু মিয়ার আস্তানায়। তখন গ্রামটা হয়ে যায় নিঝুমপুরী। যাওয়ার পথে গাছের পাতা ঝরে পড়ার শব্দ, নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানো আর কুক...কুক... একঘেয়েমি ডাক, কুকুরদের থেমে-থেমে

BanglaBook.org

আর্তনাদের শব্দ ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই থাকে ঘুমিয়ে। গভীর রাতে নিস্তব্ধ পরিবেশে সেই সব শব্দ গায়ে ছমছমে ভাব এনে দেয়।

গত পাঁচরাত ধরে আবু মিয়ার কাছে গিয়ে বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। খালার কথা মত আবু মিয়া সত্যিই কুঁড়ে ঘরের সামনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকে। চোখ দুটো থাকে বন্ধ। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তার গায়ে থাকে শুধু একটা চট জড়ানো। মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে, শব্দ করে তার ধ্যান ভাঙানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। লোকটার বুকটা যদি একটু ওঠা-নামা না করত তা হলে বুঝতেই অসুবিধে হত লোকটা জীবিত না মৃত। আর একটা ব্যাপার দেখে খুবই অবাক হয়েছি। লক্ষ-লক্ষ জোনাকি পোকা আবু মিয়াকে ঘিরে ভিড় জমিয়ে থাকে।

'নেশা' বইটা শেষ করতে রাত একটা বেজে গেল। বই রেখে খুব দ্রুত জ্যাকেটের উপরে একটা শাল জড়িয়ে, গলা, কান, মাথা মাফলার দিয়ে ভালভাবে পেঁচিয়ে, টর্চটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। আজ শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, কুয়াশাও বেশ। পাঁচ হাত দূরেও ঠিক মত দেখা যাচ্ছে না।

শীতের দাপটে হিম হয়ে যাওয়া পা নিয়ে দ্রুত হেঁটে আবু মিয়ার কুঁড়ে ঘরের সামনে পৌঁছে গেলাম। আশ্চর্য! আবু মিয়াকে দেখছি না! প্রতিদিন আবু মিয়াকে যে জায়গায় ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় দেখেছি, সে জায়গাটা খালি। জোনাকিদেরও দেখা নেই। হঠাৎ আমার চোখ চলে যায় কুঁড়ে ঘরের বিশ-পঁচিশ হাত উপরে—জোনাকিদের ভিড় আজ সেখানটায়। জোনাকিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার বুকটা ধক করে উঠল। আবু মিয়া পদ্মাসন অবস্থায় শূন্যে ভেসে রয়েছে। টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হয়ে যাই যা দেখছি ঠিকই দেখছি, ভ্রম নয়। নিজেকে সামলাতে নিজেই নিজেকে বোঝাচ্ছি—এটা সম্ভব, উচ্চস্তরের মেডিটেশনের এক পর্যায়ে, মানুষ ভর শূন্য হয়ে ভেসে উঠতে পারে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চয়ই আবু মিয়া মেডিটেশনের খুব গভীরে চলে গিয়েছে।

মোহগ্রস্ত অবস্থার অবসান ঘটে বিড়ালের মিঞাও-মিঞাও ডাকে। নীচে তাকিয়ে দেখি ঝোপের ভিতর থেকে মিসমিসে কালো রঙের একটা বিড়াল বেরিয়ে এল। বিড়ালটা কিছুটা এগোনোর পর লেজ নাড়িয়ে—নাড়িয়ে একই

BanglaBook.org

জায়গায় বসে ঘুরতে থাকে।

বিড়ালের মিঞাও-মিঞাও ডাকে আবু মিয়ারও ধ্যান ভেঙেছে। বড়-বড় চোখ দুটো দিয়ে হিংস্রভাবে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

এ-আমি কী দেখছি! আবু মিয়ার চোখের ভিতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হচ্ছে! সেই শিখা পৌঁছে গেল বিড়ালটার শরীরে। আমার চোখের সামনে বিড়ালটা জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল।

চার

তিন দিন ধরে প্রচণ্ড জ্বরে ভুগলাম। তিন দিন কোনও হুঁশ ছিল না। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছি। এখন জ্বর ছেড়ে গেছে। তবে শরীরটা বেশ দুর্বল ঠেকছে। সেদিন রাতে আবু মিয়ার ওখান থেকে কীভাবে বাড়ি ফিরেছিলাম তা ঠিক মনে করতে পারছি না।

জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি। কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ আমার মাথার ভিতর কথা বলে উঠছে। 'আপনি এখানে কী চাচ্ছেন, এখান থেকে চলে যান।' এ জাতীয় কথাবার্তা। কথাগুলো স্পষ্টই শুনি। চমকে আশপাশে তাকাই। কাউকে দেখি না। ব্যাপারটা আশপাশে কেউ না থাকলেই ঘটে। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি কে জানে! শুনেছি প্রচণ্ড জ্বরে অনেক সময় মানুষের ব্রেনের নিউরোন ক্ষতিগ্রস্ত হয়

আবার মাথার ভেতর কথা বলছে, 'আপনি এখান থেকে চলে যান। আমার দায়িত্ব আমাকে ঠিকভাবে পালন করতে দিন।'

'আপনি কে?' মনে-মনে প্রশ্ন করলাম। মুহূর্তে নিজেকে সামলে অটোসাজেশন দিচ্ছি, ভুল শুনছি, আমি ভুল শুনছি। কেউ কথা বলছে না মাথার মধ্যে।

'না, আপনি ভুল শুনছেন না। আমি কথা বলছি। টেলিপ্যাথির মাধ্যমে কথা বলছি। আপনি চলে যান। আমাকে দায়িত্ব পালন করতে দিন।'

BanglaBook.org

এবার আমি কিছুটা বুঝতে পারছি–বোধহয় এটা আবু মিয়া। লোকটা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে আমার মাথার ভিতর কথা বলছে। 'কী দায়িত্ব আপনার?'

'শাস্তি দেয়ার।'

'কাকে শাস্তি দেয়ার?'

'চেয়ারম্যানকে। তার গোটা বংশধরদের।'

'কী করেছে চেয়ারম্যান?'

'অনেক পাপ করেছে। তুচ্ছ সম্পদের জন্যে নিরীহ মানুষদের একের পর এক হত্যা করে, আম বাগানে পুঁতে দিয়েছে। তার প্রধান সহচর ছিল ধলা মিয়া।'

'চেয়ারম্যান তো অনেক আগেই মারা গেছে, ধলা মিয়াও। আর কাকে শাস্তি দিতে চান?'

'তার ছোট মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে। এ ছাড়া প্রতি অমাবস্যার রাতে যে বিড়ালটা পুড়িয়ে মারি সেটা তো চেয়ারম্যানের আত্মাই বহন করে। পনেরো দিন পর-পর অসহ্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে বেঈমানটা।'

'মেয়েটাকে মারবেন কেন? সে তো কোনও দোষ করেনি। সে তো নিষ্পাপ।'

'চেয়ারম্যান তার বংশধরদের জন্যেই সম্পদের পাহাড় গড়েছে। পৃথিবীবাসীদের দেখাতে চাই পাপের পথে সম্পদ অর্জন করা যায়, ভোগ করা যায় না। ভোগ করার জন্যে শেষ পর্যন্ত কেউ থাকে না।'

'আপনি কে? আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'আমি! আমি কেউ না!' থেমে-থেমে অট্টহাসির শব্দ। 'কাল রাতেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। কাল চেয়ারম্যানের মেয়ে গ্রামে আসছে।' আবার অট্টহাসি।

BanglaBook.org

পাঁচ

জ্বর থেকে ওঠার পর কোনও খাবারই খেতে পারি না। জিভ স্বাদহীন হয়ে গেছে। খালা আতপ চালের ভাতের সাথে বাচ্চা মুরগির ঝোল রেঁধে খেতে দেন। জোর করে একটু-আধটু মুখে দিই। হাঁটা চলা করার মত শক্তিও নেই। সারাদিন মনমরা হয়ে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকি। সকালবেলা খালার কাছে শুনলাম চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ে তার চাচা-চাচীর সাথে গ্রামে এসেছে। আবু মিয়াকে তাড়াবার ব্যবস্থাও করেছে। উত্তর পাড়ার লাঠিয়াল বাহিনীকে খবর দিয়েছে। লাঠিয়ালরা পিটিয়ে আবু মিয়াকে গ্রাম ছাড়া করবে।

সন্ধ্যা নাগাদ শুনতে পেলাম লাঠিয়াল দিয়েও আবু মিয়াকে তাড়ানো যায়নি। আবু মিয়ার ধ্যান ভাঙানোর জন্য লাঠিয়ালরা যে-ই গিয়ে তাকে আঘাত করেছে তার হাতই সাথে-সাথে অবশ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে লাঠিয়ালরা পালিয়ে গেছে। এদিকে সন্ধ্যা থেকে চেয়ারম্যানের মেয়ের প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়েছে। পেটের ব্যথায় সে কাটা মুরগির মত ছটফট করছে।

আমার মন বারবার তাগিদ দিচ্ছে, কিছু করা উচিত। যেই মুহূর্তে ভাবি আবু মিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াব, ঠিক তখনই মাথার মধ্যে সেই অপার্থিব কণ্ঠস্বরটা শুনতে পাই। 'না, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। চেয়ারম্যানের মেয়ে তার নিয়তির সামনে। নিয়তিকে বদলানো যায় না। আপনি কিছু করতে চাইলে আপনারই ক্ষতি হবে।'

রাত দুটো নাগাদ আবার মাথার মধ্যে কথা বলে উঠল, 'আমার দায়িত্ব শেষ। আমি চলে যাচ্ছি। আমি জানি কাল সকালে আপনিও এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন। আপনার প্রতি অনুরোধ, যাওয়ার আগে স্থানীয় থানায় ডায়রী করে যাবেন। চেয়ারম্যান তার আম বাগানের মধ্যে খুন করে যে লাশগুলো পুঁতে রেখেছে, সেই লাশের কঙ্কালগুলো তুলতে বলবেন, পৃথিবীবাসী

BanglaBook.org

জানুক—একটা লোক ঐশ্বর্যের জন্যে কতটা নীচে নামতে পারে।'

সারারাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটল। ভোর হতেই শুনতে পেলাম চেয়ারম্যানের মেয়ে মারা গেছে। তার মৃত্যু হয়েছে ভয়ঙ্করভাবে। পেটের ব্যথায় চিৎকার করতে-করতে এক সময় নাভির ভিতর থেকে পচা দগদগে মাংসযুক্ত একটা বিড়াল আকৃতির জ্যান্ত প্রাণী বেরিয়ে আসে। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে সেই প্রাণীটাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে।

পরিশিষ্ট

আমি সেদিন সকালেই বাদলপাড়া গ্রাম ছেড়ে চলে আসি। আসার আগে আবু মিয়ার কুঁড়ে ঘরের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। চারদিকে খাঁ-খাঁ শূন্যতা। আবু মিয়া যে জায়গায় ধ্যানে বসে থাকত, সেখানে তার গায়ের চটটা পড়ে আছে। সেটা থেকে মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে।

বাদলপাড়া থানায় ডায়রী করে রেখে আসি। আম বাগানে যে অনেকগুলো লাশ গুম করা হয়েছে তা-ও উল্লেখ করি।

কর্মস্থলে আগের মত ব্যস্ততায় আমার দিন কেটে যায়। তবে কখনও-কখনও মাঝ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পরে রাতের বাকি সময়টা কেটে যায় বাদলপাড়া গ্রামের ভয়ানক স্মৃতিগুলো ভেবে। কখনও-কখনও চেয়ারম্যানের ছোট মেয়ের কথা ভেবে বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে।

একটা দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম, বাদলপাড়ার চেয়ারম্যানের আম বাগানের মাটি খুঁড়ে, পুলিশ একশটা কঙ্কাল উদ্ধার করেছে। পুলিশের ওসি জানিয়েছে এখনও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, আরও কঙ্কাল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, প্রতিটি কঙ্কালেরই ঘাড়ের ভারটেব্রা ভাঙা।

শুক্র-শনিবার সন্ধ্যায় কনফার্ম ব্যাচেলর হাসানাত ভাইয়ের বাসায় তাসের আড্ডা বসে। সাইফুল্লা সেই আড্ডার একজন সদস্য। তবে কয়েক মাস ধরে সাইফুল্লার আগমন তেমন ঘটে না। সেদিন পথে সাইফুল্লার সাথে দেখা হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে, তুই আজকাল হাসানাত ভাইয়ের বাসার তাসের আড্ডায় আসিস না কেন?'

BanglaBook.org

সে উৎসাহ নিয়ে জানাল, 'প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই তিন দিন সন্ধ্যায় সে বাসা থেকে বের হয় না।'

'কেন, বউ-এর নিষেধ আছে নাকি?'

'আরে নাহ! এই তিনদিন কলকাতার ই.টি.ভি বাংলা এবং জি বাংলা চ্যানেলে "ধুম মাচালে ধুম" এবং "ড্যান্স বাংলা ড্যান্স" নামে দুটি নাচের অনুষ্ঠান হয়, তা দেখি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুই নাচের কী দেখিস?'

'কচি-কচি মেয়েরা নাচে, দেখার মজাই আলাদা।' সাইফুল্লার চোখে-মুখে অন্য কিছুর ইঙ্গিত। 'তা ছাড়া M.G যে রকম শৈল্পিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে, আমারও সেরকম শৈল্পিক দৃষ্টি।'

' M.G টা কে?'

'মহাগুরু। মিঠুন চক্রবর্তী।'

'তোর "টিকটিকির পুষ্টিকর খাদ্য" নামের বইটি কি লেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, লেখা শেষ। তবে প্রকাশক পাচ্ছি না ছাপার জন্যে। কিন্তু আমি বসে নেই। "টিকটিকির আত্ম-কাহিনি" নামে আর একটি লেখা শুরু করেছি।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্বৈত

এক

বিকেল থেকেই কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছিল আকাশ। এখন রাত সাড়ে দশটা। তুমুলবেগে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সাথে বিকট শব্দে মেঘের গর্জন আর উত্তাল হাওয়ার মাতামাতি।

বিদ্যুৎ চলে গেছে।

আজাদ সাহেব অন্ধকারে তাঁর একতলা বাড়ির বারান্দায় ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ঝড়-বৃষ্টি দেখছেন। তাঁর গায়ে দমকা বাতাসে ক্ষণে-ক্ষণে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। তাতে তিনি বেশ পুলক অনুভব করছেন। আজ সারাদিন খুব গরম পড়েছে, তাই বৃষ্টির ছাঁট স্বর্গীয় পরশ বলে মনে হচ্ছে।

আজাদ সাহেবের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। অবিবাহিত। সরকারি হাতেম আলী কলেজের প্রফেসর। মাঝারি উচ্চতার শক্ত-পোক্ত শরীরের অধিকারী লোক। মাথার একেবারে তালুতে ছোট্ট টাক। সেই টাক তিনি আশপাশের চুল দিয়ে ঢেকে রাখেন। শান্ত কোমল চোখ। ঘন ঝোপের মত ভুরু। উঁচু নাকের নীচে পুরুষ্টু বিছের মত মোটা গোঁফ। গায়ের রং শ্যামলা।

পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আজিমপুরের এই একতলা বাড়িতে বর্তমানে আজাদ সাহেব একা থাকেন। অবশ্য একেবারে একা নন, সাদা রঙের একটা হুলো বিড়ালও তাঁর সাথে বাস করে। লিটন নামে পনেরো-ষোলো বছর বয়সী একটা কাজের ছেলেও ছিল। কিছুদিন আগে ছেলেটা আলমারির তালা ভেঙে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

আজাদ সাহেবের একমাত্র ছোট বোনের এই ঢাকা শহরেই স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। বোন ছাড়াও তিন খালা, দুই ফুপু, এক মামার বাড়িও

BanglaBook.org

ঢাকায়। আজাদ সাহেব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে তেমন একটা যান না। কারণ ছোট বোন, খালা, ফুপু, মামা...চেনাজানা যার সাথেই দেখা হবে, প্রথমেই বলবে–চুলে দেখি পাক ধরেছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছ তো। একা-একা আর কতকাল? এবারে একটা বিয়ে থা করো। বুড়ো বয়সে সেবা-যত্নের জন্যও তো একটা লোকের প্রয়োজন...

যত কথাবার্তা সব বিয়ে নিয়ে। বিয়ে করলে কী কী উপকারিতা সেই প্যাঁচাল। আজাদ সাহেবের পিত্তি জ্বলে যায়। তিনি বিয়ে না করলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সবাই-ই তো বিয়ে করে, দু-একজন বিয়ে না করে থাকলে কী এমন ক্ষতি? বরং দেশের জন্য ভাল। সবাই তো বিয়ে করে করে জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেশের বারোটা বাজাচ্ছে। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস মুরগি...দুনিয়ার তাবৎ প্রাণী জৈবিক চাহিদা পূরণ করে বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজে নেয়। আর মানুষও একই লক্ষ্যে বিয়ে করে। তা হলে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আর পশু-পাখির মধ্যে পার্থক্য কী? অবশ্য পার্থক্য তেমন কিছু নেইও। পশু-পাখিদের চেয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা বেশি বলে মানুষ ভান করে, অভিনয় করে, মিথ্যে মুখোশের আড়ালে নিজের প্রকৃত রূপ আড়াল করতে পারে আর পশু-পাখি সেটা পারে না।

অনেক দিন পর গত পরশু দিন আজাদ সাহেব তাঁর বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর বোনের নাম আফরোজা। আফরোজার মেয়ে জেনির খুব জ্বর, মেয়েটা অনেক দিন ধরে নাকি জ্বরে ভুগছে তাই শুনে। সঙ্গে দুই কেজি আপেল, এক ডজন কমলা, এক কেজি আঙুর নিয়ে। রোগী দেখতে তো আর খালি হাতে যাওয়া যায় না। বাড়িতে ঢুকে দেখেন কীসের জ্বর আর কীসের কী! আফরোজার মেয়ে জেনির জন্মদিন। জমকালোভাবে জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। হুলস্থূল কাণ্ড। বাড়ি ভর্তি রঙ-বেরঙের পোশাক পরা নারী-পুরুষে। আজাদ সাহেবকে মিথ্যে করে অসুখের কথা বলে আনা হয়েছে।

এত লোকজন, জাঁকজমক, হাসি-উল্লাস, হাই ভলিউমে ইংরেজি মিউজিক...সব কিছুর মধ্যে আজাদ সাহেবের নিজেকে খুব বেমানান মনে হয়। তিনি প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ নিয়ে হলরুমের মত সুপরিসর ড্রইংরুমের এক কোনায় চুপচাপ বসে থাকেন। চলে আসবেন যে তাও পারেন না।

BanglaBook.org

আফরোজা তাঁকে মৃত বাবা-মায়ের নামে দিব্যি করায় না খেয়ে তিনি আসতে পারবেন না।

কিছু ইয়ং ছেলে-মেয়ে মিউজিকের তালে তালে শরীর দুলিয়ে-দুলিয়ে নাচছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ড্রিংকসের গ্লাস। বোধহয় সফট্ ড্রিংকস। কিছু মাঝ বয়েসী নারী-পুরুষরা নৃত্যরত ছেলে-মেয়েদের পাশ থেকে উৎসাহ দিচ্ছে। হাতে তালি দিচ্ছে। কেউ কেউ আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত নেড়েচেড়ে নাচার মত ভঙ্গি করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতেও গ্লাস ধরা।

এক সময় আজাদ সাহেব দেখেন তাঁর বোন আফরোজা হন্তদন্ত হয়ে তাঁর দিকে আসছে। তিনি নড়েচড়ে বসেন।

আফরোজা এসে ঝুঁকে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে, আঙুল তুলে নৃত্যরত ছেলে-মেয়েদের দিকে দেখিয়ে, নিচু স্বরে বলে, 'ভাইজান, দেখো তো ওই মেয়েটাকে কেমন লাগছে?'

আজাদ সাহেব হতভম্ব হয়ে বলেন, 'কোন্ মেয়েটাকে?'

'আরে ওই যে নীল শাড়ি পরা।'

আজাদ সাহেব বুঝতে পারেন তাঁর বোন নৃত্যরত ছেলে-মেয়েদের দেখাচ্ছে না, সে দেখাচ্ছে নৃত্যরত ছেলে-মেয়েদের ঘিরে যে মাঝ বয়সী নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে।

আজাদ সাহেব ভুরু কুঁচকে বলেন, 'নীল শাড়ি পরা তো দুজনকে দেখছি, কোন্ জন?'

আফরোজা ব্যাকুল হয়ে বলে, 'আরে, ডান পাশের ফর্সা মোটা জন।'

এবারে আজাদ সাহেব সনাক্ত করতে পারেন আফরোজা কাকে দেখাচ্ছে। নীল শাড়ির সাথে ম্যাচ করে স্লিভলেস ব্লাউজ পরা মোটাসোটা থলথলে শরীরের অধিকারিণী এক মহিলাকে। কুস্তিগীরের মত বিশাল তার দুই হাতের বাজু। পর্বতের মত সুউচ্চ আর বিস্তৃত বিশাল তার দুই বক্ষ। ঢাকাই সিনেমায় এমন ফিগারের নায়িকা আছে।

আফরোজা আগ্রহী গলায় বলে, 'ভাইজান, পছন্দ হয়েছে?'

আজাদ সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। সেদিকে খেয়াল না করেই আফরোজা সোৎসাহে হড়বড় করে বলতে থাকে, 'ডিভোর্সী। নিঃসন্তান।

BanglaBook.org

বাপের একমাত্র মেয়ে। ঢাকার ধানমণ্ডিতে দুইটা বাড়ি। মিরপুরে একটা গার্মেন্টিস। বায়তুল মোকাররমে একটা জুয়েলারী শো-রুম। আশুলিয়ায় ত্রিশ বিঘা জমির উপরে একটা সিনেমার শ্যুটিং স্পট। বেশ কয়েক কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স... আরও কত কী যে আছে বলে শেষ করা যাবে না। ভাইজান, তুমি রাজি হয়ে যাও। একে বিয়ে করতে পারলে তুমি একেবারে রাজার হালে থাকবে।'

আজাদ সাহেব হ্যাঁ-না কিছু না বলে, বলেন, 'পানি খাব।'

অমনি আফরোজা ছুটে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এবং এক গ্লাস ড্রিংকস নিয়ে আসে। আজাদ সাহেব ঢকঢক করে পুরো গ্লাস পানি শেষ করার পর আফরোজা তাঁর হাতে ড্রিংকসের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'যাও, ভাইজান, ড্রিংকস খেতে খেতে ববি ম্যাডামের সাথে পরিচিত হও। তাঁর পাশে গিয়ে তাঁর মত হালকা একটু নাচানাচিও করো। ও, বলতে ভুলে গেছি ওনার নাম ফারজানা ববি।'

আজাদ সাহেব গম্ভীর গলায় বলেন, 'আমি নাচানাচি করব?'

'নাচলে দোষের কী! তাতে শারীরিক কসরত হবে। খিদে বাড়বে। রাতের খাওয়াটা জমিয়ে খেতে পারবে।'

আজাদ সাহেবের ইচ্ছে করল আফরোজাকে ধরে ঠাস-ঠাস করে দু'গালে দুটো থাপ্পড় বসাতে। বলে কী গর্দভটা! এই বয়সে কুস্তিগির মহিলার পাশে গিয়ে তিনি ঢ্যাং-ঢ্যাং করে নাচবেন!

আজাদ সাহেব কোনও কিছু না বলে বিরক্তি সহকারে ড্রিংকসের গ্লাস মুখের কাছে তুলে নাক কুঁচকে তৎক্ষণাৎ গ্লাস নামিয়ে বলেন, 'এই গ্লাসে কী? কেমন বিদঘুটে গন্ধ আসছে।'

'ভাইজান, ককটেল। কয়েক ধরনের হার্ড ড্রিংকস মিলিয়ে বানানো হয়েছে। খুবই ভাল জিনিস। খেলে মনে ফুর্তি আসবে। এসব ছাড়া আজকাল পার্টি জমে না।'

ভাগ্নির অসুখ দেখতে গিয়ে এত শত বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত মাঝ রাতে আজাদ সাহেব বাড়িতে ফেরেন। বাড়িতে ফিরে রাতের বাকি অংশটা টয়লেটেই কাটান। কারণ আফরোজোর পীড়াপীড়িতে খাওয়া এমন বেশি হয়েছিল যে পেটের ভিতরে চিংড়ি, রুই, ইলিশ, গরু, খাসি,

BanglaBook.org

মুরগি মিলে ককটেল হয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলে। সারা রাত পেটের ভিতরে হড়হড়, গড়গড়, ভুটভাট ডাকাডাকির শব্দ হয়।

দুই

বৃষ্টি ধরে এসেছে।

আজাদ সাহেব প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বারান্দার ইজি-চেয়ারে একই অবস্থায় বসে বিদ্যুৎ আসার অপেক্ষা করছেন। বিদ্যুৎ আসার পরে তিনি রাতের খাবার খাবেন। বিদ্যুৎ চলে যাবার আগেই তিনি ভাত রেঁধেছেন। ভাতের ভিতরে দুটো আলু সিদ্ধ দিয়েছেন। পিঁয়াজ-মরিচও কুচিয়ে রেখেছেন। ঘরে গাওয়া ঘি আছে। গাওয়া ঘি মাখিয়ে আলু ভর্তা করে আর ডিম ভেজে ভাত খাবেন।

বিদ্যুৎ আসার অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে আজাদ সাহেবের। কী এক দেশ! একটু ঝড়-বৃষ্টি হলেই সারা রাতের জন্য বিদ্যুঃ নাই হয়ে যায়। আজ রাতেও বোধহয় বিদ্যুৎ আর আসবে না।

আজাদ সাহেব ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে যান। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে খাবার ঘরে পৌঁছে যান। একটা মোম জ্বেলে রাতের খাবার সেরে ফেলার আয়োজনে নেমে পড়েন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, দাঁত ব্রাশ করে আজাদ সাহেব শোবার ঘরে ঢোকেন। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছে। ইলেকট্রিসিটি এখনও আসেনি। তাতে অবশ্য কোনও সমস্যা নেই। বৃষ্টিতে প্রকৃতি শীতল হয়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। বোধহয় পাতলা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ঘুমাতে হবে।

মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা ম্লান আলোতে সুপরিসর শোবার ঘর আজাদ সাহেবের চোখে স্পষ্ট হতেই তিনি প্রচণ্ড চমকে উঠলেন। সটান হয়ে কে যেন তাঁর বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। মৃদু নাক ডাকার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

আশ্চর্য! বাড়িতে আজাদ সাহেব একা মানুষ! তা হলে তাঁর বিছানায়

BanglaBook.org

ঘুমাচ্ছে কে? চোর-ছ্যাঁচড়? চুরি করতে এসে ঠাণ্ডা পেয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে! ডেকে যে লোকটাকে ঘুম থেকে জাগাবেন সেই সাহস আজাদ সাহেবের হচ্ছে না। তাঁর মনে হচ্ছে লোকটাকে ঘুম থেকে জাগালেই লোকটা উঠে তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। ভয়ে তাঁর হাত-পা একটু একটু কাঁপছে।

কিছুটা এগিয়ে বিছানার পায়ের কাছে গিয়ে, আজাদ সাহেব ঘুমন্ত লোকটার পায়ের দিক থেকে ধীরে-ধীরে লোকটার গা মুড়ি দেওয়া কাঁথাটা টানতে শুরু করলেন। পায়ের দিক থেকে কাঁথা টানছেন এই জন্য, গা থেকে কাঁথা সরাতে গিয়ে যদি লোকটার ঘুম ভেঙে যায় তা হলে লোকটা যেন চোখ মেলেই তাঁকে দেখতে না পায়।

না, লোকটার ঘুম ভাঙেনি। ধীরে-ধীরে লোকটার সম্পূর্ণ গা থেকেই কাঁথা সরিয়ে ফেলা গেছে। শ্বাসের তালে-তালে লোকটার বুক-পেট ওঠা-নামা করছে।

লোকটার চেহারা আজাদ সাহেবের খুব পরিচিত-পরিচিত লাগছে। আজাদ সাহেবের বয়সীই একটা লোক। লোকটার পরনে আকাশী রঙের হাফ হাতা ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি। লোকটার গায়ের পোশাকও পরিচিত লাগছে। আরে ওই আকাশী রঙের ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি তো তাঁর নিজেরই! পরক্ষণেই তাঁর ভুল ভাঙল। তাঁর আকাশি রঙের ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি এই মুহূর্তে তাঁর পরনেই। লোকটার বাম হাতের অনামিকায় আকীক পাথর বসানো একটা রূপার আংটি। আজাদ সাহেবও অনেক বছর ধরে ডান হাতের অনামিকায় আকীক পাথর বসানো একটা রূপার আংটি ব্যবহার করছেন। লোকটার মাথার তালুতে ঠিক আজাদ সাহেবের মত ছোট্ট একটা টাক। লোকটার নাকও আজাদ সাহেবের নাকের মত উঁচু। সে-ও আজাদ সাহেবের মত মোটা গোঁফ রেখেছে। আরে, লোকটার চেহারা তো হুবহু আজাদ সাহেবেরই মত!!!

লোকটার চেহারা হুবহু আজাদ সাহেবের মত এ ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ সাহেব জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

BanglaBook.org

সকালে ঘুম ভাঙার পরে আজাদ সাহেব নিজেকে আবিষ্কার করলেন বিছানায়। তাঁর পায়ের কাছে পাতলা কাঁথা দলা করে রাখা। কাঁথাটা দেখে তাঁর রাতের কথা মনে পড়ল। রাতে তিনিই তাঁর মত চেহারার সেই ঘুমন্ত লোকটার গা থেকে কাঁথাটা টেনে সরিয়ে লোকটার পায়ের কাছে দলা করে রেখেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই লোকটার মত সটান হয়ে তিনিই বিছানায় শোয়া অবস্থায় আর কাঁথাটা তাঁর পায়ের কাছে দলা করে রাখা। ব্যাপারটা কী ঘটল? তিনি তো অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিলেন আর লোকটা ছিল বিছানায়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় এলেন কী করে? আর লোকটাই বা গেল কোথায়? সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে আজাদ সাহেব বাসার সব কামরায় লোকটাকে খুঁজলেন। কোথাও তার দেখা মিলল না। বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা। রাতে আজাদ সাহেবই নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছেন। লোকটা দরজা খুলে চলে গেলে দরজা খোলা অবস্থায় থাকার কথা ছিল। কারণ বাড়িতে তো আজাদ সাহেব ছাড়া আর কোনও লোক নেই যে লোকটা চলে যাবার পর সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছুতেই হিসাব মিলছে না। তা হলে কাল রাতে কি তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন? না, স্বপ্ন নয়! তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, ভাত খেয়ে, দাঁত ব্রাশ করে ঘুমাতে গিয়ে দেখেছেন তাঁর মত চেহারার একটা মানুষ তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

তিন

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। কোনও প্রকারের অস্বাভাবিকতার আর মুখোমুখি হননি আজাদ সাহেব। সেই রাতের ব্যাপারটা তিনি স্বপ্ন বলেই ধরে নিয়েছেন। স্বপ্ন ছাড়া ওই ঘটনার আর কোনও ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারছেন না।

আজ সারা দিনে আজাদ সাহেবের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আজ অনার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তিনি পরীক্ষা হলের একটা রুমের ইনভিজিলেটরের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সাথে ওই রুমের ইনভিজিলেটরের দায়িত্বে তাঁর কলিগ আর এক প্রফেসরেরও থাকার কথা ছিল। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সেই প্রফেসর ফোন করে জানান তাঁর ছেলের খুব অসুখ। ছেলেকে নিয়ে তিনি হাসপাতালে যাচ্ছেন, আসতে পারবেন না। কী আর করা! পরীক্ষা হলের অত বড় রুমটা আজাদ সাহেবকে একাই সামলাতে হয়। টানা চার ঘণ্টা পরীক্ষা শেষে, কলেজের প্রিন্সিপাল পরীক্ষা উপলক্ষে জরুরি মীটিং ডাকেন। বিকেলে কলেজ থেকে বের হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে কলিগের অসুস্থ ছেলেকে দেখতে যান। বাসায় ফিরতে-ফিরতে রাত আটটা বেজে যায়। একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার রান্না-বান্নায় লেগে পড়েন। ফেরার পথে বাজার থেকে বড় সাইজের একটা ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ কিনে এনেছেন। মাছটা কেটেকুটে রান্না শুরু করেন। অনেক দিন ধরে সর্ষে ইলিশ খেতে ইচ্ছে করছে, তাই সর্ষে ইলিশ রাঁধেন। আর মাছের ডিম আলাদা মাখামাখা ভুনা করেন। রান্না করা মাছের মাথাটা বিড়ালটাকে খেতে দেন। কাঁটার ভয়ে তিনি কখনও ইলিশ মাছের মাথা খান না।

সর্ষে ইলিশ আর মাছের ডিম ভুনা দিয়ে ভর পেট ভাত খেয়ে আজ একটু আগেভাগেই তিনি শুয়ে পড়েন।

রাত দুটো। আজাদ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে কান ফাটানো মেঘের গর্জন আর তুমুল বর্ষণ। সেই সাথে দমকা হাওয়া। দমকা হাওয়ার তোড়ে বিছানার ডান দিকে রুমের খোলা জানালাটা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে আজাদ সাহেবের গায়ে পড়ছে।

রুমে নীল রঙের ডিম লাইট জ্বালানো ছিল। ডিম লাইট জ্বলছে না। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে না হতেই যথারীতি ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। থেমে-থেমে বিদ্যুৎ চমকানোর নীল আলোতে দেখা যাচ্ছে ডান দিকের খোলা জানালাটার কপাট ঝড়ো বাতাসে খুব দাপাদাপি করছে।

আজাদ সাহেব বিছানা থেকে নেমে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে অন্ধকারে

BanglaBook.org

অনুমান করে আবার এসে বিছানায় বসলেন। বিছানার উপরে বসতে না বসতেই তিনি ভীষণ চমকে উঠলেন। কে যেন মোমবাতি হাতে রুমের দিকে আসছে! ধীরে-ধীরে আলো ফুটে উঠছে। যে আসছে সে গুনগুন করে গানও গাইছে। ভরাট পুরুষ কণ্ঠ, 'আজি ঝর ঝর বাদর মুখর দিনে...'

অথচ বাড়িতে আজাদ সাহেব একা!!!

বৃষ্টি-বাদলা দেখলে আজাদ সাহেব নিজেও এই গানটার দু-এক লাইন গুনগুন করেন। তাঁর খুব পছন্দের একটা গান এটা।

সেদিন রাতে আজাদ সাহেবের বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে বেঘোরে ঘুমাতে দেখা হুবহু আজাদ সাহেবের মত চেহারার সেই লোকটা মোমবাতি হাতে রুমের ভিতরে ঢুকল। আজ লোকটার গায়ে সাদা স্যাণ্ডো আর নীল-সাদা চেক লুঙ্গি। আজাদ সাহেবের পরনেও এখন ওই একই পোশাক।

চোখে চোখ পড়তেই দু'জনার চোখই ভয়ে ছানাবড়া হয়ে গেল।

আজাদ সাহেব কাঁপা গলায় কোনওক্রমে তোতলাতে-তোতলাতে বললেন, 'কে আপনি?'

লোকটাও আজাদ সাহেবের মত একই কণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনি কে?'

আজাদ সাহেব ভীত গলায় তোতলাতে-তোতলাতে আবার বললেন, 'আমার বাড়িতে আমাকেই প্রশ্ন করছেন, আমি কে?!'

লোকটাও ভীত গলায় বলল, 'আমারও তো একই প্রশ্ন, আমার বাড়িতে আমাকেই জিজ্ঞেস করছেন, আমি কে?!'

আজাদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এটা আপনার বাড়ি!!?'

লোকটাও অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে এটা কি আপনার বাড়ি!!?'

আজাদ সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আলবত এটা আমার বাড়ি। আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কী মতলবে বাড়িতে ঢুকেছেন?'

লোকটা ঝাঁঝের সাথে বলল, 'আপনার কি মাথার ঠিক আছে? আমার বাড়িকে আপনার বাড়ি বলছেন! জলদি বলুন আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? তা না হলে পুলিশ ডেকে কিন্তু চোর বলে ধরিয়ে দেব।'

লোকটার কথা শুনে আজাদ সাহেবের মেজাজ চটে গেছে। তিনি রাগান্বিত গলায় বললেন, 'আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকেই হুমকি দিচ্ছেন!? আপনার নাম কী, বলুন তা?'

BanglaBook.org

লোকটাও রাগান্বিত গলায় বলল, 'আমার নাম আবুল কালাম আজাদ। আমার পিতার নাম আবুয়াল হোসেন। এই বাড়ি আমার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া।'

আজাদ সাহেব বললেন, 'আপনি পাগল নাকি? আপনি তো আমার নাম-পরিচয় বলছেন!'

লোকটা বলল, 'আপনি পাগল। আপনার নাম-পরিচয় নিজের করে কোন্ দুঃখে বলতে যাব। যেটা সত্যি সেটাই বলেছি। ভালোয়-ভালোয় বলুন তো আপনার পরিচয়?'

আজাদ সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'আমার নামও তো আবুল কালাম আজাদ। আমার পিতার নামও আবুয়াল হোসেন। এই বাড়ি আমার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া।'

লোকটা ধৈর্যহারা গলায় বলল, 'ভাল ঝামেলায় ফেলেছেন তো। তা হলে বলুন তো আপনার পেশা কী?'

আজাদ সাহেব বললেন, 'আমি সরকারি হাতেম আলী কলেজের ব্যবস্থাপনার প্রফেসর।'

লোকটা মাথায় হাত দিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'আমিও তো সরকারি হাতেম আলী কলেজের ব্যবস্থাপনার প্রফেসর। এর আগে তো কোনও দিনও আপনাকে কলেজে বা অন্য কোথাও দেখিনি। আপনার আমার মধ্যে নিশ্চয়ই অদ্ভুত কোনও সম্পর্ক রয়েছে।'

আজাদ সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তাই তো! না হলে আপনার সাথে আমার সব কিছু এমন মিলে যাচ্ছে কীভাবে!!!'

লোকটাও উত্তেজিত গলায় বলল, 'আপনার চেহারা আর আমার চেহারাও হুবহু এক। আপনার গায়ে যে পোশাক আমার গায়েও সেই একই পোশাক। আপনার সাথে আমার এই মিলের পিছনে নিশ্চয়ই অদ্ভুত কোনও কারণ রয়েছে। এমনও হতে পারে, আপনি-আমি দুজন অভিন্ন একই সত্তা।'

আজাদ সাহেব বললেন, 'আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনি যা জানেন আমিও তাই জানি কিনা, আপনার স্মৃতি আর আমার স্মৃতিও এক কিনা। আপনার জীবনের এমন কোনও গোপন কথা বলেন তো যা আপনি ছাড়া পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি জানে না।'

BanglaBook.org

লোকটা ইতস্তত গলায় বলল, 'আমার জীবনে গোপন ব্যাপার বলে তেমন কিছু নেই। খুবই সাদাসিধা জীবন আমার। তার পরও কম বয়সের এক মাত্র গোপন স্মৃতিটা বলছি। তাতেও যদি অন্তত প্রমাণ মেলে আপনি-আমি আলাদা।

'আমি তখন সবে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি। উড়ু-উড়ু মন। তখন আমাদের পাশের বাসায় ভাড়াটে ওঠেন রুমা ভাবিরা। রুমা ভাবিরা স্বামী-স্ত্রী নবদম্পতি। অল্প দিনের মধ্যেই রুমা ভাবির সাথে আমাদের পরিবারের খুব ভাব হয়। ভাল-মন্দ কিছু রান্না হলে এ বাড়ির রান্না ও বাড়ি যায়।

'সারাদিন রুমা ভাবির স্বামী থাকতেন অফিসে, তাই সময়ে অসময়ে রুমা ভাবি আমাদের বাড়িতে এসে আড্ডা দিতেন। রুমা ভাবিকে দেখলেই আমার বুকের ভিতরে ছলকে উঠত। রুমা ভাবির মত সুন্দরী নারী জীবনে কমই দেখেছি। রুমা ভাবির চেহারা যেমন সুন্দর ছিল তেমন ছিল তাঁর আকর্ষণীয় ফিগার।

'রুমা ভাবির পেলব ঠোঁট, সুডৌল বুক, ফর্সা কোমল পিঠ, ভারী নিতম্ব–সব কিছু যেন আমাকে চুম্বকের মত টানত। জানেন তো, ওই বয়সে ছেলেদের নারীদেহের প্রতি এক ধরনের তীব্র আকর্ষণ থাকে। তবে সবই দূর থেকে। কাঙ্ক্ষিত নারীর কাছে গেলে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। আমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটত। রুমা ভাবি আমাদের বাড়িতে এলে আমার হার্টবিট বেড়ে যেত। চোখ তুলে পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না।

'কয়েক দিনের জন্য রুমা ভাবিদের বাসার পানির পাম্পটা অচল হয়ে পড়ে। তাঁরা প্রচণ্ড রকমের পানির সমস্যার মুখোমুখি হন। তাঁদের খাওয়ার পানি, রান্নার পানি, ঘর ধোয়া-মোছার পানি আমাদের বাসা থেকে নিয়ে নেন। আর সকালে বা দুপুরে রুমা ভাবি এসে আমাদের বাসা থেকে গোসল সেরে যান। যথারীতি এক দুপুরে রুমা ভাবি আমাদের বাড়িতে গোসল করতে আসেন। সেদিন বাড়িতে আমি একা। বাড়ির সবাই দল বেঁধে চিড়িয়াখানায় গেছে। আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি এসে ভর করে। আমাদের বাসার বাথরুমের দরজায় একটা ফুটো ছিল। আমি বাথরুমের দরজার সেই ফুটোতে চোখ রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে রুমা ভাবির গোসল দেখি। এই কথা আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না।'

BanglaBook.org

লোকটার বলা শেষ হতেই আজাদ সাহেব লজ্জিত মুখে বললেন, 'আপনি তো এতক্ষণ আমার কম বয়সের গোপন স্মৃতিটা বললেন।'

লোকটা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী বলছেন! গোপন স্মৃতিও আপনার সাথে মিলে গেছে!'

আজাদ সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন, 'বুঝতে পারছি না এসব কী হচ্ছে। আপনার সাথে আমার জীবনের সব কিছু কেন এমন ভাবে মিলে যাচ্ছে? আমার তো মাথাটাই ভনভন করছে। যাই বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে আসি।'

লোকটা বলল, 'আপনার চেয়ে আমার মাথাটা বেশি ভনভন করছে। আপনার আগে আমিই বাথরুম থেকে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে আসি।'

লোকটা কেমন অসহায় ভঙ্গিতে রুমের সাথে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকল।

আজাদ সাহেব পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসা অবস্থায় তাঁর আর লোকটার এমন অদ্ভুত রকমের মিল হলো কীভাবে তা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে একটা লম্বা হাই দিলেন। হাই তুলতে গিয়ে আজাদ সাহেবের চোখ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। হাই দেওয়া শেষে চোখ খুলে তিনি প্রচণ্ড রকমে চমকে উঠলেন। তিনি নিজেকে পেলেন বাথরুমের ভিতরে বেসিনের সামনে ঝুঁকে চোখে-মুখে পানি ছিটানোরত অবস্থায়। এটা কেমন হলো? বাথরুমে তো ঢুকেছিল ওই লোকটা। তিনি তো ছিলেন বিছানায় বসা অবস্থায়। তিনি বাথরুমে এলেন কী করে?!

ইলেকট্রিসিটি এসেছে। বাল্বের আলোতে নিজেকে বেসিনের আয়নায় দেখে আজাদ সাহেব ভীষণ ভাবে শিউরে উঠলেন। কারণ আয়নায় যে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে তা হুবহু ওই লোকটার চেহারা!

বাথরুম থেকে বের হয়ে সারা বাসা তন্নতন্ন করে লোকটাকে খুঁজলেন আজাদ সাহেব। কোথাও লোকটাকে আর পাওয়া গেল না।

BanglaBook.org

চার

আজাদ সাহেব নিজেকে নিয়ে সন্দিহান। তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

আজাদ সাহেবের মত চেহারার লোকটা আজকাল হুটহাট যখন-তখন উদয় হচ্ছে। এবং যথারীতি লোকটা নিজেকে আজাদ সাহেব বলে দাবি করছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা শেষে আবার লোকটা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। গায়েব হওয়ার মুহূর্তে ঘটছে রহস্যময় আর একটা ব্যাপার। লোকটার সাথে দেখা হওয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের মত লোকটা গায়েব হওয়ার পরমুহূর্তে আজাদ সাহেব নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন লোকটার অবস্থানে। মনে হচ্ছে তিনি গায়েব হয়ে তাঁর সত্তা লোকটার দেহে ঢুকে যাচ্ছে। তিনি যেন লোকটার সাথে অদলবদল হয়ে যাচ্ছেন।

এই যেমন তিন-চার দিন আগে এক সন্ধ্যায় আজাদ সাহেব রান্না-বান্না করছিলেন। সেই মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। ইলেকট্রিসিটি চলে যাবার পর তিনি খালি গায়ে শুধু মাত্র একটা লুঙ্গি পরা অবস্থায় বাড়ির বারান্দায় যান। ঘামে সিক্ত শরীরে তাঁর প্রিয় ইজি-চেয়ারে কিছুক্ষণ বসে খানিকটা জুড়িয়ে নেবেন। ইজি-চেয়ারের কাছে গিয়ে দেখেন, অন্ধকারে আগে থেকেই সেই লোকটা বসে রয়েছে। লোকটাও হুবহু আজাদ সাহেবের মত খালি গায়ে লুঙ্গি পরা। ঘামে সিক্ত তার শরীর।

লোকটা তাঁকে দেখে চমকে উঠে বলে, 'আপনি আবার এসেছেন! আপনি তো আমাকে জ্বালিয়ে মারছেন। আপনার হাত থেকে নিস্তার পাই কী করে বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম। বুঝি না হঠাৎ-হঠাৎ কীভাবে আপনি উদয় হচ্ছেন, আবার কিছুক্ষণ পর ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছেন! আপনি কি সত্যিই নাকি সবই আমার মনের ভ্রান্তি?'

লোকটার কথা শুনে আজাদ সাহেব হতবাক হয়ে যান। লোকটা যা বলছে আজাদ সাহেব নিজেও লোকটা সম্পর্কে তাই ভাবছেন। আজাদ সাহেবের মনের কথাই যেন লোকটার মুখে শুনলেন।

BanglaBook.org

আজাদ সাহেব বললেন, 'আপনি ভুল করছেন। আপনি সত্যি নন, আমি সত্যি। আপনি হচ্ছেন আমার মনের ভ্রান্তি।'

লোকটা ক্ষিপ্ত স্বরে বলে ওঠে, 'আপনি ভুল করছেন। আমি সত্যি, আপনি আমার ভ্রান্তি।'

এরই মধ্যে আজাদ সাহেবের মনে পড়ে, তিনি গ্যাসের চুলোর আঁচ কমিয়ে চুলোর উপরে রুটি ভাজা তাওয়ায় শুকনো মরিচ ভাজতে রেখে এসেছেন। মরিচ উল্টে দিতে হবে। তা না হলে মরিচের এক পাশ পুড়ে কালো হয়ে যাবে। শুকনো মরিচ ভাজা দিয়ে বিশেষ ধরনের আলু ভর্তা করবেন। ভাতের ভিতরে বড় একটা আলু আর একটা ডিম সিদ্ধ দিয়েছেন। কুঁচানো পিঁয়াজ, শুকনো মরিচ ভাজা, লবণ, সিদ্ধ আলু আর সিদ্ধ ডিমটা এক সঙ্গে চটকে সামান্য সরিষার তেল দিয়ে ভর্তাটা করবেন। এই ভর্তায় আলু ও ডিমের মিলিত স্বাদ পাওয়া যাবে।

লোকটার কথার কোনও প্রতিউত্তর না দিয়ে আজাদ সাহেব বারান্দা থেকে ছুটে রান্নাঘরের দিকে যান শুকনো মরিচ ভাজা উল্টে দিতে। রান্না ঘরে ঢুকে দেখেন মরিচ পুড়ে রান্নাঘর মরিচ পোড়া ঝাঁঝ-ঝাঁঝ গন্ধে পরিপূর্ণ। মরিচ পোড়া গন্ধ নাকে ঢুকতেই আজাদ সাহেব বিকট স্বরে একটা হাঁচি দেন। হাঁচি দেয়ার সময় তাঁর চোখ দু-এক সেকেণ্ডের জন্য বুজে যায়। বোজা চোখ খুলতেই তিনি নিজেকে খুঁজে পান বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসা অবস্থায়। বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসেই তিনি মরিচ পোড়া গন্ধে হাঁচি দিয়েছেন। আবার গরমিল। তিনি ছিলেন রান্নাঘরে আর ওই লোকটা ছিল ইজি-চেয়ারে, হাঁচি দেয়ার পর চোখ খুলে তিনিই ইজি-চেয়ারে আর লোকটা গায়েব। সমস্ত বাসা জুড়ে তিনি একাই।

পরশু রাতেও ওই একই ব্যাপার ঘটল। আজাদ সাহেব টেলিভিশন দেখার উদ্দেশ্যে ড্রইংরুমে ঢুকে দেখেন, সোফায় বসে সেই লোকটা আগে থেকেই টেলিভিশন দেখছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে তখন দেখাচ্ছিল, তিন জন লোক কচুরিপানা ভরা জলা থেকে বিশাল আকৃতির অ্যানাকোণ্ডা সাপ ধরে-ধরে সাপের ওজন নিচ্ছে, দৈর্ঘ্য মাপছে...এই সব। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল আজাদ সাহেবেরও খুব পছন্দের চ্যানেল। সময় পেলেই দেখেন। তাই বলে তাঁর মত চেহারার

BanglaBook.org

অদ্ভুত লোকটার পাশে বসে দেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নীরবে স্টাডি রুমে চলে গেলেন। তাঁর সাবজেক্টের একটা বই নিয়ে বসলেন। পরের দিন কলেজে ক্লাস নেবার সময় যে বিষয়ে লেকচার দেবেন সেই বিষয়ের উপরে কিছু হোমওয়র্ক করার জন্য। এক মনে তিনি বইটা পড়ছেন আর লেকচার মেটেরিয়ালের কিছু কিছু পয়েন্টস লেকচার শীটে টুকে নিচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর হাত থেকে কলমটা ছিটকে টেবিলের নীচে পড়ে গেল। তিনি মাথা নুইয়ে টেবিলের নীচ থেকে কলমটা তুলে যেই না সোজা হয়ে বসলেন অমনি নিজেকে পেলেন ড্রইংরুমের সোফায় বসা অবস্থায়। তাঁর হাতে কলমের বদলে টেলিভিশনের রিমোট ধরা। তাঁর সামনে টেলিভিশন চলছে। টেলিভিশনে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ধরা। কী অবাক কাণ্ড! সোফার ওই জায়গায় কিছুক্ষণ আগেই তিনি সেই লোকটাকে দেখে যান। চোখের পলকে অদলবদল হয়ে লোকটার অবস্থানে তিনি আর স্টাডিরুম ফাঁকা! স্টাডিরুমে কেউ নেই!

গতকালও এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। লোডশেডিং-এর সময় তিনি ছাদে ওঠেন পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তাঁর খুব ভাল লাগে। যুবক বয়সে কত পূর্ণিমা রাত সারা রাতই ছাদে কাটিয়েছেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই। ছাদে উঠে দেখেন সেই লোকটা ছাদে বসে আছে। সেও গভীর আগ্রহে চাঁদ দেখছে।

লোকটাকে দেখে আজাদ সাহেবের প্রচণ্ড রাগ লাগে। তিনি ঝাঁঝের সাথে বলেন, 'আপনার হাত থেকে কি এ বাড়ির কোথাও নিস্তার নাই?'

লোকটাও ঝাঁঝের সাথে বলে, 'এ দেখি ভূতের মুখে রাম নাম। আমার একাকী জীবনে হঠাৎ-হঠাৎ বিষ ফোঁড়ার মত উপস্থিত হয়ে এখন আবার আমার থেকেই নিস্তার চাচ্ছেন?'

আজাদ সাহেব গলার স্বর কিছুটা কোমল করে বলেন, 'বিষ ফোঁড়া আমি না আপনি?'

লোকটা অনুনয় করে বলে, 'আপনাকে হাত জোড় করে বলছি, আপনি আমাকে রেহাই দিন। আর যন্ত্রণা বাড়িয়েন না। আপনার যন্ত্রণায় আমি তো পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

আজাদ সাহেব বলেন, 'আমি আপনাকে পাগল বানাচ্ছি না আপনি

BanglaBook.org

আমাকে পাগল বানাচ্ছেন? হঠাৎ-হঠাৎ আপনিই তো কীভাবে যেন আমার বাড়িতে এসে...'

আজাদ সাহেবের বলা শেষ করতে না দিয়েই লোকটা বলে ওঠে, 'কে কার বাড়িতে এসে উপস্থিত হচ্ছে, কে সত্যি কে ভ্রান্তি, এই একই তর্ক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে আর ভাল লাগছে না। আমি নির্বিরোধী সাদাসিধা শিক্ষক মানুষ, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ছাদে উঠে নিরিবিলিতে মন ভরে একটু পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে বসেছি, দয়া করে আপনি এখন এখান থেকে যান।'

আজাদ সাহেব বলেন, 'আমিও তো ছাদে উঠেছি চাঁদ দেখব বলে। এসে দেখি কোথা থেকে যেন আপনি এসে আগেই হাজির।'

লোকটা বলে, 'ঠিক আছে, তাহলে আমি ছাদ থেকে নেমে যাচ্ছি। আমি নীচে গিয়ে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসছি। আপনি মন ভরে চাঁদ দেখে বিদেয় হন।'

লোকটা নীচে নেমে যায়। আজাদ সাহেব ক্ষুব্ধ মনে ছাদে বসে থাকেন। পূর্ণিমা চাঁদ আর তখন তাঁকে তেমন টানছিল না। তাঁর মত চেহারার অদ্ভুত লোকটা তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিয়েছে।

ধীরে-ধীরে চাঁদটা মেঘে ঢেকে যায়। চারদিক গ্রাস করে গাঢ় অন্ধকার। সেই সাথে আজাদ সাহেব অনুভব করেন তিনি আর ছাদে নেই। তিনি বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসা। অথচ বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসবে বলে কিছুক্ষণ আগে ছাদ থেকে নেমেছে সেই লোকটা। আবার অদলবদল হয়ে গেছেন। নিমেষে ছাদ থেকে তিনি লোকটার অবস্থানে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চলে গেছেন।

এভাবে হরহামেশা আজাদ সাহেবের সাথে লোকটার দেখা হচ্ছে আর লোকটার সাথে তিনি অদলবদল হয়ে যাচ্ছেন। যেন তিনিই লোকটা, লোকটাই তিনি!

আজাদ সাহেব দোটানায় ভুগছেন। কখনও তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, যা ঘটছে তা সত্যি সত্যিই। কখনও মনে হচ্ছে সবই তাঁর মনের ভ্রান্তি। লোকটা সত্যি নয়। লোকটার কোনও অস্তিত্বই নেই। তাঁর মন লোকটাকে

BanglaBook.org

তৈরি করে নিচ্ছে। তিনি জটিল মানসিক সমস্যায় পতিত হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত আজাদ সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবেন। সাইকিয়াট্রিস্টের চিকিৎসা কোনও কাজে আসুক আর নাই আসুক, অন্তত তিনি তাঁর সমস্যাটা নিয়ে একজন নির্ভরযোগ্য লোকের সাথে মন খুলে আলাপ করতে পারবেন।

পাঁচ

আজাদ সাহেব গ্রীনরোডের এক সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারের ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে আছেন। সাইকিয়াট্রিস্টের নাম ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী। একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। বিভিন্ন মানসিক রোগীতে লাউঞ্জ ভর্তি।

ওয়েটিং লাউঞ্জে প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর আজাদ সাহেব ভিতরে ঢোকার ডাক পেলেন। ভিতরে ঢুকে ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরীর মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন।

ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী আজাদ সাহেবকে তীব্র চোখে পর্যবেক্ষণ করছেন, সেটা লক্ষ করলেন আজাদ সাহেব। সালাহউদ্দিন চৌধুরীর বয়স বোধহয় ষাটের কোঠায়। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রঙ। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। উঁচু নাক। মাথায় কাঁচা-পাকা কদম ছাঁট চুল। মুখ ভর্তি ছোট্ট করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি। চোখে গোল্ড রিমের চশমা। চশমার ভিতরে বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চোখ।

ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী ভারী গম্ভীর কণ্ঠে প্রথমে আজাদ সাহেবের নাম, বয়স, পেশা, পরিবারে কজন সদস্য, জীবন-যাপন পদ্ধতি, বংশের কেউ মানসিক রোগী ছিল কিনা বা রয়েছে কিনা, ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা বা শারীরিক অন্যান্য কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা জেনে নিয়ে মূল সমস্যা জিজ্ঞেস করলেন।

আজাদ সাহেব তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া সব কিছু প্রথম থেকে

BanglaBook.org

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করলেন। ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী আগ্রহী শ্রোতার মত কথার মাঝে কোনও প্রশ্ন না করে আজাদ সাহেবের বলা সব কিছু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন আগে থেকেই জানতেন রোগী কী বলবেন।

আজাদ সাহেবের বলা শেষ হবার কিছুক্ষণ পর ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মত চেহারার লোকটার সাথে কি শুধু আপনার বাড়িতেই দেখা হয়? নাকি অন্য কোথায়?'

আজাদ সাহেব বললেন, 'শুধু বাড়িতেই, অন্য কোথাও দেখা হয় না।'

'লোকটার গায়ে আর আপনার গায়ে তখন একই রকমের পোশাক থাকে বলেছেন, দেখা হবার প্রতিবারই কি?'

'হ্যাঁ, প্রতিবারই লোকটার গায়ে আর আমার গায়ে একই রকমের পোশাক থাকে।'

'আপনি লোকটার সাথে নাকি আপনার হুবহু মিল খুঁজে পেয়েছেন। শুধু মিল খুঁজেই পেয়েছেন, কোনও অমিল কি খুঁজে পাননি?'

'না, কোনও অমিল পাইনি।'

'ভাল ভাবে ভেবে বলুন। ভাবার জন্য আপনাকে দুই মিনিট সময় দিলাম।'

দুই মিনিট না পেরুতেই আজাদ সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, কিছু কিছু অমিল আছে। আমি মাথার বাম পাশে চুলের সিঁথি করি, লোকটার চুলের সিঁথি ডান পাশে। আমার গালের ডান পাশের বড় এই তিলটা, লোকটার গালের বাম পাশে। আমার ডান হাতের অনামিকার এই আংটিটা, লোকটার বাম হাতের অনামিকায়।'

'আপনি যা বলছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা দেখতে আপনাকে আয়নায় যেমন দেখায় তেমন। অর্থাৎ মিরর ইমেজ। আচ্ছা সেই লোকটার সাথে আপনি অদলবদল হয়ে যাবার পর কি আপনার চুলের বাম পাশের সিঁথি ডান পাশে, ডান গালের তিল বাম গালে, এমন দেখেন?'

'না, আমি আমার মতই থাকি।'

ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী আর কোনও প্রশ্ন না করে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখতে লাগলেন। লেখা শেষে প্রেসক্রিপশনটা আজাদ

BanglaBook.org

সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই ওষুধগুলো নিয়ম মাফিক খাবেন। এক মাস খাওয়ার পরেও যদি সমস্যা থেকেই যায় তা হলে আবার আমার কাছে আসবেন। ওষুধ পরিবর্তন করা হবে। প্রয়োজনে সাইকোথেরাপি দেয়া হবে।'

আজাদ সাহেব প্রেসক্রিপশনটা হাতে নেবার পর ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী নড়েচড়ে বসে আবার বলতে লাগলেন, 'আপনার সমস্যাটা সম্পূর্ণ মনের। আপনার অবচেতন মন আপনার মত চেহারার সেই লোকটাকে সৃষ্টি করছে। আপনি সারাক্ষণ একা-একা থাকেন বলে আপনার অবচেতন মন আপনার প্রতিবিম্ব দিয়েই একটা সঙ্গী তৈরি করে নিয়ে তার সাথে গল্প করছে, তর্ক করছে, মান-অভিমান করছে...এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ঘটছে ঘুমের মধ্যে। আপনার ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস রয়েছে। যেহেতু আপনি বাড়িতে একা থাকেন তাই কারও চোখে সেই অভ্যাস ধরা পড়ছে না। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই অভ্যাসকে সমনামবিউলিজম বলে। অর্থাৎ বাংলায় স্বপ্নচারিতা। ঘুমের ঘজউগ পর্যায়ে এটা ঘটে। ঘুমের মধ্যে নিজের অজান্তে আপনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যান। এবং সেই মুহূর্তে আপনি আপনার মত চেহারার সেই লোকটাকে অর্থাৎ আপনার প্রতিবিম্বকে স্বপ্নে দেখেন। ঘুম ভাঙার পরে নিজেকে আবিষ্কার করেন স্বপ্নে লোকটাকে যে জায়গায় দেখেছেন সেই জায়গায়। এ থেকে ধারণা করেন লোকটার সাথে আপনি অদলবদল হয়ে গেছেন। সমনামবিউলিজম অবস্থায় মন ঘুমিয়ে থাকলেও দেহ থাকে অতি মাত্রায় সক্রিয়। কারও কারও ক্ষেত্রে মনেরও কিছু অংশ থাকে সক্রিয়। সব মিলিয়ে বলা যায় তখন ঘুম-জাগরণের মিলিত ঘোর অবস্থা। সেই ঘোরের মাঝে হাঁটা, ফ্রিজ খুলে কোনও খাবার খেয়ে নেওয়া, পানি খাওয়া, টয়লেটে যাওয়া, ছাদে উঠে যাওয়া, টেলিভিশন দেখা...সবকিছু খুবই নিখুঁতভাবে করা হয়। অথচ সে সময় আপনার সমস্ত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় স্বপ্ন দ্বারাই। আর সেই স্বপ্ন দৃশ্যে আপনার সঙ্গে থাকে আপনার নিজের প্রতিবিম্ব লোকটা। প্রেসক্রিপশনে দেওয়া ওষুধগুলো নিয়মিত খেয়ে যান আর সেই সাথে নিজের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করুন। সারাক্ষণ একা-একা না থেকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিশুন। মনকে প্রফুল্ল রাখুন। হাসি-তামাশা

BanglaBook.org

করুন। সবচেয়ে ভাল হয় একটা বিয়ে করে ফেললে। কনফার্ম ব্যাচেলর অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মাঝ বয়সের পর এ ধরনের কোনও মানসিক সমস্যায় পড়ছেন।'

আজাদ সাহেব ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে মেইন রোডে এসে বাসায় ফেরার জন্য একটা খালি ট্যাক্সি ক্যাব বা একটা সিএনজি ধরার চেষ্টা করছেন, এমন সময় তাঁর সামনে এসে একটা সাদা টয়োটা করোলা থামল। গাড়ির পিছনের জানালা খুলে গেল। খোলা জানালা দিয়ে মাথা বের করল তাঁর বোন আফরোজার হাসবেণ্ড রফিকউল্লাহ।

রফিকউল্লার মাথায় গোল টুপি, চোখে সুরমা, লম্বাটে মুখমণ্ডলের থুতনিতে একগোছা ছাগুলে দাড়ি, পানের রস মাখা টুকটুকে লাল ঠোঁট। সব মিলিয়ে চেহারায় কেমন ধূর্ত ভাব। রফিকউল্লাহ বিভিন্ন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ম্যান পাওয়ারের ব্যবসা করে। ধান্ধাবাজ প্রকৃতির লোক। আজাদ সাহেব রফিকউল্লাহকে তেমন একটা পছন্দ করেন না।

রফিকউল্লাহ পিচ করে রক্তের মত লাল রঙের পানের পিক রাস্তায় ফেলে হাসি মুখে বলল, 'স্লামালিকুম, ভাইজান, এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?'

আজাদ সাহেব বললেন, 'এই একটু ডাক্তার দেখাতে।'

রফিকউল্লাহ গলায় কৃত্রিম উদ্বিগ্ন ভাব এনে বলল, 'ডাক্তার দেখাতে! ভাইজান, আপনার কি অসুখ হয়েছে?!'

'না, তেমন কিছু নয়।'

'তা আমাদের একটু জানাবেন না! আমাকে না হলেও আপনার একমাত্র ছোট বোনকে তো জানাবেন। ঢাকা শহরের বড়-বড় সব ডাক্তার আমার পরিচিত। আগে জানলে আমি আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম। ডাক্তারগুলো তো সব বদের বদ। শুধু টাকা কামাবার মতলব। পরিচিত না হলে যেনতেন ভাবে রোগী দেখে এক গাদা ওষুধ লিখে দেয়। কারণ প্রত্যেক হারামজাদাই তো ওষুধ কোম্পানির টাকা খেয়ে বসে থাকে। তা আপনি কোন্ ডাক্তারকে দেখিয়েছেন? ভাল ভাবে দেখেছে তো? না হলে আমার সঙ্গে আবার চলেন। হারামজাদাকে এমন ধমক দিমু, হারামজাদা

BanglaBook.org

প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলবে।'

আজাদ সাহেব বললেন, 'ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরীকে দেখিয়েছি।'

ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরীর নাম শুনে রফিকউল্লাহ চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে তো পাগলের ডাক্তার!! তার কাছে আপনি গিয়েছেন কী করতে!?'

আজাদ সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললেন, 'আফরোজা, জেনি ওরা কেমন আছে?'

'মাশাল্লাহ! আপনার দোয়ায় তারা ভালই আছে। আপনার বোন তো দিনে দিনে ফুলে-ফেঁপে ছোট-খাটো হাতির আকৃতি নিচ্ছে।'

রফিকউল্লার কথা শুনে আজাদ সাহেব মনে-মনে বললেন, 'আমার বোন তো হাতি হয়ে যাচ্ছে আর তুই তো ব্যাটা ছাগল হয়ে যাচ্ছিস। যেনতেন ছাগল নয় একেবারে রাম ছাগল। সবে তো রাম ছাগলের মত থুতনিতে এক গোছা দাড়ি রেখেছিস আর ছাগলের জাবর কাটার মত সারাক্ষণ পান চিবাস। ধীরে-ধীরে মাথায় শিংও গজাবে।'

আজাদ সাহেবকে চুপ করে থাকতে দেখে রফিকউল্লাহ জিজ্ঞেস করল, 'ভাইজান, আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'বাসায় যাব।'

'আমার সাথে চলেন। আমিও ওদিকে যাচ্ছি। নিউ মার্কেটে এক লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে নিউ মার্কেট নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

আজাদ সাহেব গাড়ির পিছনে রফিকউল্লার পাশের সিটে বসলেন। রফিকউল্লাহ অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছে, '...ভাইজান, আপনারা যারা সরকারি চাকরি করেন আপনাদের হচ্ছে মহা শান্তির জীবন। নয়টা-চারটা অফিস করে বাসায় ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুম। আহ, কী আরাম! আর আমার মত ব্যবসায়ীগো মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। যারা ব্যবসা করে তাদের প্রত্যেকের উচিত গুতে চাটা দিয়ে ব্যবসায় নামা। সারাদিন নানান ধরনের মানুষের সাথে সত্য-মিথ্যা হাজার কথা বলতে হয়। কোন চালে একটু ভুল করেছি তো পাছায় দশ হাত লম্বা আইক্কা (বাঁশের গাঁট) সহ বাঁশ ঢুকে যায়। তখন না পারি সেটা বাইর করতে না পারি অন্য কিছু করতে।

BanglaBook.org

যত নড়াচড়া করি তত চিরতে-চিরতে যায়। শালার ব্যবসা। মাঝে-মধ্যে রাতের ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়...'

রফিকউল্লার কথা আজাদ সাহেবের কান স্পর্শ করলেও মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। তিনি চলন্ত গাড়িতে গভীর ভাবে ভাবছেন সাইকিয়াট্রিস্টের বলা কথাগুলো। সাইকিয়াট্রিস্ট যা বলেছেন সেটাই কি সত্যি? সত্যিই কি তাঁর মত চেহারার লোকটা তাঁর অবচেতন মনের একটা খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়? লোকটাকে তাঁর অবচেতন মনই সৃষ্টি করছে? নাকি অন্য কিছু? সেই অন্য কিছুটা কী? এমনও তো হতে পারে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে, কোনও এক উপায়ে প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে লোকটা আসছে। প্যারালাল ইউনিভার্স বলে যদি কিছু থেকেই থাকে সেই ইউনিভার্স তো হবে এই ইউনিভার্সেরই প্রতিবিম্ব। সেই ইউনিভার্সের প্রতিটা জিনিসই হবে এই ইউনিভার্সের প্রতিবিম্ব। এমন কী প্রতিটা মানুষও। সাইকিয়াট্রিস্ট তো প্রমাণ করে দিয়েছেন লোকটা তাঁরই প্রতিবিম্ব। নাকি ওসব কিছু না, স্রেফ ভৌতিক ব্যাপার? কোনও দুষ্ট জিন তাঁর মত রূপ ধারণ করে তাঁর সাথে দেখা দিচ্ছে। কারণ জিনেরা তো যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে...

ভাবতে-ভাবতে আনমনে আজাদ সাহেব বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'একজন লোক কি দুজন হতে পারে?'

হড়বড় করে কথা বলতে থাকা রফিকউল্লাহ আজাদ সাহেবের কথা শুনে থমকে বলল, 'কী বললেন, ভাইজান? একজন লোক দুজন মানে?'

আজাদ সাহেব বললেন, 'একই রকম চেহারার দুজন লোক কি হতে পারে?'

রফিকউল্লাহ বিজ্ঞের মত বলল, 'কেন হবে না। যমজদের দেখেননি। যমজদের চেহারা তো মাঝে-মাঝে হুবহু একই রকম হয়।'

আজাদ সাহেব বললেন, 'আমি যমজদের কথা বলিনি। তা ছাড়া শুধু চেহারাই এক তাই না। দুজনের চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ, জানা তথ্য, স্মৃতি, সামাজিক অবস্থান, নাম, বয়স, পরিচয়... সমস্ত সত্তাই হুবহু এক। মোদ্দা কথা একজন আরেকজনের কপি।'

BanglaBook.org

রফিকউল্লাহ আজাদ সাহেবের কথা শুনে মিনমিন করে বলল, 'না, ভাইজান, এমন কথা আগে শুনিনি! তবে আপনি বললে হতেও পারে। আপনি জ্ঞানী মানুষ। একজন মানুষ শুধু দুজন ক্যান দশজনও হতে পারে। ফটোকপির মত।'

রফিকউল্লাহ মনে-মনে বলছে ভিন্ন কথা, 'আরে, বুড়া খাটাস, তোর মত বুড়া খাটাস সারা দুনিয়ায় একটাই।'

রফিকউল্লার ছোট বোন একটা কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করে। বয়স পঁয়ত্রিশ। চেহারা তেমন ভাল নয়। রফিকউল্লার মত। লম্বাটে মুখমণ্ডল। গায়ের রঙ ময়লা। তাই এখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। বোনের বিয়ে নিয়ে রফিকউল্লাহকে খুবই চিন্তিত দেখে একদিন তার স্ত্রী আফরোজা একটা প্রস্তাব দিয়ে বসে। আফরোজা প্রস্তাব দেয় তার ভাই আজাদ সাহেবের সাথে রফিকউল্লার বোনের বিয়ে দিতে। সেই প্রস্তাব শুনে রফিকউল্লাহ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে, 'দরকার হলে বোনকে কেটে টুকরো-টুকরো করে, নিউ মার্কেটের মাংসের দোকানে বিক্রির জন্য রেখে আসমু। তবু তোমার ওই বুড়া খাটাস ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিমু না।' এর পর থেকে আজাদ সাহেবকে দেখলে রফিকউল্লার মনে হয় সত্যিই লোকটাকে কেমন বুড়ো খাটাসের মতই লাগে। লোকটা বুড়ো খাটাসের মতই কেমন কুঁজো হয়ে গেছে। নাকের নীচের গোঁফও খাটাসের মত। বুড়া খাটাস নাম দিয়ে সে একেবারে ভুল করেনি।

খুব ভোরবেলা ঘন-ঘন কলিং বেলের শব্দে আজাদ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। আজাদ সাহেবের খুব রাগ লাগল এত ভোরবেলায় তাঁকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য। তিনি মনে-মনে ভাবলেন, যে এসেছে তাকে কড়া ভাষায় একটা ধমক দেবেন।

ঘুম জড়ানো চোখে তিনি বাসার সদর দরজা খুলে দেখেন দরজার সামনে তাঁর ছোট বোন আফরোজা দাঁড়ানো। আফরোজার চোখ লাল, ফোলা-ফোলা। আজাদ সাহেবকে দেখতেই আফরোজা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'ভাইজান, তুমি নাকি পাগল হয়ে গেছ? তুমি নাকি নিয়মিত পাগলের ডাক্তারের চিকিৎসা নিচ্ছ?'

BanglaBook.org

আজাদ সাহেব চোখ ডলতে-ডলতে বললেন, 'কে বলেছে এই সব কথা?'

'জেনির আব্বু। কাল নাকি তুমি জেনির আব্বুর হাতে ধরা পড়েছ?'

'হ্যাঁ, কাল রফিকউল্লার সাথে দেখা হয়েছিল।'

'তুমি নাকি একেকটা মানুষ দশটা করে দেখ?'

'রফিকউল্লাহ আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছে। এমন কিছুই আমি বলিনি।'

'জানো, আমার আইবুড়ো ননদটার সাথে একদিন তোমার বিয়ের কথা তোলার পর থেকে জেনির আব্বু কথায়-কথায় তোমাকে বুড়া খাটাস বলে ডাকে।'

'তাতে কী? খাটাস বলে বাস্তবিক কোনও প্রাণীই নেই। গ্রামের লোকজন বনবিড়ালকে খাটাস বলে। আর তুইও বা কোন্ আক্কেলে ওর বোনের সাথে আমার বিয়ের কথা বলতে গেলি?'

'তাই বলে ও তোমাকে বনবিড়াল বলবে! বনবিড়াল-বনবিড়াল বুড়া বনবিড়াল!!! ওর বোনের যে শ্রী! দু'দিন পরে রাস্তার কুত্তাও আর ওর বোনের দিকে ফিরে তাকাবে না।' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে আফরোজা আরও বলে, 'ভাইজান, তুমি একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো। বিয়ে না করে থাকলেই লোকজন এমন নানান দুর্নাম রটায়।'

ছয়

টানা এক মাস ধরে সাইকিয়াট্রিস্টের দেওয়া ওষুধ খেয়েও কোনও লাভ হয়নি আজাদ সাহেবের। বরং সমস্যা আরও বেড়েছে। তাঁর মত চেহারার সেই লোকটা আগে শুধু রাতে এসে উপস্থিত হত। প্রথম দিকে শুধু ঝড়-বৃষ্টির বিদ্যুৎবিহীন অন্ধকার রাতে। আজকাল দিনে-রাতে যখন-তখন উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয়ে লোকটা উল্টো আজাদ সাহেবকে ঝাড়ি দেয়, 'আপনার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়েছি। তাঁর দেয়া ওষুধ খাচ্ছি। এর পরেও আপনার হাত থেকে রক্ষা

BanglaBook.org

নেই। আপনি ঠিকই যখন-তখন উদয় হচ্ছেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বলে দিয়েছেন আপনি আমার মনের ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নন। আপনার বসবাস আমার অবচেতন মনে। বাস্তবিক আপনার কোনও অস্তিত্ব নেই। হয়তো আমি এখন আপনাকে স্বপ্নে দেখছি, যা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আমি আপনাকে আর দেখতে চাই না।' এই বলে লোকটা চোখ বন্ধ করে থাকে।

আজাদ সাহেব লোকটার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যান। কারণ লোকটা গড়গড় করে আজাদ সাহেবের মনের কথাই বলে। লোকটা যা বলে আজাদ সাহেব নিজেও লোকটা সম্পর্কে তাই ভাবেন।

আজাদ সাহেব আবার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। সব শুনে সাইকিয়াট্রিস্ট ওষুধ পরিবর্তন করে দেন আর আগেরবারের মতই কিছু উপদেশ দেন, 'আপনার এই সমস্যা থেকে আপনি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারেন। আপনার একঘেয়ে জীবনটা পরিবর্তন করুন। লোকজনের সাথে মিশুন। হাসি-ঠাট্টা করুন। সুন্দর কোনও জায়াগায় বেড়াতে যান। আমি আপনার সমস্যার যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন। মন থেকে ধুয়ে-মুছে ফেলুন ওই লোকটার অস্তিত্ব। দূরে ঠেলে দিন মনের ভ্রান্তি...সবচেয়ে ভাল হয় একজন জীবন সঙ্গিনী জুটিয়ে নিলে।'

আজাদ সাহেব সাইকিয়াট্রিস্টের সাজেশন মত লোকজনের সাথে মিশতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না যার সাথে তিনি মিশবেন। কারণ তাঁর কোনও বন্ধু নেই। একা-একাই তিনি ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। অনেক রাতে বাসায় ফেরেন। ফিরে সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হন। তাঁর মত চেহারার সেই লোকটাও তাঁর মত ক্লান্ত শরীর নিয়ে উপস্থিত হয়। কারণ সে-ও নাকি তাঁর মত সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা-ঘুরি করে বাড়িতে ফিরেছে। এবং সেই লোকটা ঢাকা শহরের যে-যে জায়গায় ঘুরে এসেছে বলে দাবি করে তাও হুবহু আজাদ সাহেবের সাথে মিলে যায়।

সন্ধ্যা সাতটা।

আজাদ সাহেব নিউ মার্কেটে এসেছেন। নিউ মার্কেটের মেইন গেট

BanglaBook.org

দিয়ে ঢুকে হাতের বাম পাশের বইয়ের দোকানগুলোতে তিনি বই ঘাঁটা-ঘাঁটি করছেন। একজন মানুষের মত হুবহু আরেকজন মানুষ–এর উপরে কোনও বই পাওয়া যায় কিনা দেখছেন। 'ডাবল-পার্সোনালিটি' অর্থাৎ একজন মানুষের 'দ্বৈত ব্যক্তিত্ব'-এর উপরে অনেকগুলো বই-ই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একজন মানুষের মত আরেকজন, অর্থাৎ, 'ডুপ্লিকেট-ম্যান' এর উপরে কোনও বই পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি এক দোকান থেকে অন্য দোকানে যাচ্ছেন এমন সময় পিছন থেকে একটি নারী কণ্ঠ ডেকে উঠল, 'এই যে, আজাদ ভাই।' অসম্ভব মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

আজাদ সাহেব পিছন ফিরে দেখেন বেগুনি রঙের জামদানি শাড়ি পরা মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলা হাসি মুখে বললেন, 'আমি ফারজানা। ফারজানা ববি। আপনার বোন আফরোজার বাসায়, আফরোজার মেয়ের বার্থ ডে-তে আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিল।'

আজাদ সাহেব চিনতে পারলেন। এই সেই মহিলা জেনির জন্ম দিনে যাকে দেখিয়ে আফরোজা বলেছিল, ডিভোর্সী, নিঃসন্তান, ধনী এক বাপের এক মেয়ে...যাকে বিয়ে করতে পারলে রাজার হালে থাকা যাবে। জোর-জবর করে পরে আফরোজা মহিলার সাথে পরিচয় করিয়েও দিয়েছিল। সেদিন মহিলার পরনে ছিল নীল রঙের শাড়ি। শাড়ির সাথে ম্যাচ করে স্লিভলেস ব্লাউজ। স্লিভলেস ব্লাউজে সেদিন মহিলাকে কেমন কুস্তিগিরের মত লাগছিল। আজ অবশ্য তেমন লাগছে না। বরং আজ মহিলার চোখে-মুখে এক ধরনের সারল্য দেখা যাচ্ছে।

ভদ্রমহিলা সলজ্জ গলায় আবার বললেন, 'আজাদ ভাই, এখনও কি আমাকে চিনতে পারেননি?'

আজাদ সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।'

'কেমন আছেন, আজাদ ভাই?'

'ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?'

'আমিও ভাল আছি। বই কিনবেন বুঝি? আমিও বই কিনতে এসেছি। আমার গল্প-উপন্যাসের বই পড়ার খুব নেশা। চলুন দুজনে একসঙ্গে বই

BanglaBook.org

খোঁজাখুঁজি করি।'

এক ঘণ্টা ধরে তাঁরা দুজন বইয়ের দোকানগুলোতে ঘোরাঘুরি করলেন। এই এক ঘণ্টায় আজাদ সাহেব আর একটি কথাও বলেননি। ফারজানা ববি একাই অনর্গল কথা বলেছেন। সবই বই বিষয়ক। কোন্ ধরনের বই তাঁর ভাল লাগে। কোন্-কোন্ লেখকের বই ভাল লাগে। কোন্ লেখক কেমন লেখে। জীবনে কোন্ বইটা তাঁর সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে। কোন্ বই পড়ে কান্না পেয়েছে। কোন্ বই পড়ে ফালতু মনে হয়েছে...এই সব। আজাদ সাহেব মাঝে-মাঝে শুধু হুঁ...হ্যাঁ...তাই তো...বলে তাঁর কথার সায় দিয়েছেন। কোনও বাক্যব্যয় করেননি।

এক ঘণ্টা ধরে ঘুরে-ঘুরে এক গাদা বইও কিনে ফেলেন ফারজানা ববি। কিন্তু আজাদ সাহেবের একটি বইও কেনা হয় না।

কেনাকাটা শেষে ফারজানা ববি খুবই আগ্রহী গলায় বললেন, 'আমি যদি আপনাকে কিছু বই গিফট করতে চাই, আপনি নেবেন?'

আজাদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, নেব না।'

'বই না নিলেও আপনাকে কিন্তু রেহাই দিচ্ছি না। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কাটালাম, আমাকে চা বা কফি খাওয়ার অফার করবেন না?'

আজাদ সাহেব আর ফারজানা ববি একটা ক্যাফে কর্নারে ঢুকলেন। ক্যাফে কর্নারের এক কোনার একটা টেবিলে তাঁরা মুখোমুখি বসলেন। ওয়েটারকে ডেকে ফারজানা ববি এক্সপ্রেসো কফির অর্ডার করলেন। আজাদ সাহেবের চেহারায় কিছুটা বিব্রত ভাব।

ফারজানা ববি বললেন, 'আপনি কি জানেন, আপনার বোন আফরোজা, আপনাকে বিয়ে করানোর দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে?'

আজাদ সাহেব ফারজানা ববির কথা শুনে ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

ফারজানা ববি আজাদ সাহেবের হতাশাব্যঞ্জক নিঃশ্বাস ফেলা অগ্রাহ্য করে বললেন, 'যেহেতু আপনাকে বিয়ে করানোর দায়িত্ব আমার ওপরে পড়েছে, তাই আপনাকে আপনার একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারি?'

আজাদ সাহেব নরম গলায় বললেন, 'করুন।'

BanglaBook.org

'আপনি বিয়ে করেননি কেন?'

কোনও সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে আজাদ সাহেব বললেন, 'আসলে আমার যখন বিয়ে করার বয়স হয় তখন অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে আমার বাবা-মা দুজনেই মারা যায়। বাবা-মা মারা যাওয়ায় আমার বিয়ে পিছিয়ে পড়ে। এভাবে এক সময় বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়। তখন আর নিজ থেকেই বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না। যে পুরুষ ব্যাচেলর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায় এক সময় সে বিয়ে করতে ভয় পায়। মনে করে ব্যাচেলর জীবনই সুখের, বিয়ে করলে নানান ঝামেলায় পড়তে হবে।'

'আপনিও কি বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছেন?'

আজাদ সাহেব ফারজানা ববির প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ ঘুরাতে বললেন, 'আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন।'

ওয়েটার এসে দুজনের সামনে ধোঁয়া ওঠা, ফেনা ভরা কফি পরিবেশন করল। ওয়েটার চলে যাবার পর ফারজানা ববি কফির মগে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার সম্পর্কে তো জানেনই, আমি ডিভোর্সী।'

'কী কারণে আপনাদের ডিভোর্স হয়েছিল?'

ফারজানা ববি তাঁর ঝলমলে মুখ অন্ধকার করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপা দিয়ে বললেন, 'আমি বন্ধ্যা। আমি কোনও দিনও মা হতে পারব না, এই জন্যে।'

'আপনার এক্স হাসবেণ্ড সামান্য এই কারণে আপনাকে ডিভোর্স দিল?!'

'আপনার কাছে ব্যাপারটা সামান্য মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই সামান্য। আপনি মা হতে পারবেন না এতে তো আপনার কোনও হাত নেই। এমন তো না যে আপনি ইচ্ছে করে মা হচ্ছেন না। সৃষ্টিকর্তা প্রতিটা নারী-পুরুষকে প্রেম-কাম নামে যে মোহ দিয়ে একত্রিত করছেন তা শুধু মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে। সেখানে সৃষ্টিকর্তাই যদি চান আপনি মা হতে পারবেন না, তাতে আপনার দোষ কোথায়?'

ফারজানা ববি ধরা গলায় বললেন, 'আপনার মত করে বাস্তবে কেউ ভাবে না। সৃষ্টিকর্তাকে টেনেই যদি বলি, তা হলে বলতে হয়—সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন প্রেম-কাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তেমন

BanglaBook.org

প্রতিটি নারী-পুরুষের মধ্যে মা-বাবা হওয়ারও তীব্র বাসনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি নারী চায় মা হতে। প্রতিটি পুরুষ চায় বাবা হতে।'

'আপনারও তো তীব্র বাসনা মা হবার। আপনি কি পারছেন মা হতে? মা না হবার কষ্টটা আপনি কি সারা জীবন ধরে বহন করে বেড়াবেন না? তা হলে আপনার এক্স হাসবেণ্ড কেন পারলেন না, আপনার কষ্টটা ভাগাভাগি করে নিতে?'

'তা হয় না। যার কষ্ট তাকেই বয়ে বেড়াতে হয়। আমার অক্ষমতার জন্য সে কেন বাবা ডাক শোনা থেকে সারা জীবন বঞ্চিত থাকবে?'

'আপনি তো আবার বিয়ে করতে চাইছেন। এবারে যার সাথে আপনার বিয়ে হবে সেও তো চাইবে বাবা হতে।'

'আসলে সত্যি কথা বলতে কী, আমি আর চাচ্ছিলাম না বিয়ে করতে। আমার এই অভিশপ্ত জীবনটা নিয়ে একা-একাই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর আমাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। বাড়িতে আমি একা একটা মেয়ে মানুষ থাকি বলে, লোকে বিভিন্ন ধরনের আজেবাজে দুর্নাম রটায় আমার নামে। এমনকী আমার গাড়ির ড্রাইভার, বাড়ির দারোয়ান, পুরুষ কাজের লোকদের জড়িয়ে পর্যন্ত আজেবাজে কথা রটাতে ছাড়ে না। দূরের লোকজন নয়, আমার আত্মীয়-স্বজনরাই আমার সম্পর্কে এমন দুর্নাম করে। বাধ্য হয়ে বদনামের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই আবার বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে তাকে আগে থেকেই জানাব আমি যে বন্ধ্যা। আমি যে কোনও দিনও মা হতে পারব না। সব কিছু জেনেও কেউ যদি বিয়ে করতে রাজি হয় তা হলে আপত্তি কোথায়।'

'আপনি বন্ধ্যা, এটা জেনেই কি ডিভোর্সের পরে এত দিনেও আপনার বিয়ে হচ্ছে না?'

'ঠিক তা নয়। ডিভোর্সী, বন্ধ্যা শুনে বরং অনেকেই আরও বেশি আগ্রহী হয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছে। আমিই রাজি হই না। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই চোখ দেখি লোভে চকচক করছে। তারা মূলত আমাকে বিয়ে করতে চায় না, তারা চায় আমার ধন-সম্পদ।'

আজাদ সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কথায়-কথায় অনেক

BanglaBook.org

রাত হয়ে গেছে। এবারে তো ওঠা দরকার।'

ফারজানা ববি বললেন, 'কোথায় অনেক রাত! সবে তো সোয়া নয়টা বাজে। একা মানুষ, এত জলদি বাসায় গিয়ে কী করবেন? তার চেয়ে আরও কিছুক্ষণ গল্প করি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। যত রাতই হোক আমার গাড়ি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে।'

আজাদ সাহেব বললেন, 'বাসায় গিয়ে আমাকে রান্না করতে হবে। আমার কোনও কাজের লোক নেই। তাই নিজের খাবার নিজেকেই রান্না করতে হয়। আমি আবার হোটেলের রান্না খেতে পারি না।'

ফারজানা ববি হাসি মুখে বললেন, 'আজ রাতে আপনাকে আর রান্না করতে হবে না। হোটেলেও খেতে হবে না। আমার বাসায় চলুন। আমার বাসা থেকে রাতের খাওয়া সেরে ফিরবেন।'

আজাদ সাহেব ইতস্তত গলায় বললেন, 'না, তা হয় না। এটা কেমন দেখায়!'

'কেন হয় না? চলুন বলছি। না গেলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। মাঝ বয়সী এক মহিলাকে আপনার পাশে বসে কাঁদতে দেখলে, লোকজন কিন্তু আপনার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবে।'

সাত

ফারজানা ববির ধানমণ্ডির বাসা থেকে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আজাদ সাহেবের বাসায় ফিরতে-ফিরতে রাত সোয়া বারোটা বেজে যায়। বাসায় ফিরেই তিনি শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে, লুঙ্গি পরে, দাঁত ব্রাশ করে শুয়ে পড়েন।

আজাদ সাহেবের চোখে ঘুম আসছে না। তাঁর মনটা আজ কেমন প্রফুল্ল-প্রফুল্ল লাগছে। ঘুরে-ফিরে তাঁর ভাবনায় শুধু ফারজানা ববি আসছেন। তিনি চোখ বন্ধ করে ফারজানা ববিকে নিয়ে ভাবছেন। ফারজানা ববিকে নিয়ে ভাবতে তাঁর খুব ভাল লাগছে। ভদ্রমহিলার আচার-ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। ভদ্রমহিলার মধ্যে কোনও ভণিতা নেই, সোজা-

BanglaBook.org

সাপটা সদালাপী হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। কত বড় ধনী মহিলা, কিন্তু এতটুকু অহংকার নেই তাঁর মধ্যে! বরং নিজের বন্ধ্যাত্ব নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। আজাদ সাহেবের ভদ্রমহিলার এক্স হাসবেণ্ডের কথা ভেবে খুব রাগ লাগছে। কী নিষ্ঠুর একটা লোক! এমন মিষ্টি একটা বউকে, কেউ শুধু বন্ধ্যাত্বের কারণে ডিভোর্স দেয়? লোকটা একটা জানোয়ার! যে নারী জীবনে কোনও দিন মা হতে পারবে না এই যন্ত্রণায় এমনিতেই কাতর, তাকে ডিভোর্স দিয়ে আরও এক সমুদ্র কষ্ট দেয়ার কোনও মানে হয়? স্বামী হিসেবে না হোক লোকটার উচিত ছিল একটা মানুষ হিসেবে হলেও সারা জীবন পাশে থাকা...

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আজাদ সাহেবের মনে হলো তিনি বিছানায় একা শোয়া নন, তাঁর ডান পাশে আরও একজন কেউ শুয়ে আছে। তিনি চোখ খুলে ডান পাশে তাকিয়ে ভীষণ রকমের চমকে লাফ দিয়ে উঠে বিছানায় বসলেন। ডিম লাইটের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিছানার ডান পাশে তাঁর মত চেহারার সেই লোকটা শোয়া। লোকটার চেহারায় কেমন উৎফুল্ল ভাব। লোকটারও চোখ বন্ধ ছিল। আজাদ সাহেব লাফ দিয়ে উঠে বসায় লোকটা চোখ খোলে। চোখ খুলে আজাদ সাহেবকে দেখে চমকে উঠে বলল, 'আজকেও আপনি এসেছেন! সন্ধ্যা থেকে ফারজানা ববির সাথে আড্ডা দিয়ে আজ আমার মনটা খুব প্রফুল্ল, তাই ভেবেছিলাম আজ আর অন্তত আপনি আসবেন না। আপনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনও উপায়ই নেই!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে লোকটা আবার বলল, 'বুঝেছি, আপনার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাকে বিয়ে করতে হবে। একা-একা থাকি বলেই আপনি আমার অবচেতন মনে উড়ে এসে জুড়ে বসেন। ঠিক করেছি ফারাজানা ববিকেই বিয়ের প্রস্তাব দেব।'

লোকটার কথা শুনে আজাদ সাহেব চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলেন। কী বলছে লোকটা! লোকটা কি তাঁর মনের কথাই বলছে? বোধহয়। কারণ লোকটার আর তাঁর তো একই মন।

সন্ধ্যাবেলা আজাদ সাহেব গিয়ে ফারজানা ববির ধানমণ্ডির বাসায় উপস্থিত হলেন।

BanglaBook.org

আজাদ সাহেবকে দেখে ফারজানা ববি খুব খুশি হলেন। তিনি খুশি হওয়া ঝলমলে গলায় বললেন, 'সত্যিই কি আপনি এসেছেন? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি! আমি তো ভেবেছি সেদিন আপনাকে যেভাবে বিরক্ত করেছি তাতে আপনি আমার থেকে অন্তত একশো হাত দূরে থাকবেন।'

আজাদ সাহেব নার্ভাস ভঙ্গিতে বললেন, 'একা-একা ভাল লাগছিল না। তাই ভাবলাম...'

আজাদ সাহেবকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ফারজানা ববি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'এসেছেন, বেশ করেছেন। আপনার সাথে জমিয়ে আড্ডা দেব। তার আগে বলুন চা না কফি? না, দুটোই?'

'আপনার যেটা পছন্দ।'

'আমি তো মাঝে-মাঝে চা-কফি মিলিয়ে মিক্সচার বানিয়ে খাই। চা-কফির মিক্সচার খাবেন?' প্রশ্নটা করে আজাদ সাহেবের জবাবের অপেক্ষা না করেই ফারজানা ববি গলা উঁচিয়ে 'মর্জিনা...মর্জিনা...' বলে ডাকলেন।

ভিতর থেকে মর্জিনা এসে দাঁড়াল। ফারজানা ববি মর্জিনাকে বললেন, 'আমি যেমন ভাবে চা-কফির মিক্সচার বানিয়ে খাই, তেমন দুই মগ মিক্সচার বানিয়ে আনো তো আমাদের জন্যে।'

'জি, আফা, এক্ষুণি আনতাছি,' বলে মর্জিনা ভিতরে চলে গেল।

ফারজানা ববি আজাদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবারে বলুন আপনি কেমন আছেন? আজ আপনাকে কেমন অন্য রকম লাগছে। চেহারায় চিন্তিত ছাপ। কোনও কিছু নিয়ে কি খুব টেনশন করছেন?'

আজাদ সাহেব সহজ গলায় বললেন, 'না, তেমন কিছু নয়। আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?'

'আগের মতই।'

আজাদ সাহেব ইতস্তত গলায় বললেন, 'আজ আমি একটা বিশেষ কথা বলতে এসেছি। কথাটা ঠিক কীভাবে বলব, ভেবে পাচ্ছি না।'

'ভাবা-ভাবির দরকার নেই, বলে ফেলুন। আমি যেভাবে যা মুখে আসে বলে ফেলি, তেমন ভাবে।'

আজাদ সাহেব কোনও ভণিতা না করে সরাসরি, তবে গলার স্বর কিছুটা অন্য রকম করে বললেন, 'আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'

BanglaBook.org

একটু থেমে গলা খাঁকারি দিয়ে, 'তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

ফারজানা ববি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কী শর্ত?'

আজাদ সাহেব বললেন, 'আপনি যেহেতু কোনও দিনও মা হতে পারবেন না, তাই আপনার এই বিশাল সম্পত্তি ভোগ করার জন্যে আপনার কোনও বংশধর কোনও দিনও এই পৃথিবীতে আসবে না। আমি চাই আপনার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কোনও এতিমখানায় দান করে দিন। আপনার সম্পদ ভোগ করে মা-বাবাহীন কতগুলো এতিম ছেলে-মেয়ে মানুষ হোক। আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী। ঢাকা শহরে আমার একটা ছোট্ট বাড়িও আছে। আশা করি আমার সেই বাড়িতে, আমার আয় দিয়ে, আমাদের দুজনের বাকি জীবনটা স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যাবে।'

আজাদ সাহেবের কথা শুনে ফারজানা ববির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কারণ এর আগে এমন শর্ত জুড়ে দিয়ে কেউ আর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। এর আগে যারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর এই অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া।

পরিশিষ্ট

ঝড়-বৃষ্টির রাত। বিকট শব্দে মেঘের গর্জন আর হাওয়ার হিস-হাস মাতামাতির শব্দে ফারজানা ববির ঘুম ভেঙে গেল। তাঁর স্বামী আজাদ সাহেব তাঁর পাশে সটান হয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন।

ফারজানা ববির কেমন ভয়-ভয় লাগছে। বাড়িতে ফারজানা ববি আর তাঁর স্বামী আজাদ সাহেব দুজন মাত্র লোক। অথচ বারান্দায় চটির পটর-পটর শব্দ তুলে কে যেন হাঁটছে। খক-খক করে লোকটা দু'বার কাশিও দিল। এই তো এখন আবার লোকটা ইজি-চেয়ারটা টেনে বসল। চেয়ার টানার ঘষটানির শব্দ স্পষ্ট পাওয়া গেল।

এমনটা আজকেই প্রথম নয়। বিয়ের পর থেকেই ফারজানা ববি লক্ষ করেছেন মাঝে-মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে বারান্দায়, স্টাডি রুমে, বাথ রুমে, খাবার ঘরে, রান্নাঘরে বা ড্রইংরুমে আর একটা লোকের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এই যেমন এখন বারান্দায় কারও অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে ঠিক তেমন ভাবে। হয়তো রান্নাঘরে চায়ের কাপে চামচ নাড়ার টুং-টাং

BanglaBook.org

শব্দ। হয়তো খাবার ঘরে জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালার শব্দ। হয়তো বাথরুমে কারও হাত-মুখ ধোয়া, গার্গল করার শব্দ। হয়তো স্টাডি রুমে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টানোর শব্দ। হয়তো ড্রইংরুমে লো-ভলিউমে টিভি চালানোর শব্দ...ফারজানা ববি তখন মৃদু স্বরে 'এই... এই... এই শুনছ,' বলে পাশে ঘুমানো তাঁর স্বামীকে ডাকেন। ডাকতে-ডাকতে আলতো হাতে ধাক্কা-ধাক্কিও করেন। কিন্তু কিছুতেই তখন তাঁর স্বামীর ঘুম ভাঙে না। এক সময় তিনি একা-একাই দেখতে যান কে ওখানে? গিয়ে দেখেন, হুবহু তাঁর স্বামীর মত চেহারার একটা লোক সেখানে। যেন তাঁর স্বামীরই ডুপ্লিকেট কপি। লোকটা ফারজানা ববিকে দেখে তাঁর স্বামীর মতই একই ভরাট কণ্ঠে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, তারপর আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। তাই...তুমিও উঠে এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। চলো দুজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্প করে আবার ঘুমাতে যাই।'

আবার ঘুমাতে যাবার পর দেখা যায় বিছানায় ঘুমন্ত যে স্বামীকে ফারজানা ববি রেখে গিয়েছেন, সে আর নেই! সে গায়েব হয়ে গেছে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কবরস্থানের পাহারাদার

মেঘ ডাকার বিকট শব্দে মজিদের তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ খুলে গেল। তার চোখ দুটো টকটকে লাল, ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে, চেহারা ঢুলুঢুলু। দু'আঙুলের মাঝে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া বিড়ির গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে সে প্যাকেট থেকে আর একটা বিড়ি বের করে অলস ভঙ্গিতে ধরিয়ে নিল। পায়ের কাছে পড়ে থাকা আধ খাওয়া চোলাই মদের বোতলটার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বেশ তৃপ্তি বোধ করল।

মজিদ স্থানীয় কবরস্থানের পাহারাদার। সারা রাত ধরে সে কবর পাহারা দেয়। দু'পাশে সারি-সারি কবরের মাঝের কংক্রিটের বাঁধানো রাস্তা ধরে, লাঠি হাতে একটু পর পর চক্কর দিতে হয় তাকে। একবার চক্কর দিয়ে এসে ছোট্ট খুপরির মত টিনের ছাউনির নীচে রাখা কাঠের বেঞ্চিটায় বসে জিরিয়ে নেয়। এখানে ফ্লাস্ক ভর্তি চা থাকে। সেই চা দিয়ে গলা ভিজিয়ে আয়েশ করে বিড়ি টানে। মাঝে-মাঝে গাঁজা ভরা স্পেশাল বিড়ি।

আষাঢ় মাসের মধ্য রাত। আকাশটা মেঘে ঢেকে কেমন গুমোট হয়ে আছে। গুম-গুম করে বিকট শব্দে মেঘ ডাকছে। সেই সাথে থেমে-থেমে বিদ্যুৎ চমকানোর নীলচে ঝিলিক। বোধহয় একটু পরেই তুমুল বেগে বৃষ্টি নামবে।

মজিদের মনটা আজ খুব প্রফুল্ল। আজ পাহারা দিতে আসার আগে চুন্নু ভাইয়ের ঘরে গিয়েছিল সে। চুন্নু ভাই বস্তিতে গোপনে চোলাই মদ বিক্রি করে। বেশ কয়েক গ্লাস চোলাই আজ গিলেছে মজিদ। আসার সময় সাথে করে একটা ভরা বোতল নিয়েও এসেছে। বোতলেরও প্রায় অর্ধেক তরল এরই মধ্যে সাবাড়। অবশ্য প্রতিদিন মজিদ চোলাই খায় না, যেদিন তার রোজগারপাতি বেশি থাকে শুধু সেদিন।

BanglaBook.org

আজ বিকেলে ধনী এক ব্যবসায়ীকে কবর দেয়া হয়েছে এই কবরস্থানে। সেই কবর খোঁড়ার ঠিকা মজিদ নিয়েছিল। লাশ কবরে নামানোর পরে মাটি চাপা দেওয়া পর্যন্ত কাজের ঠিকা হয় পনেরোশো টাকা। বিকেলে ব্যবসায়ীকে কবর দেওয়া শেষে, ব্যবসায়ীর ছেলে ঠিকার টাকার সঙ্গে আরও পাঁচশো টাকা বখশিশ দেয়। অবশ্য সম্পূর্ণ দুই হাজার টাকা মজিদের পকেটে যায়নি। কবর খোঁড়ার কাজে সাথে থাকা আর এক গোরখোদক সবুরকে দিতে হয়েছে সাতশো টাকা।

মজিদ বিড়ির প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে দেখে গাঁজা ভরা বিড়ি ছয়টা আছে। গাঁজা ভরা বিড়ি আজ দশটা এনেছিল। এরই মধ্যে চারটা খাওয়া হয়ে গেছে। মদের নেশাটা ধরে রাখার জন্য বিড়ি একটু বেশিই খেতে হচ্ছে।

মজিদ ফ্লাস্কের মুখে কিছুটা চা ঢেলে নিল। আজ আবার আড়াইশো গ্রাম নোনতা বিস্কিটও এনেছে। চা খাওয়ার আগে দুটো বিস্কিট মুখে পুরে নিল। পেটে তেমন খিদে নেই, তার পরেও চায়ের সাথে নোনতা বিস্কিট খেতে তার খুব ভাল লাগে। আজ চুন্নু ভাইয়ের ওখানে চোলাই খেয়েছে শিক কাবাব দিয়ে। চুন্নু ভাইয়ের ছোকরাটাকে পাঠিয়ে মদিনা রেস্টুরেন্ট থেকে একশো টাকার শিক কাবাব আনিয়েছিল। কী স্বাদ ছিল সেই গরম শিক কাবাবের!

চা শেষ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে বেঞ্চিতে গা এলিয়ে বসল মজিদ। শরীরে আরামদায়ক ঝিমুনি। নিজেকে আজ খুব সুখী-সুখী লাগছে তার। রোজ যদি এমন কিছু বাড়তি টাকা আয় হত, তা হলে মন্দ হত না! কবরস্থান কর্তৃপক্ষ পাহারাদারির বেতন দেয় মাত্র দুই হাজার টাকা! আজকালকার দিনে দুই হাজার টাকায় কী হয়! প্রতি রাতে চা, বিড়ি, গাঁজার পিছনেই তো খরচ হয় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকার মত। তবু ভাল কবর খোঁড়ার কাজ করে মাঝে-মাঝে কিছু বাড়তি টাকা আয় হয়।

মজিদ হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। কবরস্থানের ভিতরে আর একটা চক্কর দিতে হবে। আজকাল আবার লাশ চুরির হিড়িক পড়েছে। প্রায়ই শোনা যায়, এখানে-সেখানে কবর থেকে লাশ চুরি হয়ে গিয়েছে।

মজিদ কবরস্থানের ভিতরের কংক্রিটের বাঁধানো রাস্তা ধরে টলতে-

BanglaBook.org

টলতে হাঁটছে। দু'পাশে সারি-সারি কবর। হাঁটতে হাঁটতে লাঠি দিয়ে রাস্তায় মৃদু আঘাত করে ঠক-ঠক শব্দ করছে। নির্জন-নিস্তব্ধ এই কবরস্থানে লাঠির ঠক-ঠক মনে সাহস এনে দেয়।

মজিদ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কবরস্থানের দক্ষিণ দিকে। কারণ সেদিকে নতুন কবরগুলো। নতুন কবর নিয়েই যত দুশ্চিন্তা। শুধু চোরের ভয় নয়, শিয়াল-কুকুরের ভয়ও আছে।

মজিদ কবরস্থানের দক্ষিণ মাথায় পৌঁছে গেল। টর্চের আলো ফেলে সবকটা নতুন কবর ভাল করে দেখল। নাহ, সব ঠিক আছে। আজ দেওয়া নতুন কবর দুটির একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যবসায়ীর কবরের পাশে আরও একটি নতুন কবর হয়েছে আজ। এই কবরটা দেয়া হয়েছে এশার নামাজের পরে। তখন মজিদ এখানে ছিল না। সবুর করেছে এই কবরের কাজ। সবুরের কাছে শুনেছে, কলেজ পড়ুয়া একটা মেয়ের কবর ওটা।

মজিদ চক্কর শেষে আবার এসে টিনের ছাউনির নীচে বসল। টপ-টপ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে মজিদ ভাবতে লাগল, কী এক অদ্ভুত জীবন তার! রাত কাটাতে হয় কতগুলো মরা মানুষের সাথে। বৃষ্টি ভেজা এমন রাতে, পাতলা কাঁথা গায়ে দিয়ে মিষ্টি একটা বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবার মজাই আলাদা! বউ তো এক সময় তারও ছিল। সোনা বউটার নাম ছিল কুসুম। কুসুমের টানা-টানা চোখ আর ভারী বুক-নিতম্ব তাকে যেন পাগল করে তুলত। তবে বউটাকে মন ভরে আদর করা যেত না। আদর করতে চাইলেই কেমন যেন এড়িয়ে যেত। নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলেই বলত, 'আপনের গাও দিয়া মরা মাইনষের ঘেরান আয়।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠত।

এক রাতে পাহারা শেষে মজিদ ফিরে এসে দেখে কুসুম ঘরে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারে কুসুম বস্তির পাশের ঘরের চটপটিওয়ালা বাবুলের সাথে পালিয়ে ঢাকা গিয়েছে।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো মজিদের। কসুম বাবুলের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার পর পাঁচটা বছর কেটে গেল, মজিদের আর বিয়ে করা হয়নি। তার দিনগুলো কাটছে কবরস্থানকে ঘিরেই। কবর খোঁড়া, লাশ কবরে নামানোর পরে মাটি চাপা দেওয়া আর রাতে কবর পাহারা দেওয়া।

BanglaBook.org

এটাও কী একটা জীবন! গভীর বিস্বাদে ভরে ওঠে মজিদের মন। তীব্র ক্ষোভে বিড়ির গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। প্যাকেট থেকে আর একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে আবার ভাবনার জগতে তলিয়ে যায়। কুসুম যখন ছিল তখন শেষ রাতের দিকে একটু আগেভাগেই সে চলে যেত ঘরে। কুসুম থাকত গভীর ঘুমে তলিয়ে। অনেক ডাকাডাকির পর কুসুম ঘুমের ঘোরেই উঠে দরজা খুলে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। ঘরে ঢুকে মজিদ ঘুমন্ত কুসুমের পাশে বসে, কুসুমের গায়ে টর্চের আলো ফেলে দেখত, কুসুম ব্লাউজ ছাড়া শুধু একটা পাতলা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত কুসুমের পাতলা শাড়ির নীচে ভরাট দুটো বুকের অস্পষ্ট খাঁজ তখন চুম্বকের মত টানত তাকে। মজিদ কুসুমের বুক থেকে ধীরে ধীরে শাড়িটা সরিয়ে ফেলে, টর্চের আলোতে উন্মুক্ত স্তনযুগলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। মনে হত যেন একজোড়া পদ্ম। দুই পদ্মের মাঝে হিংস্র পশুর মত মুখ ঘষতে কী ভাল লাগত! কুসুম ঘুম ভেঙে বিরক্তিপূর্ণ গলায় বলে উঠত, 'আপনে অ্যামন ইবলিসের লাহান করতাছেন ক্যান?'

মজিদ উত্তেজনা মিশ্রিত ফিসফিসে গলায় বলত, 'তোর এই শরীলডা হাছাই মোরে ইবলিস কইরা ফেলছে।'

আজ কুসুম শুধুই স্মৃতি। গত পাঁচ বছরে কুসুমের সাথে আর দেখা হয়নি। কুসুমের কথা ভাবতে-ভাবতে মজিদের মাথাটা তেতে উঠল। কত দিন পদ্ম ফোটা নারী দেহ দেখা হয়নি তার। অদ্ভুত এক অস্থিরতায় ছটফট করতে শুরু করে তার সমস্ত শরীর-মন।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা বোতলের বাকি চোলাইটুকু গলায় ঢেলে, গাঁজা ভরা বিড়ি ধরিয়ে কষে দুই-তিনটা টান দেয়ার পর একটা পরিকল্পনা মাথায় আসায় বেশ ভাল লাগে মজিদের।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। গুড়-গুড় করে মেঘ ডাকার শব্দের সাথে একটু পর-পর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মজিদ প্যাকেটের শেষ বিড়িটার গোড়া ছুঁড়ে ফেলে, লুঙ্গিটা মালকোচা দিয়ে, বেঞ্চির নীচে রাখা কোদালটা কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে, টর্চটা হাতে হনহন করে যেতে থাকে কবরস্থানের দক্ষিণে মাথার দিকে, যেখানে নতুন কবরগুলো।

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীর কবরের পাশের কলেজ পড়ুয়া মেয়েটির কবরের মাটি কোদাল দিয়ে কেটে-কেটে কবরটি খুঁড়তে লাগল মজিদ।

থেমে-থেমে বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে অতি দ্রুততার সাথেই কবরটা খোঁড়া হয়ে গেল। এক এক করে কবরের বাঁশের টুকরোগুলো উঠিয়ে উপরে এক পাশে রাখল মজিদ। লাশটা এখন দেখা যাচ্ছে। কবরে সামান্য পানি জমেছে। সেই পানিতে লাশের গায়ের কাফনের কাপড় ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে।

লাশের মুখের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে, মাথার চুল জড়িয়ে বাঁধা ছের বন্দ নামক কাপড়ের টুকরোটা খুলে ফেলল মজিদ। মেয়েটির মাথায় অনেক চুল। খোলা চুলগুলো কাদা পানিতে ছড়িয়ে পড়েছে। কী দারুণ সুন্দর মেয়েটি! কিছুটা যেন কুসুমের মত! বিদ্যুৎ চমকানোর নীল আলোতে মজিদের কাছে মনে হচ্ছে মেয়েটা যেন ঘুমিয়ে আছে গভীর ঘুমে। কুসুম যেভাবে ঘুমিয়ে থাকত ঠিক তেমন।

লুঙ্গির কোঁচায় গোঁজা টর্চটা বের করে লাশের গায়ে আলো ফেলে, বুকের উপর থেকে সিনা বন্দ নামক কাপড়টা সরিয়ে ফেলে, গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল মজিদ। ঠিক যেন কুসুমের মত ভরাট দুটো স্তন! উত্তেজনায় মজিদের চোখ চকচক করছে। মাথা নুইয়ে লাশের বুকের আরও কাছাকাছি চলে গেল সে। আতরের তীব্র গন্ধ নাকে লাগছে তার।

যেই মুহূর্তে মজিদ ভাবল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে মুখটা গুঁজে দেবে লাশের দুই বুকের মাঝে, ঠিক তখন আচমকা লাশের হাত দুটো লাফিয়ে উঠে তার গলা প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় চেপে ধরল। মজিদের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ল কবরের জমে থাকা পানিতে।

দু-হাতে টেনে গলা চেপে ধরা লাশের হাত দুটো সরাতে চায় মজিদ। কিন্তু এক চুলও সে সরাতে পারল না লাশের হিমশীতল হাত দুটো। লাশের হাত দুটো যেন পাথরের মত সেঁটে গেছে।

হাঁস-ফাঁস করতে করতে মজিদের গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ করে এক ধরনের দমবন্ধ হওয়া শব্দ বেরুতে থাকে। সেই সাথে নাক-মুখ দিয়ে ভলকে-ভলকে রক্ত।

আবার প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝড়ের তীব্র দাপটে কবরের উপরে

BanglaBook.org

রাখা বাঁশের টুকরোগুলো এক এক করে সারিবদ্ধ ভাবে ঢেকে দিল মজিদকে সহ লাশটি। আর কোনও এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় কবরের দু'পাশে স্তূপ করে রাখা মাটিগুলোও ধীরে ধীরে ঢেকে দিতে থাকল কবরটি।

মজিদকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবাই ভেবে নেয় মজিদ হয়তো কুসুমের খোঁজে কাউকে কিছু না বলে ঢাকা গিয়েছে।

কবরস্থানের নতুন পাহারাদার রাখা হয়েছে। নতুন পাহারাদারের নাম সালাম। সালামও মজিদের মত গভীর রাতে টর্চের আলো ফেলে কবরস্থানের মাঝের কংক্রিটের বাঁধানো রাস্তা ধরে লাঠির ঠক-ঠক শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়।

প্রতি রাতে সালাম দক্ষিণ মাথার একটা কবরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। কারণ তার কাছে মনে হয় সেই কবরটার ভিতর থেকে ক্ষীণ ভাবে গোঁ-গোঁ ধরনের এক জাতীয় শব্দ হয়। কারও গলা চেপে ধরলে হাঁস-ফাঁস করতে করতে গলা থেকে যেমন গোঁ-গোঁ শব্দ বের হয় ঠিক তেমন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্বপ্নপুরুষ

আজকাল রাত যত বাড়তে থাকে ফারজানার বুকের ধুক-ধুক করাটাও তত বাড়তে থাকে। রাতে ঘুমাবার কথা মনে করলেও ঘুম আরও চটে যায়। একটা কুৎসিত নোংরা স্বপ্ন রাতের পর রাত তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অশ্লীল স্বপ্নও বলা যায়, স্বপ্ন যে এতটা অশ্লীল হতে পারে তা ভাবা যায় না। কাউকে এ স্বপ্নের কথা বলাও যায় না, বললে ফারজানাকেই সবাই অসভ্য ভাববে। ভাববে মেয়েটার মনে আজে-বাজে চিন্তা তাই এই ধরনের বাজে স্বপ্ন সে দেখে। এই স্বপ্নটা দেখার আগে, ফারজানা এ ধরনের ব্যাপার কল্পনাও করেনি। ফারজানা ভেবে পাচ্ছে না কী করে এই স্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পাবে? এই কুৎসিত স্বপ্নটা তার জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

ফারজানা তার বোন-দুলাভাইয়ের বাড়িতে থেকে স্থানীয় একটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স করছে। সে এ বছর ২য় বর্ষের ছাত্রী। ছোট সময় থেকেই লেখা পড়ায় সে খুব ভাল ছাত্রী। তাই তো গ্রামের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, শহরে তার বোনের বাসায় থেকে একটা ভাল কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

ফারজানার বোন ফারহানার বিয়ে হয়েছে প্রায় চার-পাঁচ বছর। ফারহানা ফারজানার চেয়ে দুই-তিন বছরের বড়। এইচ.এস.সি পাশ করার পরই তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে না দিয়ে উপায়ও ছিল না, সে এতই সুন্দরী ছিল যে যেখানেই যেত ছেলেরা তার পিছু নিত, এ ছাড়া পড়াশোনায়ও সে মোটেই ভাল ছিল না, কোনমতে টেনে টুনে পাশ করত। এই সব কারণে ফারজানার বাবা বাধ্য হয়ে কম বয়সেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। অবশ্য তার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল তার দুই মেয়েকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তাই তার স্বপ্নটা পূরণের আশা দেখছে ছোট মেয়ে

BanglaBook.org

ফারজানাকে নিয়ে। ফারজানা লেখা পড়ায় খুবই ভাল, তবে দেখতে খুব একটা সুন্দর নয়। ফারহানা তার মায়ের রূপ পেয়েছে কিন্তু ফারজানা তার ছিটেফোঁটাও পায়নি। সে পেয়েছে তার বাবার গম্ভীর চেহারা। এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে, তার এই গম্ভীর চেহারা দেখে, তার বোনের মত কোন ছেলে তার পিছুও নেয় না বা প্রেম নিবেদনও করে না। আর ফারজানাও প্রেম বা বিয়ে নিয়ে এত জলদি কিছু ভাবতে চায় না, সে চায় আগে সে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার বাবার স্বপ্নটা পূরণ করবে।

হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন তার স্বপ্ন পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুরুতে স্বপ্নটা এতটা কুৎসিত ছিল না। যতই দিন যেতে থাকে স্বপ্নটাও তত কুৎসিত ও নোংরা হতে থাকে। সে জীবনে যে কথা কখনও কল্পনাও করেনি, সেই দৃশ্য তার স্বপ্নের মাঝে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রথম প্রথম সে স্বপ্ন দেখত, খুবই সুদর্শন একটা পুরুষ এসে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যুবকের চোখ এত সুন্দর, এত মায়া ভরা যে চোখ ফেরানোই যায় না, শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে তার চোখের মধ্যে হারিয়ে যেতে।

ফারজানার প্রথম দিকে স্বপ্নটা তেমন খারাপ লাগত না, স্বপ্নটার কথা দিনে যখন ভাবত, তার শরীরটা শিহরিত হয়ে উঠত, লজ্জা লাগত, আবার এমন এক অচেনা অনুভূতির সৃষ্টি হত, যা ভালই লাগত। তবে একটা ব্যাপার তার কেমন জানি লাগত। স্বপ্নটাকে পুরো স্বপ্ন মনে হয় না, মনে হয় বাস্তব। সকালে ঘুম থেকে উঠেও, সে সেই মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ পেত, যে মিষ্টি গন্ধ স্বপ্নপুরুষের গা থেকে আসছিল। পারফিউমের গন্ধে কিছুটা ভয় লাগত। বিছানা থেকে উঠে জানালার পর্দা সরালে যেই না দিনের উজ্জ্বল রোদের আলো ঘরে ঢুকত অমনি তার ভয় কেটে যেত। ভাবত দুলাভাই অফিসে যাচ্ছে, সেই হয়তো পারফিউম মেখেছে, সেই গন্ধই পাচ্ছে। আর সে কি না ভাবছে, রাতের সেই স্বপ্নের গন্ধ।

ফারজানার মনের মধ্যে সারাদিন ঘুরে ফিরে শুধু স্বপ্নটার ভাবনাই আসতে থাকে। এমন স্বপ্ন সে কেন দেখে? স্বপ্নের অপরিচিত যুবক কে? সে এমন করে মায়া ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কেন? সে কী চায়? আর স্বপ্ন এমন সত্যি মনে হয় কেন? কিছুই তার মাথায় আসছে না। ফারজানার

BanglaBook.org

চেহারা ভাল নয়, তাই স্বপ্নের ওই সুদর্শন পুরুষ তো দূরে থাক একটা সাধারণ ধরনের পুরুষও তার চোখের দিকে অমন করে তাকায়নি। তবে সে লক্ষ করেছে কলেজে, রাস্তায়, মার্কেটে অনেক পুরুষই তার দিক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, দেখে মনে হয় তার আকর্ষণীয় ফিগারটা গিলে খেতে চায়। ফারজানা সেই সব পুরুষদের লক্ষ করেছে, তারা কখনোই মেয়েদের চোখের দিকে তাকায় না, তারা তাকায় মেয়েদের দেহের দিকে, লোলুপ দৃষ্টিতে। তার বোন ফারহানা এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে হলো গোঁফওয়ালা, ভিলেন মার্কা চেহারার কালো এক লোকের সাথে। দুলা ভাইয়ের চেহারা অমন হলে হবে কী, তার ক্ষমতা, যোগ্যতা, টাকা সব কিছুই অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই বিয়ের সময় অন্য পাত্রের চেয়ে সে-ই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

বোনের কথা ভেবে ফারজানার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার বোন এতটা সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও তার কপালে জুটল অমন বর, আর তার নিজের চেহারা তো ভাল নয়, তার যে কী জুটবে তা সে আগেই ভেবে রেখেছে।

ফারজানা কোনভাবেই হিসাব মিলাতে পারছে না অমন সুদর্শন পুরুষকে সে কেন স্বপ্ন দেখে? মনে মনে ভাবে রাস্তায় বা কলেজে সে কি কখনও অমন কোন সুদর্শন পুরুষ দেখেছে, যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল, আর তাকেই সে ঘুরে ফিরে স্বপ্নে দেখছে। না, এমন ঘটনা ঘটেনি, তার সাথে অমন কোন সুদর্শন পুরুষের দৃষ্টি বিনিময় হয়নি।

ফারজানার স্বপ্নটা ধীরে ধীরে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, ভাল লাগাগুলো খারাপ লাগায় পরিণত হচ্ছে। আজকাল স্বপ্নের সেই যুবক পুরুষ শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ক্ষান্ত হয় না। ফারজানার চুল, ললাট, চোখ, নাক, ঠোঁট, চিবুক যুবকের ফর্সা বলিষ্ঠ হাত দিয়ে আলতো ভাবে ছুঁয়ে যায়। ফারজানা বাধা দিতে চায়, কিন্তু বাধা দিতে পারে না, তার সমস্ত শরীরটা নিথর হয়ে পড়ে থাকে, আর চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে যুবকের মায়া ভরা চোখের দিকে।

যুবকের মায়া ভরা দৃষ্টি যেন তাকে, তার সমস্ত চেতনাকে বন্দি করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

যুবকের ইচ্ছের বাইরে তার করার কিছুই নেই। এক সময় যুবক আরও দুষ্ট হয়ে ওঠে। তার দুষ্ট হাত দুটো দুষ্টামিতে মেতে ওঠে। যুবকের গোলাপী ঠোঁট জোড়া ছুঁয়ে যায় ফারজানার নরম ঠোঁট, তার গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া টের পায় ফারজানা। বাধা দিতে চায়, প্রাণপণে বাধা দিতে চায়, চিৎকার করতে চায় কিন্তু ফারজানা কিছুই করতে পারে না। শুধু নীরবে যুবকের চোখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার একুশ বছরের যৌবনকে বিলিয়ে দেয়।

সকালে ফারজানার যখন ঘুম ভাঙে, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায় আরও ঘণ্টা খানেক। সে ভেবেই কূল পায় না এধরনের বাজে একটা স্বপ্ন সে কেন দেখে, সে কি তা হলে একটা খারাপ মেয়ে? কান্নায় ভেঙে পড়ে ফারজানা।

রাতের পর রাত স্বপ্নপুরুষ আরও হিংস্র হয়ে ওঠে, তার কষ্ট হয়, ব্যথা লাগে তবু চিৎকার করে বাধা দিতে পারে না। ঘুম ভাঙার পরও শরীরের ব্যথা ভাবটা থেকে যায়, আর সমস্ত শরীরে স্বপ্নপুরুষের স্পর্শের অনুভূতি থেকে যায়।

অবশেষে ফারজানা অধৈর্য হয়ে স্বপ্নপুরুষের কথা তার বোনের কাছে বলে। ফারহানা সব শুনে হেসে কুটি কুটি হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে, 'এ রকম স্বপ্ন সব মেয়েরাই বিয়ের আগে মাঝে মাঝে দেখে। তবে তোর মত অতটা নয়, তবে সব মেয়েই যখন ভিন্ন ভিন্ন এক একটা মানুষ, তাই স্বপ্নও ভিন্ন হতে পারে, এনিয়ে ভাবার কিছু নেই।'

ফারজানা বোনের হাসি থামিয়ে আবারও বুঝাতে চায় তার ব্যাপারটা অন্য রকম, সবার মত নয়।

ফারহানা তাতে আগের চেয়ে আরও বেশি হেসে বলে, 'তোর বিয়ে হোক দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে, স্বামী কাছে থাকলে আর এমন স্বপ্ন দেখবি না।'

বোনের কাছে স্বপ্নের কথা বলে ফারজানার কোন লাভই হলো না। বোনকে বোঝানোই গেল না স্বপ্নটা যে শুধু স্বপ্ন নয়, তার চেয়েও বেশি। স্বপ্নটা তাকে কতটা যন্ত্রণা দিচ্ছে।

ফারজানা তার প্রিয় বান্ধবী নদীর কাছেও তার স্বপ্নের কথা খুলে বলে।

BanglaBook.org

নদী সব শুনে তার বোনের মত হাসাহাসি না করলেও সেও সেই একই কথা বলে, 'এই বয়সের ছেলেরা বা মেয়েরা এ ধরনের স্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখে, বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ফারজানা তখন বান্ধবীকে আরও বুঝিয়ে বলে, এই স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই নয়, বাস্তবের মত মনে হয়। সেদিন ঘুম ভেঙে গলার নীচে বুক বরাবর স্বপ্নপুরুষের নখের আঁচড়ের যে দাগ দেখতে পায়, সেই দাগ ও বান্ধবীকে দেখায়।

নদী দাগ দেখে বলে, 'ঘুমের মধ্যে তুই নিজেও নিজের গায়ে আঁচড় দিতে পারিস, এখন ভাবছিস স্বপ্নপুরুষের কাজ। তবে তুই যে ভাবে বলছিস তাতে অনেক কিছু সন্দেহ হয়। তোর বাড়িতে বা বাড়ির আশপাশে কি এমন কোন পুরুষ আছে, যে রাতের অন্ধকারে চুপি-চুপি যেভাবেই হোক তোর রুমে গিয়ে এই কাজ করে?'

ফারজানা বলে, 'বাড়িতে তো পুরুষ লোক বলতে শুধু দুলাভাই, আর পাশের বাসায় যে ছেলে থাকে তাকে দেখে তো অমন মনে হয় না, এ ছাড়া আমার রুম তো আমি রাতে ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘুমাই, আর সে রকম হলে আমি ঠিকই বুঝতে পারতাম। কারণ ওটা যে স্বপ্ন তাও বুঝতে পারি। কারণ আমি স্বপ্নপুরুষকে কোন বাধাই দিতে পারি না, স্বপ্নের মধ্যে মানুষ হাঁটা চলা, নড়াচড়া বা কথা বলতে পারে না।'

নদী সে কথার উত্তরে বলে, 'তোকে হয়তো এমন কোন ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয় যাতে তুই অমন অচেতন হয়ে থাকিস, আর ঘুমের ঘোরে হয়তো তোর রুমের দরজাও ঠিক মত বন্ধ করিস না।'

ফারজানা বলে, 'বুঝলাম, তা এমন কাজ করবে কে?'

নদী বলে, 'কিছু মনে করিস না, খুলেই বলি, এই কাজ তোর পাশের বাড়ির ছেলেটাও করতে পারে আবার তোর দুলাভাইও হতে পারে।'

দুলাভাইয়ের কথা বলতেই ফারজানা সাথে সাথে বাধা দেয়। দুলাভাইয়ের চেহারা ভিলেন মার্কা হলেও মানুষ হিসেবে খুবই ভাল। ফারজানার দিকে কখনোই সে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়নি, এ ছাড়া তাকে দেখেই বোঝা যায় সে দুশ্চরিত্র পুরুষ নয়, তা ছাড়া ফারজানার ধারণা দুলাভাই তাকে ছোট বোনের মতই ভাবে, তার পাশের বাড়ির সেই ছেলে

BanglaBook.org

তো দিনের বেলায় কখনও তাদের বাড়িতে আসেনি, রাতে আসবে কী করে? আর স্বপ্নপুরুষ তো খুবই সুদর্শন যুবক, বাড়ির আশপাশে তো দূরের কথা, সারা শহর খুঁজেও এমন পুরুষ পাওয়া যাবে না।

সব শুনে নদী বলে, 'ঘুমের ঘোরে তোর কাছে অমন সুদর্শন পুরুষ মনে হয়। ভাল করে ভেবে দেখ তোর আশপাশেরই কেউ হবে, নয়তো বা এটা শুধুই স্বপ্ন।'

ফারজানা বলে, 'তাই বলে নিজের দুলাভাইকে সন্দেহ করব, ছিঃ, এমন ভাবতেও আমার খারাপ লাগছে।'

নদী তার উত্তরে বলে, 'তুই কিছুই জানিস না, পুরুষরা কত খারাপ হতে পারে, উপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, শোন তা হলে একটা ঘটনা বলি।

'আমাদের ইয়ারের সবচেয়ে ভাল ছাত্র রাতুলকে তো তুই চিনিস, সবাই জানে সে খুবই একটা ভাল রেজাল্ট করবে। করবেও, কারণ সারাদিন সে লেখা-পড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে। খুবই ভদ্র, মাথা নিচু করে হাঁটে, মেয়েদের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো তো দূরে থাক, মাথা তুলে চোখের দিকেও তাকায় না। এমন ছেলের সঙ্গে কে না বন্ধুত্ব করতে চায়। ভাল ভাল নোট পাওয়ার আসায় আমিও রাতুলের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলি। মাঝে মাঝেই তার বাড়িতে গিয়ে তার নোট আনি, তার বই খাতা নেড়েচেড়ে দেখে আসি। এমনই একদিন আমি রাতুলের রুমে বসে তার বইয়ের তাক থেকে একটা একটা করে বই তুলে দেখছি, রাতুল গেছে ভিতরে চায়ের কথা বলতে। হঠাৎ একটা মোটা বই সরাতেই দেখি ডজন খানেক পর্নো সিডি। সিডিগুলোর উপরের ছবি দেখেই আমার বমি এসে যায়, এ হলে বোঝ ভিতরে কী থাকতে পারে? আমি কল্পনাও করতে পারিনি এমন একটা ছেলে এ ধরনের বাজে ছবি দেখতে পারে। এমন বাজে ছবি যে দেখে তার মানসিকতা কী হতে পারে? তাকে ভাল ছাত্র বললেও ভাল চরিত্রের মানুষ বলা যায় না।'

বান্ধবী নদীর দেওয়া বিভিন্ন পরামর্শ শুনেও ফারজানার কোন লাভ হচ্ছে না। বরং নদীর বলা বিভিন্ন কথায় ফারজানার মনে বিভিন্ন সন্দেহ হানা দিচ্ছে। সে আজকাল রাতে তার রুমের দরজা ভাল করে বন্ধ করার

BanglaBook.org

পরও আবার দেখে নেয়, ঠিক মত আটকানো হয়েছে কি না। তার রুমের জানালার গ্রিল ভাল ভাবে আটকানো আছে কি না দেখে নেয়। কারণ নদী বলেছিল, 'জানালার গ্রিলটা দেখে নিস, এমনও হতে পারে, জানালার গ্রিল আলগা ভাবে সেট করা, কেউ রাতে সেটা সরিয়ে অনায়াসে ঢুকে যায়।'

নদী বলেছিল তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়, অন্য কোন খাবারের সাথে মিশিয়ে। ফারজানার মনে সন্দেহ জাগে, তার দুলাভাই রাতে অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায়ই আইসক্রীম, কোল্ডড্রিংকস, জুস, দই নিয়ে আসে, তা হলে কি এই খাবারের মধ্যেই ঘুমের ওষুধ মিশানো থাকে? ফারজানা ও তার বোন তা খেয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে আর এই সুযোগে দুলাভাই...। ছিঃ, এসব কী কথা ভাবছি। মাথাটাই একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে।

দিনে দিনে ফারজানা একেবারে অগোছাল হয়ে যায়। পড়াশোনা একটুও হয় না, গায়ের জামা কাপড়, চুল আলুথালু অবস্থায় থাকে, চোখের নীচটা কালো হয়ে গেছে, যা দেখে যে কেউই বুঝতে পারবে, সে কোন সমস্যায় আছে। ফারজানার বোন ফারহানা বোনের অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কীরে, আজকাল তোকে এমন লাগে কেন? কলেজেও যাস না, পড়াশোনাও করিস না, সব সময় মন মরা হয়ে বসে থাকিস, কী ব্যাপার? কোন সমস্যা থাকলে বল আমাকে।'

ফারজানা অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে জড়ানো কণ্ঠে বলে, 'কী বলব, যা বলার তা তো আগেই বলেছি। তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করোনি।'

বোন বলে, 'কী বলেছিস! আমার তো মনে পড়ছে না, তুই কোন সমস্যার কথা বলেছিস কি না।'

ফারজানা তার উত্তরে সেই আগের মত কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, 'আমি যে স্বপ্নের কথা বলছিলাম।'

'স্বপ্ন! স্বপ্ন কি মানুষের জীবনের কোন সমস্যা হতে পারে, কী বলছিস আবোল-তাবোল?'

'আমার জীবনে স্বপ্নটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

'তোকে তো আগেই বলেছি ওরকম স্বপ্ন অবিবাহিত মেয়েরা অনেক সময় দেখে, বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যায়। তোর যদি স্বপ্ন নিয়ে

BanglaBook.org

এতই সমস্যা হয়, তবে বল তোর জন্য পাত্র দেখি, তোর দুলাভাইকে ভাল পাত্রের ব্যবস্থা করতে বলি।'

ফারজানা কোন কথা বলে না, চুপচাপ হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, এ আঙুল কতবার স্বপ্নপুরুষের পেলব আঙুলের মধ্যে বন্দি হয়েছে, ছিঃ, এই লজ্জা থেকে আমাকে বাঁচতে হবে। বিয়ে হোক সেটাই ভাল হবে। পড়াশোনা আর হয়েছে... সব শেষ।

ফারজানার দুলাভাই বিসিএস ক্যাডার, সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাদলের সাথে ফারজানার বিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা শুরু করে। সারাক্ষণ পাত্রের গুণগান গাইতে থাকে, 'এমন ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না, সরকারী বিসিএস ক্যাডার, এক বাপের এক ছেলে, নম্র, ভদ্র, ফারজানার সাথে বিয়েটা হলে যা মানাত না!'

পাত্রের সম্পর্কে দুলাভাইয়ের কাছ থেকে শুনে শুনে ফারজানার ধারণা হয়েছিল, পাত্র যেহেতু এক বাপের এক ছেলে, দেখতে মনে হয় নাদুস-নুদুস আদুরে চেহারার হবে। তার সব ধারণা পাল্টে যায় পাত্র বাদল যেদিন চা খাওয়ার ছুতোয় ফারজানাকে দেখতে আসে সেদিন। ফারজানা তো পাত্রকে দেখে অবাক হয়ে যায়, এই সেই খাদ্য নিয়ন্ত্রক বাদল, যে অবস্থা তাতে নাম বাদল না রেখে বাঁদর রাখলে খারাপ হত না, আর এই রোগা-পাতলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে দেখলে যে কেউই বুঝতে পারবে দেশে এখন খাদ্য ঘাটতি চলছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রক বাদলও প্রথম দেখায় ফারজানার চোখের দিকে স্বপ্নপুরুষের মত একই ভাবে তাকিয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এই, স্বপ্নপুরুষ বড় বড় মায়া ভরা দুটি চোখে তাকিয়ে থাকে আর খাদ্যনিয়ন্ত্রক তার ছোট ছোট চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে, আর একটু পরপর বানরের মত চোখ পিটির পিটির করে।

বাদলের সাথেই ফারজানার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের আগে বাদল সম্পর্কে ফারজানা যা জেনেছিল নম্র, ভদ্র, সত্যিকারের বাদল তার চেয়েও বেশি নম্র, ভদ্র। তার দোষের মধ্যে একটাই দোষ, প্রচুর সিগারেট খায়, গা থেকে সব সময় সিগারেটের গন্ধ আসতে থাকে।

অনেক দিন কেটে গেছে, ফারজানা আর স্বপ্নপুরুষের গায়ের সেই মিষ্টি গন্ধ পায়নি, কারণ বিয়ের পর আর কোন রাতে স্বপ্নপুরুষ আসেনি।

BanglaBook.org

ফারজানাও স্বপ্নের কথাটা প্রায় ভুলেই গেছে। সে এখন সারাদিন শ্বশুর-শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। শাশুড়ির কাছ থেকে নতুন নতুন রান্না শিখতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকে। ফারজানার শ্বশুর-শাশুড়িও ফারজানাকে খুবই ভালবাসে, নিজেদের মেয়ে ছিল না বলে ছেলের বউকে পেয়ে তারা মহাখুশি! ফারজানার দিনগুলো আনন্দেই কাটছে। শুধু রাতে যখন তার স্বামী খুব কাছে আসে তখন সিগারেটের উটকো গন্ধে তার খারাপ লাগে, মনে পড়ে যায় স্বপ্নপুরুষের গা থেকে আসা সেই মিষ্টি গন্ধের কথা।

ফারজানার বিয়ের পর প্রায় বছর খানেক কেটে গেছে, সে আর সেই বাজে স্বপ্নটি দেখেনি। অবশ্য এই এক বছরের একটি রাতও সে একা ঘুমায়নি। বিয়ের পর আজ এই প্রথম সে তার স্বামী বাদলকে ছাড়া একা ঘুমাচ্ছে। অবশ্য স্বপ্ন নিয়ে এখন আর তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। বিয়ের কিছুদিন পরই স্বপ্ন সম্পর্কে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন, সে এত দিন শুধু শুধু ভয় পেয়েছে, তার বোনের কথাই ঠিক, 'বিয়ে হয়ে গেলে এমন স্বপ্ন আর কেউ দেখে না।'

বাদল তার অফিশিয়াল কাজে তিন দিনের জন্য সিলেট গিয়েছে। ফারজানার আজ একা ঘুমাতে হবে এটা ভেবে তার ভালই লাগছে, কতদিন হাত পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমাতে পারেনি, এই বুঝি স্বামীর গায়ে পা লাগছে। ফারজানা বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে টাকি মাছের ভর্তা বানাতে হয় কী ভাবে তাই নিয়ে ভাবছে। কারণ ঘুমাতে আসার আগে সে আর তার শাশুড়ি টিভিতে সিদ্দিকা কবীরের রেসিপিতে টাকি মাছের ভর্তা বানাতে হয় কীভাবে তা দেখেছে। রান্নার অনুষ্ঠানটা দেখতে দেখতে তার শাশুড়ি কয়েকবারই ঢেকুর তুলে বলেছে, 'এই আইটেমটা একদিন করতে হবে। মনে হচ্ছে খুব সুস্বাদু হবে, নিয়মটা ভাল করে শিখে রাখো।' ফারজানা বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে টাকি মাছের ভর্তা বানাতে কী কী লাগে তার হিসাব করছে। সিদ্ধ করে কাঁটা ছাড়ানো টাকি মাছ এক কাপ, আদা-রসুন বাটা এক চা চামচ, জিরা বাটা এক চা চামচ, হলুদ বাটা আধ চামচ... লবণ স্বাদ মত।

টাকি মাছের ভর্তা বানাবার নিয়ম কানুন নিয়ে ভাবতে ভাবতে ফারজানা গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। আজ আবার সেই আগের মত স্বপ্নপুরুষ তার

BanglaBook.org

কাছে আসে, চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পাশে বসে থাকে, তারপর ফারজানাকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূর, বহুদূর।

ফারজানা তার স্বামী বাদল সিলেট থাকাকালীন তিন রাত্রিই স্বপ্নপুরুষকে স্বপ্ন দেখে। তার স্বামী আসার পর, আর সেই আগের মত স্বপ্নটা দেখে না। তবে ওই ঘটনার কিছু দিন পরই ফারজানা গর্ভবতী হয়। নির্দিষ্ট সময় পর ফেয়ার হেলথ ক্লিনিকে চাঁদের মত ফুটফুটে একটা ছেলের জন্ম দেয় ফারজানা। বাচ্চটা এতই সুন্দর হয়েছে, যে বলার মত না, শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

ফারজানা তার নবজাতককে নিয়ে ক্লিনিকের রুমে বসে আছে। ক্লিনিকের দুটি বেডের একটিতে ফারজানা আর তার বাচ্চা, অন্যটিতে তার শ্বশুর-শাশুড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি কথা বলছে, কথা বলা না বলে একে অপরকে টিপ্পনি কাটছে তাও বলা যায়। ফারজানার শ্বশুর তার নাতীকে দেখছে আর বলছে, 'একেবারে আমার বাবার মত হয়েছে।' তার উত্তরে শাশুড়ি বলছে, 'তোমার বাবাকে তো দেখাত ডিপজলের মত, ছিঃ, ওরকম হবে কেন, দাদু ভাই হয়েছে আমার বাবার মত।'

শ্বশুর তার উত্তরে, 'ডিপজলটা কে?'

'কেন চেনো না, সিনেমার ভিলেন?'

'তা কী বললে, তোমার বাবার মত দেখায়?'

'ভাল করে লক্ষ করে দেখো না আমার বাবার মত ফর্সা গায়ের রং, নাকটাও তার মত, শুধু দাদু ভাইয়ের চোখ দুটো আমার বাবার চোখের চেয়ে বড়, ভাসা-ভাসা।'

শ্বশুর তার উত্তরে, 'কী যে বোকার মত কথা বলছ, দাদু ভাইকে তোমার বাবার মত দেখাবে কেন? তোমার বাপকে তো দেখাত মি. বীনের মত, আমাদের বিয়ের সময় প্রথম প্রথম তোমার বাবাকে দেখলেই আমার হাসি পেত, কত কষ্টে রুমাল দিয়ে মুখ চেপে হাসি থামিয়ে রেখেছিলাম।'

শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের নাতী নিয়ে একে অপরকে এভাবে টিপ্পনি কেটেই চলছে। আর এদিকে বাদল তার দেবদূতের মত বাচ্চাকে দেখতে একটু পরপরই এটা ওটা নিয়ে আসছে। বাদল একটু আগে চকলেট আর ললিপপ

BanglaBook.org

নিয়ে এসে বলে, 'ওহ, আমার তো ভুল হয়ে গেছে, বাবু সোনা তো চকলেট ললিপপ খেতে পারবে না, ফারজানা চকলেটগুলো বরং তুমিই রেখে দাও, তুমি খেলেই বাবু সোনার খাওয়া হবে।' এই বলে ফারজানার হাতে চকলেট, ললিপপ দিয়ে, আনন্দ উজ্জ্বল চোখে আবার কী যেন আনতে যায়। এর পরেরবার বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলনা আর ডজনখানেক বেলুন নিয়ে উপস্থিত হয়। ফারজানা তাকিয়ে দেখে, তার স্বামীকে এখন অতগুলো খেলনা আর বেলুন হাতে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বেলুন বিক্রি করা বেলুনওয়ালাদের মত দেখায়। একেবারে শেষ বার আসে ক্রিকেট ব্যাট আর বল নিয়ে আর তার মাথায় থাকে লাল একটা ক্যাপ। বাচ্চাটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'ক্রিকেটার হওয়ার খুব শখ ছিল, হতে পারিনি, তাই ছেলেকে ছোট সময় থেকেই খেলা শিখিয়ে এমন করব যে, একদিন আমার ছেলেই বিশ্বকাপ ছিনিয়ে আনবে।'

ফারজানা তার স্বামীর কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যায়। লোকটা, এমন সুন্দর ছেলে হয়েছে বলে, আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে। তবে বাচ্চাটা যে তাকে একেবারেই পছন্দ করছে না সেটা কি সে বুঝতে পারছে না? সে কাছে আসলেই বাচ্চাটা কেঁদে কেটে একাকার করে ফেলছে।

ফারজানা তার বাচ্চার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, সেই একই চোখ, সেই একই মায়া-মায়া চাহনি। যে যাই বলুক বাচ্চাটা হয়েছে একেবারে সেই স্বপ্নপুরুষের মত। একথা কেউ জানে না, শুধু ফারজানাই জানে। কারণ সে এই বাচ্চার মা। সে এ কথা কাউকে বলতে পারবে না, বললে সবাই তাকে কলঙ্কিনী ভাববে।

BanglaBook.org

অমীমাংসিত

এক

যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে জীবন-যাপন করে, লোকে তাকে ঘর-জামাই বলে। সেই সূত্রে, যে শ্বশুর জামাইয়ের বাড়িতে জীবন-যাপন করেন, নির্দ্বিধায় তাঁকে ঘর-শ্বশুর বলা যায়।

সিরাজ সাহেবের এখন ঘর-শ্বশুর অবস্থা। গত ছয় মাস যাবৎ তিনি তাঁর জামাইয়ের বাড়িতে জীবন অতিবাহিত করছেন।

সিরাজ সাহেবের বয়স ষাটের মত। কিন্তু তাঁকে তাঁর বর্তমান বয়সের চেয়ে কম বয়সি মনে হয়। শক্ত-সমর্থ দেহ। মাথায় পাতলা চুল। কলপ করা হয় বলে চুলের রং কালো। মাঝারি উচ্চতা, হালকা-পাতলা গড়ন। চেহারায় বয়সের ছাপ নেই বললেই চলে। বয়স হলেও তাঁর তেমন কোনও রোগ নেই। সব মিলিয়ে তিনি খুবই সুস্থ-স্বাভাবিক একজন মানুষ।

সিরাজ সাহেবের স্ত্রী গত হয়েছেন দশ বছর। তিন সন্তানের জনক তিনি। এক মেয়ে দুই ছেলে। ছেলে দুটি হয়েছে নেশাখোর বদমাইশ টাইপের। ছেলেদের সঙ্গে রাগ করেই তিনি বাড়ি ছেড়ে, ছয় মাস আগে মেয়ের বাড়িতে এসে উঠেছেন।

মেয়ে রিনা, সিরাজ সাহেবকে খুবই ভালবাসে। মেয়ে বাবা বলতে অজ্ঞান। এত দিন হয়ে গেল কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও দিন মেয়ের মধ্যে তিনি বিরূপ ভাব দেখেননি। জামাইও বেশ ভাল–বিনয়ী, নম্র-ভদ্র। শ্বশুরের সামনে কখনও চোখ তুলে তাকায় না। শ্বশুরকে দেখলেই উঠে দাঁড়ায়। খাওয়ার সময় বারবার রিনাকে বলে, 'এটা আব্বাকে দাও, ওটা আব্বাকে দাও...আব্বার খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো...আব্বার কী খেতে ইচ্ছে করছে...' জামাইয়ের ব্যবহারে সিরাজ সাহেব মুগ্ধ। গত ছয় মাস ধরে মেয়ের বাড়িতে তিনি খুব সুখেই আছেন।

BanglaBook.org

মাঝে-মাঝে রিনার ছেলে-মেয়ে দুটি সিরাজ সাহেবের সুখের মধ্যে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটায়। ছেলেটির বয়স এগারো, মেয়েটির বয়স আট। নাতি-নাতনিকে তিনি খুব ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন। কিন্তু নাতি-নাতনি দুটি হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের বিচ্ছু। এমন কোনও দুষ্টুমি নেই যা তাদের জানা নেই। তাদের সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দুষ্টুমির একটি হচ্ছে–দুটি টিকটিকি ধরে, টিকটিকির পা একটি লম্বা সুতোর দুই মাথায় বেঁধে ছেড়ে দেওয়া। টিকটিকি দুটি ছাড়া পেয়ে ছুটে পালাতে চায়, দুটো দুই দিকে দৌড় দেয়, কিন্তু সুতোর দুই প্রান্তে দুটো বাঁধা বলে একই জায়গায় বসে দুটোতে টানাটানি করতে থাকে। তাই দেখে নাতি-নাতনি হেসে কুটিকুটি হয়। এক পর্যায়ে সুতো দিয়ে বাঁধা টিকটিকি দুটো সিরাজ সাহেবের গায়ে ছেড়ে দেয়।

তাদের আর একটি মজার খেলা হচ্ছে–সিঁড়ির রেলিং-এর উপর বসে স্লিপ কেটে নামা। সিরাজ সাহেব সারাক্ষণ ভয়ে-ভয়ে থাকেন, কবে নাতি-নাতনি সিঁড়ির রেলিং থেকে পড়ে একটা অঘটন ঘটায়। তাই যখন তারা রেলিং-এ স্লিপ কাটার অপকর্মটি করে তখন সিরাজ সাহেব সিঁড়ির নীচের ধাপে গিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়ান। নাতি-নাতনি স্লিপ কেটে সিরাজ সাহেবের গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারা আর একটি কাজ করে যা রীতিমত নির্মম। বাড়িতে একটি পোষা বিড়াল আছে। বিড়ালটাকে ধরে কাঁচি দিয়ে বিড়ালের গায়ের সমস্ত পশম ছেঁটে দেয়। এ ক্ষেত্রে তাদের মন্তব্য হচ্ছে, তাদের নিজেদের চুল ছাঁটা হয়, তা হলে বিড়ালের চুল ছাঁটা হবে না কেন!

নাতি-নাতনি অনেক সময় নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করে গোমড়া মুখে বসে থাকে। তাই দেখে সিরাজ সাহেব আদর করে রাগ ভাঙাতে চান। 'কী হলো, নানু ভাই, পেঁচার মত মুখ করে বসে আছ কেন! কাছে আসো...' কাছে টেনে নিয়ে তিনি আদর করতে চান। অমনি থুঃ করে এক দলা থুথু সিরাজ সাহেবের মুখে ছুঁড়ে দেয়।

এর পরেও নাতি-নাতনিকে তিনি খুব ভালবাসেন। নাতি-নাতনি নানার সাথে এ রকম একটু-আধটু তো করবেই! প্রায়ই তিনি নাতি-নাতনির জন্য এটা-ওটা কিনে আনেন।

BanglaBook.org

সিরাজ সাহেব সরকারী ভূমি অফিসে চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর জি.পি ফাণ্ড, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সব মিলিয়ে বেশ কিছু টাকা পান। সেই টাকার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ এখনও আছে। সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন। তিন মাস পর পর মুনাফা পান। তা ছাড়া প্রতি মাসের পেনশনের টাকা তো আছেই।

রিটায়ার করার পর তিনি মোট যে টাকা পেয়েছিলেন সে টাকার বাকি অর্ধেক গেছে ছেলেদের পিছনে। বিভিন্ন সময় ব্যবসার নাম করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে ব্যবসা-ট্যবসা সব লবডঙ্কা। এখন আর ছেলেদের তিনি পাত্তাই দেন না। ছেলেদের এড়াতেই মেয়ের বাড়িতে এসে উঠেছেন।

দুই

রাত ১০টা। সিরাজ সাহেবের মেয়ে রিনা উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় পায়চারি করছে।

সিরাজ সাহেব প্রতিদিন বিকেলে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা পার্কে গিয়ে, মাগরিবের আযানের আগ পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করেন। আযান হয়ে যাবার পর, পার্কের পাশের একটা মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। এই নিয়মই চলছে তিনি এখানে আসার পর থেকে। কোনও দিন ফিরতে একটু দেরি করলে বড় জোর রাত ৮টা। কিন্তু আজ ১০টা বেজে গেল তবুও ফিরছেন না।

রিনা বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় অস্থির। বাবা সহজ-সরল মানুষ। এই শহরের কারও সঙ্গে তেমন চেনা জানাও নেই। তা হলে গেলেন কোথায়! অ্যাক্সিডেন্ট...ছিনতাই...খারাপ লোকের খপ্পরে...বিভিন্ন কুচিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হতে থাকে।

রিনার স্বামী জামিল অফিস থেকে ফিরে শ্বশুরের খোঁজে বেরিয়েছে। একটু আগে জামিলের সাথে রিনার সেল ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। জামিল পার্কের সামনে গিয়ে খোঁজ করেছে। পার্কের সব গেট বন্ধ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

লোকজন নেই বললেই চলে। এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে সিরাজ সাহেবের খোঁজ দিতে পারবে।

মসজিদে গিয়েও খোঁজ করে। মসজিদের মুয়াজ্জিনকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়, এশার নামাজ অনেক আগে শেষ, সব মুসল্লিরা বাড়ি ফিরে গেছে। মসজিদে এখন কেউই নেই। মসজিদ এখন বন্ধ করা হবে।

জামিলের কণ্ঠে সব শোনার পর ফোনেই রিনা ফোঁত-ফোঁত করে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে-কাঁদতে জামিলকে বলে, শহরের হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করতে।

রাত ২টায় মলিন চেহারা নিয়ে জামিল ফিরে আসে। সে সবগুলো হাসপাতালে খোঁজ করে, স্থানীয় থানায় মিসিং ডায়েরী লিখিয়ে এসেছে।

জামিলকে দেখে রিনা জামিলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে-কাঁদতে বলতে থাকে, 'আমার বাবাকে এনে দাও...যেখান থেকে পারো আমার বাবাকে এনে দাও...'

জামিল রিনার মাথায় হাত বুলাতে-বুলাতে সান্ত্বনা দিতে থাকে, 'এত অস্থির হয়ো না...একটু ধৈর্য ধরো... আব্বা ফিরে আসবেন, নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।'

সাতটা দিন কেটে গেল। সিরাজ সাহেবের কোনও খোঁজ মেলেনি। জলজ্যান্ত একটা লোক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

স্থানীয় থানার ওসি সাহেব বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে সিরাজ সাহেব মিসিং কেসের তদন্ত করছেন। সিরাজ সাহেব প্রতিদিন বিকেলে যে পার্কে হাঁটতে যেতেন, সেই পার্কের কেয়ারটেকার, বাদাম-বিক্রেতা, চানাচুর-বিক্রেতা...সবাইকে সিরাজ সাহেবের ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যেদিন থেকে সিরাজ সাহেব মিসিং, সেদিন বিকেলেও তাঁকে পার্কে দেখা গিয়েছে। তবে তিনি একা নন! তাঁর সাথে গোলাপি রঙের শাড়ি পরা একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা ছিলেন! মাঝারি উচ্চতা মহিলার, মোটাসোটা গড়ন, ফর্সা গায়ের রং, ঢেউ খেলানো লম্বা চুল, দুই কানে নীল পাথর বসানো দুল, নাকে মুক্তা বসানো নাক ফুল, নাকের উপর ছোট্ট একটা তিল...

পুলিশের এক্সপার্ট চিত্র শিল্পী পার্কের কেয়ারটেকার, বাদাম-বিক্রেতা,

চানাচুর-বিক্রেতার মুখে সেই মহিলার বর্ণনা শুনে-শুনে একটা স্কেচ এঁকে ফেলেন।

ওসি সাহেব স্কেচটা সিরাজ সাহেবের মেয়ে-জামাইকে দেখালে রিনা একেবারে তাজ্জব হয়ে যায়। স্কেচে আঁকা চেহারা তার খুবই পরিচিত! এমনই পরিচিত মুখ, যে মুখের কথা ঘনিষ্ঠজনরা কেউ কোনও দিন ভুলতে পারে না। নাকের উপরে সেই ছোট্ট তিল...সেই ঢেউ খেলানো লম্বা চুল...

এই মুখ রিনার মায়ের মুখ। যে মা দশ বছর আগে মারা গেছে! মায়ের গোলাপি রঙের শাড়ি খুব পছন্দের ছিল। কানের নীল পাথর বসানো দুল...সব মিলে যাচ্ছে! এটা কী করে সম্ভব! যে মানুষ দশ বছর আগে মারা গেছে, সে কী করে সেদিন পার্কে এসেছিল!

দুই বছর পর

দিনে-দিনে সিরাজ সাহেবের কথা সবাই ভুলে গেছে।

পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও সিরাজ সাহেব বা সিরাজ সাহেবের স্ত্রীর চেহারার কোনও মহিলার খোঁজ পায়নি। পুলিশের অনেক-অনেক আনসলভ্ড কেসের মতই সিরাজ সাহেব মিসিং কেসও এক সময় ফাইল বন্দি হয়ে পড়ে রইল।

রিনা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে বসে-বসে কাঁদছে। তার ছেলে-মেয়ে দুটির বেলা ১২টার মধ্যে স্কুল থেকে ফেরার কথা। দুপুর ২টা বেজেছে এখনও ফেরেনি! তার স্বামী জামিলকে অফিসে ফোন করে জানিয়েছে।

জামিল স্কুলে গিয়ে খোঁজ-খবর করে জেনেছে, স্কুল সাড়ে ১১টায় ছুটি হয়েছে। সব ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি চলে গেছে। তাদের ছেলে-মেয়ে দুটিও চলে গেছে।

স্কুলের দারোয়ানের ভাষ্য মতে, তাদের ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিতে আজ এক বয়স্ক লোক এসেছিল। লোকটার মাঝারি উচ্চতা, হালকা-পাতলা গড়ন, মাথায় কলপ করা পাতলা চুল, শক্ত-সমর্থ দেহ...

দারোয়ান আরও বলে, ছেলে-মেয়ে দুটি অতি পরিচিত ভঙ্গিতে লোকটার সাথে চলে যায়।

পুলিশের ফাইলে আর একটি মিসিং কেস। স্কুল থেকে ফেরার পথে দুই

BanglaBook.org

ভাই-বোন নিখোঁজ।

পুলিশের এক্সপার্ট চিত্র শিল্পী স্কুলের দারোয়ানের বলা বর্ণনা শুনে শুনে সেদিন স্কুল থেকে ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে-যাওয়া সেই বয়স্ক লোকের একটি স্কেচ এঁকে ফেলেন।

ছেলে-মেয়ে দুটির বাবা-মাকে সেই স্কেচ দেখানোর পর মা সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। বাবা অবাক হয়ে কিছু সময়ের জন্য বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে।

স্কেচে যে মুখটি ফুটে উঠেছে, সে মুখটি অতি পরিচিত একটি মুখ। রিনার বাবা সিরাজ সাহেবের মুখ! যে সিরাজ সাহেব দুই বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গেছেন!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাসর

এক

আজ মাহফুজ ভাইয়ার বিয়ে।

মাহফুজ ভাইয়া আমার বড় চাচার ছেলে। সে বয়সে আমার চেয়ে সাড়ে তিন বছরের বড়। যৌথ পরিবারের সুবাদে ছেলেবেলা থেকে আমি আর মাহফুজ ভাইয়া একসাথে বেড়ে উঠেছি। স্কুল-কলেজে যাওয়া থেকে শুরু করে, খেলা-ধুলা, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, ঈদের কেনাটাকা...সবই একসাথে। তার-আমার সম্পর্ক বন্ধুর মত সহজ-সাবলীল।

মাহফুজ ভাইয়ার উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। আমার উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। সে বয়সে যেমন আমার থেকে সাড়ে তিন বছরের বড় তেমনি তার উচ্চতাও আমার থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চি বেশি। এ ছাড়া অন্যান্য দিকগুলোতেও সে আমার থেকে অনেক উঁচুতে। লেখা-পড়ায়ও আমার থেকে তার অনেক অনেক গুণ ভাল রেজাল্ট। সিনেমার নায়কদের মত সে কখনও ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয়নি। আমার ধারণা–মানুষ হিসেবেও সে আমার থেকে অনেক উঁচু দরের, উঁচু মনের। তার মনটা আকাশের চেয়েও বিশাল। তার বুদ্ধি, যোগ্যতা, শক্তি...সবকিছু আমার চেয়ে অন্তত সাড়ে তিন গুণ বেশি। সব ব্যাপারেই সে আমার থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় আমার কখনও তাকে ঈর্ষা হয় না। বরং সারাক্ষণ এমন একটা মানুষের সঙ্গ পাই বলে আমার এক ধরনের গর্ববোধ হয়।

আমি মাহফুজ ভাইয়াকে যতই জিনিয়াস ভাবি, বড় চাচা কিন্তু তাকে বেকুব, গবেট, গর্দভ, স্টুপিড, ননসেন্স...এগুলো ছাড়া অন্য কিছুই ভাবেন না। যে ছেলে এমন ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করা সত্ত্বেও চাকরি-বাকরির খোঁজ না করে কবিতা লেখায় মত্ত হয়ে থাকে, তাকে বেকুব, গবেট, গর্দভ ছাড়া আর কী বলা যায়! আমার মতে বড় চাচার এই মন্তব্য মোটেই ঠিক নয়। তিনি

BanglaBook.org

ভুল ধারণা নিয়ে আছেন। মাহফুজ ভাইয়া অত্যন্ত সুন্দর কবিতা লেখে। অমন ভাল-ভাল কবিতা লেখা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আমার বিশ্বাস লেগে থাকলে সে একদিন অনেক বড় কবি হবে। এরই মধ্যে তার বেশ কয়েকটা কবিতা দেশের নামকরা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

মাহফুজ ভাইয়ার মাথা থেকে কবিতার ভূত তাড়াতেই তার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিয়ে করলেই নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। সংসারী হবে। বিয়ে করানোর এই সিদ্ধান্ত বড় চাচার। এ বাড়িতে বড় চাচার সিদ্ধান্তই সবার শিরোধার্য। আমার বাবা বা ছোট চাচা তাদের বড় ভাইকে যমের মত ভয় পায়। কখনও তারা তাদের বড় ভাইয়ের কথা অমান্য করে না। বড় চাচা যদি বলেন, সূর্য পুব দিক থেকে ওঠে না পশ্চিম দিক দিয়ে ওঠে, আমরা যেটাকে পুব দিক বলে জানি সেটাই পশ্চিম দিক আর পশ্চিম দিকটা হচ্ছে পুব দিক, আমার বাবা এবং ছোট চাচা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বড় ভাইয়ের কথার পূর্ণ সমর্থন করে বলবে–হ্যাঁ, আমরা এত দিন ধরে ভুলই জানি, পুব দিকই হচ্ছে পশ্চিম দিক, সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে ওঠে...ভাইজান ঠিক কথাই বলেছেন।

মাহফুজ ভাইয়ার বিয়ের পর আমি একেবারে একা হয়ে যাব এই ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছে। ছেলেবেলা থেকে আমি আর মাহফুজ ভাইয়া বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিকের বড় কামরাটায় ভাগাভাগি করে থাকি। কামরার দুই দিকে দু'জনার দুটো সিঙ্গেল খাট, খাটের পাশে দুজনার দুটো আলাদা-আলাদা টেবিল-চেয়ার, একটি আলনা, একটি আলমারি, একটি সেগুন কাঠের বিশাল বুক-শেলফ। আলনাটা, আলমারিটা আর বুক-শেলফটায় দুজনের সমান অধিকার। রুমের সাথে লাগোয়া বারান্দায় দুজনার দুটো রকিং চেয়ারও আছে। গভীর রাতে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা দুজন রকিং চেয়ার দুটোতে বসে দোল খেতে-খেতে সিগারেট টানি আর গল্প করি। মাঝে-মাঝে মাহফুজ ভাইয়া কবিতা আবৃত্তি করে, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি। এই আনন্দময় দিনগুলো বোধহয় চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে!

ভোর হতে না হতেই বড় চাচা হাঁক-ডাক দিচ্ছেন। তাঁর হাঁক-ডাকে বাড়ি মাথায় উঠেছে। নীচতলা থেকে তাঁর মাইকের মত গলার স্বর ভেসে আসছে,

BanglaBook.org

'...এ বাড়ির প্রত্যেকটা হচ্ছে ননসেন্স...যত সব আহম্মকের দল! আজ একটা বিশেষ দিন সেদিকে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। মরার ঘুম ঘুমাচ্ছে সবাই। ঘুম থেকে উঠিয়ে কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে প্রত্যেকটাকে এই শীতের মধ্যে মজা পুকুরে চুবাতে হয়...'

বড় চাচার হাঁক-ডাকে অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভাঙার পরে এতক্ষণ ধরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে-শুয়ে ভাবছি। মাহফুজ ভাইয়ার খাট থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। বোধহয় তারও ঘুম ভেঙেছে। তার খাটের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে একটু নড়াচড়া করলেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে আপত্তি জানায়।

আমি লেপের ভিতর থেকে মুখ বের করে মাহফুজ ভাইয়ার খাটের দিকে তাকালাম। সে জেগে উঠেছে। আমাকে তাকাতে দেখেই বলল, 'কীরে, ঘুম ভাঙার পরও এতক্ষণ ধরে মটকা মেরে পড়ে আছিস? ওদিকে যে উকিল সাহেব গলায় রক্ত তুলছে।'

মাহফুজ ভাইয়া বড় চাচার অবর্তমানে বড় চাচাকে উকিল সাহেব বলে সম্বোধন করে। নিজের বাবাকে বাবা না বলে যে কেউ অন্য কিছু বলে সম্বোধন করতে পারে এটা মাহফুজ ভাইয়াকে না দেখলে আমার বিশ্বাস হত না।

বড় চাচা ক্রিমিনাল কেসের নাম করা অ্যাডভোকেট। তাঁর খুবই নাম-ডাক। দু-হাতে পয়সা কামান। আমার রেজাল্ট তেমন ভাল নয় দেখে তিনি একদিন আমাকে বলেন, 'খোকন, তুই তো এমনিতে তেমন কোনও ভাল চাকরি জোটাতে পারবি না, তার চেয়ে এক কাজ কর, এল.এল.বি কমপ্লিট করে আমার সাথে লেগে পড়। আমি তোকে দাঁড় করিয়ে দেব।'

আমি বড় চাচার কথা মত এল.এল.বি পাশ করে তাঁর সাথে লেগে পড়েছি। মাহফুজ ভাইয়ার মত আমার অত সাহস নেই বড় চাচার কথা অমান্য করার। ওকালতি শিখতে বড় চাচার সাথে লেগে পড়ার প্রথম দিন তিনি আমাকে বলেন, 'শোন, ওকালতি ব্যবসার মূল মন্ত্র হচ্ছে, মক্কেল এলে প্রথমে তাকে শক্ত করে বাঁধবি। যাতে মক্কেল অন্য কোনও ল-ইয়ারের কাছে না যেতে পারে। যখন বুঝবি মক্কেলের অন্য কোথাও যাওয়ার আর সুযোগ নেই তখন তাকে শোয়াবি। এক পর্যায়ে আল্লাহু আকবর বলে জবাই দিবি।

BanglaBook.org

কোনও দয়া দেখাবি না। তা হলেই ভাল ল-ইয়ার হতে পারবি।'

তাঁর কথা শুনে আমি আঁতকে উঠে বলি, 'মক্কেল জবাই দেব!!!'

'আরে বেকুব, এই জবাই কি সেই জবাই! মক্কেলকে প্যাঁচে ফেলে তার থেকে যত খুশি টাকা পয়সা হাতিয়ে নিবি।'

মাহফুজ ভাইয়ার খাটের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ আবার শোনা গেল। সেই সঙ্গে সে-ও গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলল, 'কীরে, কিছু বলছিস না কেন? কী এত ভাবছিস?'

আমি আড়ষ্ট গলায় বললাম, 'কী বলব, শীতের সকালে লেপের ভিতর থেকে আমার বেরুতেই ইচ্ছে করে না।' হাই চেপে, 'আজ তোমার বিয়ে উপলক্ষে এত ভোরেই ঘুম থেকে উঠতে হচ্ছে। আবার বোধহয় ঠাণ্ডা পানিতে গোসলও করতে হবে। এই ভেবে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

'আমারও তো একই অবস্থা। তুই তো জানিস আমার গায়ে যতক্ষণ জানালা গলে রোদ এসে না পড়ে ততক্ষণে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি না।' বলা শেষ করেই মাহফুজ ভাইয়া জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল–

'(এই সব ভাল লাগে): জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালী রোদ এসে

আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়,–আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল–

এই নিয়ে খেলা করে: জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কী ভুল

পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে।'

BanglaBook.org

দুই

গোসল-টোসল সেরে আমরা সবাই তৈরি। সারা বাড়ি বিভিন্ন আতরের গন্ধে ভরপুর।

বড় চাচার হুকুম, পুরুষরা সবাই পাঞ্জাবি-পাজামা পরবে আর গায়ে আতর মাখবে। মেয়েরা শাড়ি। ব্যতিক্রম শুধু মাহফুজ ভাইয়ার ক্ষেত্রে, সে যেহেতু বর, সে পাঞ্জাবির উপর শেরওয়ানী আর মাথায় পাগড়ি পরবে।

প্রচণ্ড শীতের মাঝে আমরা এক-একজন শুধুমাত্র ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে ঠাণ্ডায় রীতিমত কাঁপছি। আমরা পুরুষরা হচ্ছি–আমি, বড় চাচা, বাবা, ছোট চাচা, ফুপাত ভাই ফরহাদ ভাইয়া, মাহফুজ ভাইয়ার বন্ধু মিজান ভাইয়া, আমার বন্ধু আরিফ, দুলা ভাই অর্থাৎ মাহফুজ ভাইয়ার বড় বোন হেনা আপার হাজবেণ্ড, আমাদের বাড়ির কাজের ছেলে হায়দার, বড় চাচার মুহুরি (উকিলের সহকারী) নূর মহম্মদ চাচা। মাহফুজ ভাইয়াকে সহ আমরা পুরুষরা মোট এগারোজন। আর মেয়েরা হচ্ছে পাঁচজন। হেনা আপা, ছোট চাচার দুই মেয়ে এনি-অনি আর তাদের দুই বোনের দুই বান্ধবী।

বড় চাচা, আমার বাবা আর ছোট চাচা তিন ভাই-ই ধবধবে সাদা রঙের, হাঁটুর নীচ অবধি ঝুল, মাওলানারা যেমন পাঞ্জাবি পরে তেমন পাঞ্জাবি আর গোড়ালির উপরে ওঠানো পাজামা পরেছেন। চোখে ঘন করে সুরমা লাগিয়েছেন। এই সাজ-পোশাকে বাবা এবং ছোট চাচাকে তা যা-ও বা মানিয়েছে বড় চাচাকে একেবারে বেখাপ্পা লাগছে। বেশ কিছু দিন হলো বড় চাচা দাড়ি রেখেছেন। এক গোছা ছাগুলে দাড়ি। সব সময় কালো কোট-টাই পরা বড় চাচাকে মাওলানাদের মত পোশাকে কেমন গ্রামের ধান্দাবাজ বাটপাড় লোকদের মত দেখাচ্ছে।

মাহফুজ ভাইয়ার বড় বোন হেনা আপা খুবই আহ্লাদী ধরনের মেয়ে। তার সাজ-সজ্জার দেরির কারণে আমাদের আধঘণ্টা লেট হয়ে যায়। সকাল নয়টার মধ্যে আমাদের ঘর থেকে বেরুবার কথা থাকলেও বেরুতে-বেরুতে দশটা বাজে। হেনা আপার দেরি হচ্ছে দেখে বড় চাচা বলেছেন, 'হারামজাদীকে প্যাক কাদার মধ্যে আচ্ছা মত চুবিয়ে সেই অবস্থায় বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। যত সব ননসেন্স!'

বড় চাচার কথা শুনে হেনা আপা কেঁদে-কেটে অস্থির। সে কাঁদতে-কাঁদতে জানায়, সে বিয়েতে যাবে না। তাকে সাধাসাধি করে রাজি করাতে আরও আধ ঘণ্টা লেগে যায়। কাঁদার কারণে কাজল লেপ্টে হেনা আপার চেহারা হয়েছে ভূতের মত। সেই অবস্থায়ই সে রওনা দেয়।

BanglaBook.org

দুটো মাইক্রোবাসে চেপে আমরা প্রথমে যাব লঞ্চ ঘাট। সেখানে ছোট্ট একটা লঞ্চ আমাদের জন্য ভাড়া করে রাখা হয়েছে। লঞ্চে চড়ে কনের বাড়ি মেহেন্দিপুর গ্রামে। আমাদের মেহেন্দিপুর পৌঁছতে বেলা দুটো থেকে আড়াইটা বাজবে।

এই বিয়ে ঠিক করেছেন বড় চাচা। বেকার ছেলের জন্য নাকি এর চেয়ে ভাল মেয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। মেয়ের বাপের ধান-চালের আড়ত আছে, মাছের ঘের আছে, বেশ কয়েক বিঘা খাস জমি আছে, আরও যেন কী সব। মোদ্দা কথা গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবার।

আমি ভেবেছিলাম গ্রামের মেয়ে শুনে মাহফুজ ভাইয়া রাজি হবে না। মাহফুজ ভাইয়াকে যখন কনের ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো–মেয়ে পছন্দ হয়েছে? মাহফুজ ভাইয়া নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছে, 'পছন্দ হয়েছে মানে, খুব পছন্দ হয়েছে। মা-কালীর মত চেহারার কোনও মেয়ের ফটো এনে দেখালেও আমার পছন্দ হত। দুনিয়ার তাবৎ মেয়েই আমার পছন্দ। একটা হলেই হলো।'

লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। ভটভট করে ইঞ্জিনের বিকট শব্দ হচ্ছে।

লঞ্চ ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মাহফুজ ভাইয়া বড় চাচার কাছে দু-দুবার ধমক খেয়েছে। ধমকের কারণ মাহফুজ ভাইয়া তার মাথার পাগড়ি খুলে হাতে ধরে দাঁড়ানো। পাগড়ি হাতে ধরে দাঁড়াতে দেখে বড় চাচা খেঁকিয়ে উঠে বলেছেন, 'হারামজাদা, পাগড়ি খুলে হাতে ধরে আছিস ক্যান? পাগড়ি কি হাতে ধরে রাখার জিনিস? শীঘ্রি পর। বিয়ের বরকে পাগড়ি মাথায় ছাড়া মানায় না।'

মাহফুজ ভাইয়া সুবোধ বালকের মত পাগড়ি পরে নেয়। বড় চাচা সামনে থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলে হাতে নেয়। একটু পরে বড় চাচা এসে পাগড়ি হাতে দেখে আবার রাম ধমক দেন।

আমি, আরিফ, মাহফুজ ভাইয়া, মিজান ভাইয়া, ফরহাদ ভাইয়া লঞ্চের ছাদে উঠে এসেছি সিগারেট টানার জন্য। বাতাসে সিগারেট ধরাতে বেশ সমস্যাই হলো। দ্রুত সিগারেট শেষ করার জন্য প্রত্যেকে কষে-কষে সিগারেট টানছি। কারণ প্রত্যেকের মনেই উৎকণ্ঠা যে কোনও মুহূর্তে বড়

BanglaBook.org

চাচা ছাদেও উঠে আসতে পারেন। বড় চাচার বিচরণ তো আবার সর্বক্ষেত্রে।

ছাদে বসে নদীর দু-পাশটা খুব ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে। দু-পাড়েই কোথাও ছায়া ঘেরা সবুজ বনানী, কোথাও বিস্তীর্ণ ফসলের খেত, কোথাও গৃহপালিত পশু সমেত তাদের চারণ ভূমি, কোথাও শত বছরের পুরানো ঝুরি নামানো বট গাছ, সেই বটের ছায়ায় কৃষকের জিরানো...স্কুল,কলেজ, মসজিদ, ছোট ছোট খুপরি দোকান, গ্রাম্য টিনের বাড়ি, সেই বাড়ির সুবিশাল উঠানে ধান, ডাল, তিল, সরিষা শুকাতে দিয়ে গৃহিণীর বিষণ্ন মুখে বসে থাকা, কোনও কোনও গৃহিণীর উঠান ঝাড়ু দেওয়া, নদীতে নেংটা-নেংটা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের ঝাঁপাঝাঁপি...সব মিলে মনটা কেমন উদাস লাগছে! দৃশ্যগুলোকে প্রতিনিয়ত পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আমাদের লঞ্চের আশপাশে দু-একটা মাছ ধরা ছোট ছোট নৌকাও দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও নদী বেশ চওড়া হয়ে যাচ্ছে। তখন আর নদীর দু-ধার স্পষ্ট দেখা যায় না। তাকালে কেমন ধু-ধু লাগে।

লঞ্চটা এখন নদীর চওড়া একটা জায়গায়। চারদিকে ধু-ধু। হঠাৎ লঞ্চটা থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ বিকট ভাবে ঘড়-ঘড় শব্দ করল। ছাদ থেকে আমরা পাঁচজন নেমে পড়লাম লঞ্চ থেমে গেল কেন তা অনুসন্ধানের জন্য।

লঞ্চের সারেং-এর কাছে গিয়ে দেখি আমাদের আগেই সেখানে বড় চাচা। বড় চাচার মুহুরি নূর মহম্মদ চাচা আর দুলা ভাই উপস্থিত। বড় চাচা সারেং-এর সাথে কথা বলছেন।

সারেং লোকটার বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে হয়তো। মুখ ভর্তি খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। শক্ত-পোক্ত চেহারা। মাথা জুড়ে টাক।

বড় চাচা সারেং লোকটাকে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হলো?'

সারেং লোকটা সামনে তাকানো অবস্থা থেকে বড় চাচার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'কোতায় কী হইছে?'

'লঞ্চ থেমে গেল কেন?'

সারেং পিচ করে থুথু ফেলে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'লঞ্চ ডুবো চরে আটকা পড়ছে।'

'এখন কী হবে?'

BanglaBook.org

'উপরওয়ালা নসিবে যা লিখছে তাই হবে।'

'চর থেকে লঞ্চ ছাড়াতে কতক্ষণ লাগবে?' বড় চাচার গলার স্বর চটে যাচ্ছে।

'বলা যায় না, এক ঘণ্টাও লাগতে পারে আবার এক মাসও লাগতে পারে। আগেই তো কইছি নসিবে যা লেখা।' বলা শেষে সারেং পিচ করে আবার থুথু ফেললেন।

বড় চাচা সারেং লোকটাকে আর কিছু না বলে আমাদের নিয়ে সারেং-এর সামনে থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে বললেন, 'হারামজাদা কী বলল শুনেছিস—এক মাসও নাকি লাগতে পারে! হাত-পা বেঁধে হারামজাদাকে নদীতে ফেলে দিলে কেমন হয়। দেখি ওর উপরওয়ালা ওকে বাঁচায় কিনা। কেস-ফেস হলে আমি দেখব। এসব কেস আমার কাছে কিছুই না, ক্যাপসুলের মত গিলে ফেলব।'

বড় চাচার কথা শুনে দুলাভাই বললেন; 'সারেংকে নদীতে ফেলে দিলে লঞ্চ চালাবে কে?'

বড় চাচা আর কিছু না বলে রাগে গজরাতে-গজরাতে আমাদের সামনে থেকে চলে গেলেন। তাঁর পিছন পিছন নূর মহম্মদ চাচাও গেলেন।

আমরা আবার সারেং-এর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললাম, 'ভাই, ডুবো চর থেকে লঞ্চটা ছুটাবার কোনও ব্যবস্থা নিন। নসিবের ওপর ভরসা করে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো হবে না।'

'জি, ব্যবস্থা নেওয়া হইছে। লঞ্চের খালাসিগো জানানো হইছে। তারা বাঁশ, দড়ি, কপিকল নিয়া এখনই চরে নেমে পড়বে লঞ্চ ছাড়ানোর জন্য।'

দুলাভাই আমাদের পাঁচজনকে বললেন, 'যাও তোমরা, লঞ্চের নীচতলায় খালাসিদের কাছে গিয়ে তাদেরকে তাগাদা দিয়ে আসো। এমনিতেই রওনা দিতে-দিতে আমাদের অনেক দেরি হয়েছে। তার ওপর এভাবে লঞ্চ চরে আটকা পড়ে থাকলে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমি গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আব্বাকে শান্ত করি।'

আমরা পাঁচজন নীচতলায় খালাসিদের কাছে এসেছি। আটজন খালাসি। তারা গোল হয়ে বসে গাঁজার কলকে টানছে। তাদের চোখ লাল। চেহারা ঢুলুঢুলু। প্রত্যেকের বয়সই বোধহয় পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে। শুধু

BanglaBook.org

একজন, তাদের দলপতি, বোধহয় তার বয়স কিছুটা বেশি।

আমি বললাম, 'লঞ্চ চরে আটকা পড়ে রয়েছে আর আপনারা এখনও বসে আছেন?'

দলপতি ধাঁচের লোকটি বলল, 'এহনই আমরা নেমে পড়মু, গা-ডা একটু গরম করে লই।'

গাঁজার কলকে দেখে মাহফুজ ভাইয়া উৎসাহিত গলায় বলল, 'আপনাদের সাথে আমিও যদি কলকেতে দু-একটা টান দিতে চাই, দিতে দিবেন?'

খালাসিদের দলপতি বলল, 'অবশ্যই, ভাইজান, আহ্‌লান ওয়াছ সাহ্‌লান।'

মাহফুজ ভাইয়া কান খাড়া করে বলল, 'কী বললেন, ভাই, ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

দলপতি লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'লঞ্চের চাকরিতে ঢোকার আগে দুই বচ্ছর সৌদি ছিলাম। মাঝে-মইধ্যে সৌদির ভাষা আইসা যায়। বলছি, আমাগো ভুবনে আপনেরে স্বাগতম।'

মাহফুজ ভাইয়া খালাসিদের সাথে গোল হয়ে বসল। খালাসিদের দলপতি খুবই আগ্রহ সহকারে জ্বলন্ত কলকে মাহফুজ ভাইয়ার হাতে তুলে দিল। কলকেতে টান দেবার আগে মাহফুজ ভাইয়া আমার দিকে তাকাল। আমার চোখে চোখ পড়তেই আমি বললাম, 'ভাইয়া, তুমি ওসব হাবিজাবি খেয়ো না। মনে রেখো, আজ কিন্তু তোমার বিয়ে।'

মাহফুজ ভাইয়া আমুদে ভঙ্গিতে বলল, 'কবিদের সব ধরনের অভিজ্ঞতা দরকার। কলকে টানার অভিজ্ঞতা গ্রহণের এমন সুযোগ আমি ছাড়তে চাই না।'

খালাসিদের দলপতি অবাক হয়ে বলল, 'ভাইজান, আপনে কবি!! তা আগে বলবেন না! দেখি আপনার পা'টা একটু আগান তো, পায়ের ধুলা নি। নাহ! শুধু পায়ের ধুলা নিলে হইবে না, আপনের পা ধোয়া পানি খামু। ছোডকালে কবিতা মুখস্থ করতে পারি নাই বইলাই ছ্যারে স্কুল থেইকা খেদাইয়া দিছে। আর লেহা-পড়া হয় নায়। তয় একটা কবিতা খুব মনে ধরছেলে। এহনও মনে আছে। ওই যে আতা গাছে তোতা পাখি/ ডালিম

BanglaBook.org

গাছে মৌ/ এত ডাকি তবু কথা কও না কেন, বউ। এই কবিতাটা পইড়া হেই ছোডকাল হইতে বউয়ের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে অল্প বয়সে বিয়া কইরা এহন আমার এই দশা।'

খালাসিদের সাথে পাগড়ি মাথায় মাহফুজ ভাইয়া কলকে টানছে। এক-একজন দুটো-দুটো করে টান দিয়ে কলকে পাশের জনের হাতে দিচ্ছে। এভাবে কলকে হাতে-হাতে ঘুরছে। হাতে-হাতে কলকের তিনটা চক্কর শেষেই দেখি মাহফুজ ভাইয়ার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। চোখ কেমন বোজা-বোজা হয়ে রক্ত বর্ণ ধারণ করেছে। কথাবার্তাও জড়িয়ে যাচ্ছে।

কলকে টানার পর্ব শেষ করে খালাসিদের দলপতি লোকটা উঠে গিয়ে বড় সাইজের একটা পানি ভর্তি স্টিলের গ্লাস এনে মাহফুজ ভাইয়ার হাতে দিয়ে বলল, 'ভাইজান, দেন আপনার পা ধুইয়া দেন। আপনের পা ধোয়া পানি খাইয়া চর থেইক্যা লঞ্চ ছুটাতে নাইমা পড়ি।'

মাহফুজ ভাইয়া জড়ানো গলায় বলল, 'আপনার ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। পা ধোয়া পানি খেতে হবে না। আমার পাগড়িটা আপনার মাথায় পরিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে দিচ্ছি। পাগড়ি মাথায় দিয়ে লঞ্চ ছুটাতে নেমে পড়ুন।'

খালাসিরা খালি গায়ে লুঙ্গি মালকোঁচা দিয়ে বাঁশ, দড়ি, কপিকল নিয়ে ডুবো চরে নেমে পড়েছে। ডুবো চরের উপর তাদের কোমর অবধি ডুবে গেছে। দলপতির মাথায় মাহফুজ ভাইয়ার পাগড়ি। পাগড়ি মাথায় সে হাঁক-ডাক দিয়ে অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছে। তার মাথা থেকে পাগড়িটা বেশ কয়েকবার পানিতে খসে পড়েছে। ভেজা পাগড়িই উঠিয়ে আবার সে মাথায় পরে নিয়েছে।

খালাসিদের দলপতির মাথায় পাগড়ি দেখে বড় চাচার তো হার্ট-অ্যাটাক করার অবস্থা। তিনি কার কাছ থেকে যেন এটাও জেনেছেন, মাহফুজ ভাইয়া গাঁজার কলকে টেনেছে।

ছোট চাচার দু-মেয়ে এনি আর অনি এবং তাদের দুই বান্ধবী, এরা আছে মহানন্দে। এরা যা দেখে তাতেই মজা পায়। মাঝ নদীতে লঞ্চ চরে আটকা পড়েছে এতেও তাদের আনন্দের সীমা নেই। মাহফুজ ভাইয়া গাঁজার কলকে টেনেছে এতেও তারা খুব খুশি। মাহফুজ ভাইয়ার কলকে

BanglaBook.org

টানার খবর পেয়ে বড় চাচা ঘোষণা করেছেন–বউ নিয়ে বাসায় পৌঁছবার পর মাহফুজ ভাইয়াকে টয়লেটের কমোডের তিন গ্লাস পানি খাইয়ে বরণ করা হবে, এটা শুনেও তারা অত্যন্ত মজা পাচ্ছে। হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। হাত ধরাধরি করে সারা লঞ্চ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বড় চাচার ঘোষণা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। খালাসিদের দলপতির মাথায় পাগড়ি দেখেও তারা খুব মজা পাচ্ছে। যে যার মোবাইল ফোনে খালাসিদের দলপতির খালি গায়ে, মালকোঁচা দেওয়া, পাগড়ি মাথার ফটো তুলছে। আসলে তাদের বয়েসটাই হচ্ছে মজা পাওয়ার বয়েস।

তিন

ঘণ্টা দুই ধরে খালাসিরা শত চেষ্টা আর কৌশল প্রয়োগ করেও চর থেকে লঞ্চটা ছুটাতে পারল না। তারা ব্যর্থ হয়ে লঞ্চে উঠে এসেছে। খালাসিদের দলপতির মাথায় মাহফুজ ভাইয়ার পাগড়িটা দেখা যাচ্ছে না। চর থেকে লঞ্চ ছুটাবার চেষ্টার কোনও এক ফাঁকে মাথা থেকে পাগড়িটা নদীতে খসে পড়ে ভেসে গেছে। লঞ্চে ওঠার পর মাহফুজ ভাইয়ার সাথে দলপতির দেখা হতেই বলল, 'ভাইজান, গ্রেট মিসটেক! আপনের পাগড়িটা কোন্ সময় যেন নদীতে ভ্যাইসা গেছে, টের পাই নাই। আপনে আমারে এর জন্য যেকোনও শাস্তি দিতে পারেন।'

সারেং-এর কাছ থেকে জানা গেল, এখন আমাদের সামনে একটি পথই খোলা আছে। তা হলো-সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। সন্ধ্যা ছয়টায় নদীতে জোয়ার আসবে। জোয়ারে নদীর পানি বেড়ে যাবে। তখন নিজে থেকেই লঞ্চটা চর থেকে ছুটে যাবে।

একটা প্রবাদ আছে, অধিক শোকে পাথর। বড় চাচার এখন সেই অবস্থা। তিনি লঞ্চের একটা কেবিনে ঢুকে চুপচাপ বসে রয়েছেন। তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন নূর মহম্মদ চাচা। ভদ্রলোক মন খারাপ করে বসে রয়েছেন। তিনি তাঁর বসের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। তিনি তাঁর বসকে ছায়ার মত

BanglaBook.org

অনুসরণ করেন। বসের মন ভাল থাকলে তাঁর মনও ভাল থাকে। বসের মন খারাপ থাকলে তাঁর মুখও বেজার থাকে। বস যেহেতু মন খারাপ করে বসে আছেন তাঁকেও মুখ বেজার করে বসে-বসে বসকে সঙ্গ দিতে হচ্ছে।

লঞ্চ সন্ধ্যা ছয়টার আগে চর থেকে ছাড়া পাচ্ছে না এই খবরে এনি-অনি এবং তাদের দুই বান্ধবী মহা খুশি। এ খবরে আমাদের বাসার কাজের ছেলে হায়দারকেও খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। হায়দারের বয়স তেরো কি চোদ্দ। এরই মধ্যে বিড়ি টানার অভ্যেস করেছে। আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে সে বিড়ি টানে। এ ছাড়া তার আর একটা দিক আমি লক্ষ করেছি, সে সব সময় মেয়েদের পিছন-পিছন ঘুরঘুর করে। লঞ্চে ওঠার পর থেকে সে এনি-অনিদের সাথেই লেগে আছে।

হেনা আপা আর দুলাভাই একটা কেবিনের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চাপা স্বরে ঝগড়া করছে। তাদের ঝগড়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে না।

বেলা তিনটা বেজে গেছে। খিদেয় সবার অবস্থা কাহিল। লঞ্চে খাওয়ার মত বলতে গেলে কিছুই নেই। কনের বাড়িতে নেবার জন্য অবশ্য বড়-বড় পাঁচটি প্যাকেট ভর্তি রসগোল্লা আছে। এক-এক প্যাকেটে দুই শ' করে। কিন্তু সেই রসগোল্লা থেকে একটিও যদি কেউ খাই তা হলে বড় চাচা কেয়ামত ঘটাবেন।

খালাসিরা ভাত রান্না করছে। কম দামের মোটা চালের ভাত। সেই ভাত রান্না নাকে তীব্র লোভনীয় গন্ধ হয়ে ধরা দিচ্ছে।

খালাসিরা আমাদের জন্যও ভাত রান্না করেছে। টিনের থালায় ভাত বেড়ে আমাদের প্রত্যেকের জন্য ভাত পাঠাচ্ছে। ভাতের থালা আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের কাজের ছেলে হায়দার। প্রত্যেক থালায় ভাত ছাড়া আর রয়েছে লাল রঙের শুকনো মরিচ ভর্তা। এই মরিচ ভর্তা দিয়েই ভাত খেতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও তরকারি নেই।

হায়দার প্রত্যেকের হাতে ভাতের থালা দিতে দিতে বলছে, 'ফাটা বাঁশে বিচি আটকাইছে, কী আর করার!'

মরিচ ভর্তা দিয়েই খুব তৃপ্তি সহকারে সবাই ভাত খেয়ে উঠলাম। প্রচণ্ড ঝাল মরিচ ভর্তায়ও যে এত স্বাদ লুকিয়ে থাকতে পারে তা আমার

BanglaBook.org

কল্পনাতেও ছিল না। তবে খাওয়া শেষে নাক, কান, ঠোঁট সমস্ত মুখমণ্ডল দিয়ে গরম ভাপ বেরুচ্ছে। খালাসিদের যে এই মরিচ ভর্তা করেছে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে এই মরিচ ভর্তা করা হয়েছে। সে জানাল, অনেকগুলো শুকনো মরিচ সরিষার তেলে ভেজে মচমচে করে, পিঁয়াজ কুচানো; ধনে পাতা কুচানো, সামান্য নারকেল বাটা ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে এই ভর্তা করা হয়েছে।

মাহফুজ ভাইয়ার কাছে এই মরিচ ভর্তা এতই ভাল লেগেছে যে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মরিচ ভর্তা নিয়ে সে একটি কবিতা রচনা করবে। কবিতার চারটি লাইন তার মাথায় এসেও পড়েছে। সেই চার লাইন আমাকে শুনিয়েছে–

মরিচ ভর্তা খেয়ে আমি হয়েছি দিওয়ানা,
মরিচ যে এত স্বাদের তা ছিল না জানা।
যদিও পেটের মাঝে আগুনের কারবার,
বদনা হাতে ছুটেছি সেথায় পদে পদে
বারবার।

মরিচ ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়ে এনি-অনি এবং তাদের দুই বান্ধবীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের নাক, কান, ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেছে।

মরিচ ভর্তা দিয়ে সবাই ভাত খেলেও বড় চাচা আর নূর মহম্মদ চাচা খেলেন না। নূর মহম্মদ চাচার বোধহয় খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে ছিল। তিনি কয়েকবার ঘুরে গেছেন আর নাক কুঁচকে, 'মরিচ ভর্তার ঘ্রাণটা তো খারাপ না,' বলে ঢোক গিলেছেন। তাঁর বস যেখানে উপোস থাকছেন সেখানে তিনি কী করে খান!

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হবার পরে খালাসিদের দলপতি মাহফুজ ভাইয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, 'ভাইজান, কলকের আসর আবার বসাইলে কেমন হয়? কুষ্টিয়ার ভাল গাঁজা আছে। খাইয়া বহুত মজা পাইবেন।'

মাহফুজ ভাইয়া সাগ্রহে বলল, 'খুবই ভাল হয়! দেরি করে কী লাভ, আয়োজন শুরু করা যাক।'

BanglaBook.org

চার

কনের বাড়ি পৌঁছতে রাত দশটা বাজল।

সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে নদীতে জোয়ার আসার পর চর থেকে লঞ্চ ছাড়া পেতে পৌনে সাতটা বা সাতটা বাজল। এর পরের তিন ঘণ্টা গেল বাকি পথটুকু অতিক্রম করতে। দিনের বেলার চেয়ে লঞ্চটা যেন অনেকটাই ধীর গতিতে চলেছে।

কনের বাড়ি পৌঁছে বেশ অবাক হলাম। সমস্ত বাড়ি জুড়ে কেমন যেন এক ধরনের স্তব্ধতা। অথচ বাড়িতে অনেক লোকজনের সমাগম। কিন্তু সবাই কেমন নীরব, চুপচাপ। বাড়িতে প্রবেশ পথের দু-ধারে রঙিন কাপড়ে পেঁচানো সুসজ্জিত প্রবেশদ্বার। বাড়ির উঠানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শামিয়ানা খাটানো। শামিয়ানার নীচে সারি-সারি চেয়ার-টেবিল সাজানো। টেবিলের উপরে পানি ভর্তি কাঁচের জগ, উপুড় করা ঝকঝকে প্লেট গ্লাস। এত কিছুর পরও বাড়িটাকে বিয়ে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না!

বিশাল বাড়ি। শামিয়ানা খাটানো খুঁটির সাথে ঝোলানো হ্যাজাক-বাতির আলোতে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, বাড়ির প্রবেশ পথটা ছাড়া বাকি তিনটা দিকে উঠান ঘিরে বিশাল-বিশাল তিনটা কাঠের তৈরি দোতলা ঘর।

আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার পর চার-পাঁচজন বিভিন্ন বয়সী লোক এসে আমাদের শুকনো মুখে অভ্যর্থনা করে তিনটা ঘরের একেবারে মাঝখানের ঘরটার একটা বিশাল কামরায় নিয়ে বসাল। বোধহয় এটাই বাড়ির বৈঠকখানা। আমাদের বসিয়ে লোকগুলো চলে গেল। পরিচয় পর্বও হলো না। এমনকী আমাদের সঙ্গে আনা মিষ্টির প্যাকেটগুলোও ভিতরে নিল না। লোকগুলোর চোখে-মুখে কেমন বিষাদের ছায়া।

বৈঠকখানায় প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমরা বসে আছি। সেই লোকগুলো

BanglaBook.org

আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে গেল আর কোনও খোঁজ-খবর নিতে এল না।

বড় চাচা ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'এ কোন্ অসভ্য-বর্বরের দেশে এসে পড়লাম! শুনেছি গ্রামে-গঞ্জে বরযাত্রী এলে বরযাত্রীর সামনে বিভিন্ন ধরনের শরবত, মিষ্টি, ফল-ফলাদি, পিঠা-পায়েস এনে ভিড় করে। এরা আমাদের পানি খেতেও দিচ্ছে না। যতসব ননসেন্স!!'

বড় চাচার বোধহয় খুব পানি পিপাসা লেগেছে। বড় চাচা লঞ্চে বসে শপথ করেছিলেন, মরিচ ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়া তো দূরের কথা, কনের বাড়ি পৌঁছবার আগে তিনি পানিও স্পর্শ করবেন না।

আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বাইরে তো অনেক লোকজন, বাইরে গিয়ে কাউকে ডেকে পানি চাই।'

আমার বন্ধু আরিফও আমার সাথে বাইরে বেরুল। আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখি, বাড়ির লোকজন সবাই কেমন ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করছে। আমাদের বয়সী এক লোককে কাছে ডেকে বললাম, 'ভাই, আমাদের পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায়?'

লোকটি ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'অবশ্যই! এখনই আমি কাউকে দিয়ে আপনাদের ওখানে পানি পাঠাচ্ছি।'

আমি আর আরিফ আবার বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমাদের পক্ষে বাইরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বড় চাচার হুকুমে আমাদের সবার গায়ে তো আবার পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবী। ভাগ্যিস পাঞ্জাবীর নীচে একটা টি-শার্ট পরে নিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝবয়সী এক লোক আর একটা বাচ্চা ছেলে আমাদের জন্য পানি নিয়ে এল। বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে বাড়ির চাকর শ্রেণীর কেউ। মাঝ বয়সী ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় দিলেন, বেলায়েত তালুকদারের শালা। বেলায়েত তালুকদার হচ্ছে কনের বাবা। অর্থাৎ এই লোকটি কনের মামা।

বড় চাচা ঝাঁঝের সঙ্গে কনের মামাকে বলতে লাগলেন, 'আপনাদের অবস্থা কী বলুন তো? আমাদের দিকে কোনও খেয়ালই করছেন না। লঞ্চ চরে আটকা পড়ে আজ সারাটা দিন আমরা নদীর ভিতরে কাটিয়েছি। ক্ষুধা-

BanglaBook.org

তৃষ্ণায় আমাদের বিধ্বস্ত অবস্থা! মোবাইলে নেটওয়ার্কও ছিল না যে ফোন করে জানাব। সন্ধ্যায় চর থেকে লঞ্চ ছাড়া পাবার পর আমার ভাইয়েরা চাচ্ছিল বাড়িতে ফেরত যেতে। আমি বলেছি, "না, আমরা ফেরত যাব না, যত রাতই হোক মেয়ের বাড়ি পৌঁছে, ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বউ নিয়ে ফিরব। তা না হলে মেয়ে পক্ষরা আমাদের ভুল বুঝবে।" এখন দেখছি আপনারা আমাদের দিকে কোনও নজরই দিচ্ছেন না। আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার সাথে শীতেও কষ্ট পাচ্ছি। সেই সকালে রওনা দিয়েছি, ভেবেছি দিন থাকতেই বউ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব। সঙ্গে কোনও শীতের পোশাক আনিনি।'

কনের মামা বললেন, 'ভাই সাহেব, আপনাদের জন্য এখনই শীতের পোশাকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে বরযাত্রীদের প্রত্যেকের জন্য আমরা চাদর কিনে রেখেছি। এটা আমাদের গ্রামের একটা রীতি। শীতের সময় বিয়ে হলে বরযাত্রীদের জন্য চাদর, গরমের সময় বিয়ে হলে হাতপাখা আর বর্ষার সময় বিয়ে হলে ছাতা।'

কনের মামা তাঁর সঙ্গে আসা বাচ্চা ছেলেটাকে নির্দেশ দিলেন, 'যা, বেলাল, চাদরগুলো নিয়ে আয়।'

বড় চাচার মেজাজ বোধহয় কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কোমল গলায় বললেন, 'বেলায়েত ভাই কোথায়? বেয়াইদের খোঁজ নিতে একবারও এলেন না?'

কনের মামা আমতা-আমতা করে বললেন, 'আসলে, ভাইজান, হয়েছে কী, এ বাড়িতে আজ একটা মেয়ে মারা গেছে। সেই মেয়েটার দাফন-কাফনের জন্যই দেরি হচ্ছে।'

কথাটা শুনে আমরা সবাই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। সমস্বরে বেশ কয়েকজন বলে উঠলাম, 'কী বলছেন!!! এমন শুভ দিনে এমন একটা দুর্ঘটনা!!!'

কনের মামা মাথা নুইয়ে চুপ করে রইলেন। বোধহয় তাঁর চোখ ভিজে উঠেছে। তিনি সেই ভেজা চোখ আমাদের দেখাতে চাইছেন না।

বড় চাচা বললেন, 'কী হয়েছিল মেয়েটার? মেয়েটা কি আগে থেকেই কোনও অসুখে ভুগছিল?'

BanglaBook.org

কনের মামা চোখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকালেন, কিন্তু বড় চাচার প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না।

পাঁচ

মৃত মেয়েটার দাফন-কাফন বোধহয় হয়ে গেছে। কনের বাড়ির লোকজন দেখছি এখন আমাদের বেশ তদারকি করছে।

শামিয়ানার নীচে চেয়ার-টেবিলে আমাদের খেতে বসিয়েছে। শুকনো মুখে আমাদের তারা খাবার পরিবেশন করছে। খুব লজ্জা লাগছে!!! এ বাড়ির একটা মেয়ে আজ মারা গেছে। মেয়েটাকে কবর দিয়ে এসে তারা আমাদের খেতে বসিয়েছে আর আমরা নির্লজ্জের মত গপগপ করে খাচ্ছি! কিছুই করার নেই! খিদের কাছে লজ্জা হার মেনেছে। আজ সারাদিনে লঞ্চে মরিচ ভর্তা দিয়ে কি না কী খেয়েছি, তা কি এত রাতে এখনও পেটে আছে! বড় চাচা অবশ্য ভদ্রতা করে একবার বলেছেন, 'বিয়ের পর্বটা শেষ করে খেতে বসলে হত না? আর আপনারা কেউ বসছেন না শুধু আমরাই বসছি, এটা কেমন দেখায়!'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা আবার বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে বসলাম। বড় চাচা, বাবা, ছোট চাচা, দুলাভাই আয়েশ করে পান চিবাচ্ছে। আমি, আরিফ, মাহফুজ ভাইয়া, মিজান ভাইয়া, ফরহাদ ভাইয়া সিগারেট খেতে বাইরে যাওয়ার জন্য উসখুস করছি। বড় চাচার ভয়ে যেতে পারছি না। দল বেঁধে বাইরে যেতে দেখলে নিশ্চয়ই তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দেবেন। এনি-অনি এবং তাদের দুই বান্ধবী ঘনঘন হাই তুলছে। হেনা আপা একটু পর পর আহ্লাদী কণ্ঠে বলছে, 'কনেকে তো এখন পর্যন্ত দেখা হলো না।' আর আমাদের বাড়ির কাজের ছেলে হায়দার গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে কাউকে পরোয়া করি না এমন ভঙ্গিতে বাইরে গেছে। যাওয়ার আগে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে গেছে, 'দেখছেন, ভাইজান, এরা প্রত্যেকটা সালুনে নুন বেশি দিছে। বদের বদ!

BanglaBook.org

যাতে আমরা বেশি খাইতে না পারি সেই ব্যবস্থা। যাই বাইরে গিয়া নাম কইর‍্যা আসি।' আসলে হায়দার হারামজাদা গিয়েছে বিড়ি টানতে। খাবারে লবণ বেশি দিয়েছে বলে যে বদনামটা করে গেছে সেটা পুরোপুরি সত্যি নয়, আবার মিথ্যেও নয়। আসলেই খাওয়ার সময় প্রত্যেকটা পদে লবণ বেশি মনে হয়েছে। এতে রান্নার কোনও দোষ নেই। রান্নায় লবণ ঠিকমতই দেওয়া হয়েছে। বরং আমাদের মুখেই লবণ বেশি মনে হয়েছে। কারণ খুব বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় জিভে লবণ-স্বাদ বেশি অনুভব হয়। এই ব্যাপারটা আমি রোজার সময় লক্ষ করেছি। সারা দিন রোজা রেখে ইফতারির সময় লবণ দেয়া কোনও খাবার খেলেই মনে হয় লবণ বেশি হয়েছে।

কনের বাড়ির বেশ কয়েকজন লোক এসে বৈঠকখানায় আমাদের সাথে সামিল হলেন। এঁদের মধ্যে বয়স্ক চেহারার লোকই বেশি। এঁদের একজনের সাথে বড় চাচা হাত মিলিয়ে কোলাকুলি করে বললেন, 'বেয়াই সাহেব, সেই কখন থেকে আপনার অপেক্ষা করছি।'

লোকটা ধরা গলায় বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, বেয়াই সাব!!! সর্বনাশ হয়ে গেছে!!!'

বড় চাচা সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, বেয়াই সাহেব, শুনেছি, এ বাড়ির একটা মেয়ে আজ মারা গেছে। কথাটা শোনার পর থেকে খুব খারাপ লাগছে। ধৈর্য ধরুন! যে মরে গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। আল্লার মাল আল্লা নিয়ে গেছে, মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

বড় চাচার কথায় বুঝতে পারলাম মুষড়ে পড়া এই লোকটিই হচ্ছেন কনের বাবা।

কনের বাবা আর কিছুই বললেন না। তাঁর ছলছল করা চোখ উপচে গড়িয়ে নামতে লাগল লোনা জল।

মৃত মেয়েটার সাথে কনের বাবার কী সম্পর্ক এটা এখনও বুঝতে পারছি না। এ বাড়ির অন্য সবার চেয়ে তাঁকেই বেশি শোকাহত আর কাতর দেখাচ্ছে।

বড় চাচা গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'বেয়াই সাহেব,

BanglaBook.org

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ভাগ্যের লিখন! তা না হলে এমন শুভ দিনে এমন একটা অঘটন কেন ঘটবে! মৃত মেয়েটার শোক বুকে চাপা দিয়ে এখন তো বিয়ের কাজটা সেরে ফেলা দরকার। অনেক রাত হয়ে গেছে। অন্তত সকাল নাগাদ আমরা যেন বউ নিয়ে রওনা দিতে পারি। বাড়ির এমন একটা পরিস্থিতিতে আমি বিয়ের ব্যাপারটা তুলতাম না, ছেলেকে বিয়ে না করিয়েই চলে যেতাম। কিন্তু বউ ছাড়া আমরা যদি ফিরে যাই তা হলে আমাদের এলাকার লোকজনের কাছে আমাদের অনেক লজ্জা পেতে হবে। এ ছাড়া আজ আমরা ফিরে গেলে এই বিয়েটাই হয়তো ভেঙে যাবে।'

বড় চাচার বলা শেষ হতেই হেনা আপা তার স্বভাবসুলভ আহ্লাদী কণ্ঠে টেনে-টেনে বলল, 'এখন পর্যন্ত কনেকে একটিবারের জন্যও দেখতে পেলাম না, কী আশ্চর্য! কনেকে দেখাতে আমাদের কেউ বাড়ির ভিতরে নিয়েও যাচ্ছে না!'

কনের বাবার পাশে বসা মোটা কাঁচের চশমা পরা, কনের বাবার বয়সীই, স্কুলের হেডস্যর-হেডস্যর চেহারার এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আপনারা কি জানেন, যে মেয়েটা মারা গেছে সে কে? একটু আগে কাকে আমরা কবর দিয়ে এসেছি? কেন সে মারা গেছে? কীভাবে?'

বড় চাচা লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই তো, এতক্ষণে একটি বারও জিজ্ঞেস করা হয়নি মেয়েটা কে! নিশ্চয়ই কোনও বাচ্চা মেয়ে? আগে থেকেই বোধহয় রোগে ভুগছিল?'

চশমা পরা ভদ্রলোক কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে থমথমে গলায় বললেন, 'যে মারা গেছে সে হচ্ছে বিয়ের কনে।'

ভদ্রলোক যেন ঘরের ভিতরে বোমা ফাটালেন। আমাদের সবার চেহারা মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে গেল, চোখ বড় হয়ে গেল। মুখ হাঁ হয়ে গেল। কানে কি ভুল শুনলাম!

বড় চাচা তোতলানোর মত ভঙ্গিতে কোনওক্রমে বললেন, 'কী বলছেন এসব!!! বিয়ের কনে মারা গেছে, মানে!!!'

চশমা পরা ভদ্রলোক তাঁর মুখটা কঠিন করে বললেন, 'সন্ধ্যা ছয়টার দিকে গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।'

'কেন? কেন? কেন?...' আমাদের অনেকের মুখ দিয়েই এই প্রশ্নটা

BanglaBook.org

বেরিয়ে এল।

'এর আগেও মেয়েটার দু-বার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। প্রথমবার বিয়ের দিন লঞ্চে চড়ে বরযাত্রী আসার পথে লঞ্চ ডুবে বরসহ প্রায় চোদ্দ-পনেরো জন বরযাত্রী মারা যায়। দ্বিতীয় বার বিয়ের দিন বরপক্ষ বিয়ে ভেঙে দেয়। তারা প্রথম বারের লঞ্চ ডোবার ঘটনা জানতে পেরে চিঠি পাঠায়, অপয়া মেয়েকে তারা বউ করবে না, এবারে নির্দিষ্ট সময়ে আপনারা না আসায়, আপনাদের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আপনাদের মোবাইল ফোনও বন্ধ পাই। আসলে আপনারা নদীর মধ্যে নেটওয়ার্কের বাইরে ছিলেন বলে বন্ধ সিগন্যাল পাই। অপেক্ষা করতে-করতে সন্ধ্যার দিকে আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করি, হয় কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে না হলে প্রথমবারের সেই লঞ্চ ডোবার ঘটনা জানতে পেরে আপনারা ফিরে গেছেন। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ না হয়। আপনাদের আসার সম্ভাবনা আর নেই...আমাদের এই সব আলাপ মিনা বোধহয় শুনতে পায়। মিনা মানে বিয়ের কনে। কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই সবার অলক্ষে মিনা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে, বিয়ের শাড়ি পরা অবস্থায়ই গলায় ফাঁস দেয়। আমরা যখন টের পাই তখন সব শেষ!'

চশমা পরা ভদ্রলোকের বলা শেষ হতেই কাঁদো-কাঁদো গলায় কনের বাবা বলে উঠলেন, 'মেয়েটার আমার ঠিক মত দাফন-কাফনও হলো না।'

দুলাভাই বলে উঠলেন, 'দাফন-কাফন হলো না মানে?! আমরা যে শুনলাম যে মেয়েটা মারা গেছে তাকে কবর দেয়া হয়ে গেছে!'

চশমা পরা ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন, 'আমাদের এই গ্রামে কেউ যদি আত্মহত্যা করে মারা যায়; তাকে গোসল করানো, সাদা কাফন পরানো বা জানাজা দেয়া হয় না। সে যে কাপড় পরা অবস্থায় মারা যায় সেই অবস্থায়ই তাকে কবর দেওয়া হয়। কবর দেওয়া হয় বললেও ভুল হবে, স্রেফ মাটি চাপা দেওয়া হয়। কবরের ভিতরে বাঁশ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ একজন সাধারণ মৃতের কোনও নিয়মই পালন করা হয় না। গ্রামের অশিক্ষিত ফতোয়াবাজরা এই নিয়ম করেছে। তবে গ্রাম অঞ্চল বলে থানা-পুলিশ, পোস্টমর্টেম-ফর্টেমের ঝামেলা থেকে রেহাই।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটার পর কনের বাবা ফুচ-ফুচ করে নাক টানতে-টানতে হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে বড় চাচার হাত ধরে ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন, 'বউ ছাড়া আপনারা ফিরে গেলে আপনাদের এলাকায় আপনাদের লজ্জা পেতে হবে, এমনি-এমনি বরযাত্রী ফেরত গেলে আমাদের গ্রামে আমাদেরও অনেক বদনাম হবে, এ ছাড়া গ্রামে একটা কথার প্রচলন আছে– বরযাত্রী এসে বিয়ে না করে ফিরে গেলে সেই বাড়ির ঘোর অমঙ্গল হয়, আমাদের এমনিতেই অনেক অমঙ্গল হয়ে গেছে, আর আপনি-আমি একে অপরকে বেয়াই বলে ডেকেও ফেলেছি, তাই এই সব দিক বিবেচনা করে আমি একটা প্রস্তাব দিতে চাই। যদি অনুমতি দিতেন।'

বড় চাচা কোমল গলায় বললেন, 'বলুন, কী প্রস্তাব।'

'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আপনারা আমার ছোট মেয়ে দিনাকে বউ করে নিয়ে যেতে পারেন।'

বড় চাচা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'অতি উত্তম প্রস্তাব। আমরা রাজি।' বলা শেষে বাবা এবং ছোট চাচার দিকে তাকিয়ে সায় চাইলেন।

বাবা এবং ছোট চাচা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন।

চশমা পরা ভদ্রলোক আবার মুখ খুললেন, 'তবে একটা কথা, আপনাদের যে ছেলের সাথে মিনার বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেই ছেলের সঙ্গে নয়। আপনাদের বাড়ির অন্য কোনও অবিবাহিত ছেলে থাকলে তার সঙ্গে। কারণ যার সাথে বড় বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার সাথে ছোট বোনের বিয়ে হওয়াটা ভাল দেখায় না। এ ছাড়া তাতে মিনার আত্মা কষ্ট পেয়ে অভিশাপ দিতে পারে। এমনিতেই মেয়েটা এক বুক অভিমান নিয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

বড় চাচা আমার দিকে আঙুল তাক করে বললেন, 'আমাদের বাড়ির অবিবাহিত ছেলে বলতে তো ও আছে। দেখুন ওকে আপনাদের পছন্দ...'

শেষ পর্যন্ত আমাকেই বলির পাঁঠা করা হলো।

শেষ রাতের দিকে বাড়ির ছোট মেয়ে দিনার সাথে আমার বিয়ে সম্পন্ন হলো। আমি মন থেকে কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছি না। কিন্তু বড় চাচার ভয়ে কোনও প্রতিবাদও জানাতে পারিনি।

BanglaBook.org

ভোরের সূর্যের দেখা মিলতেই আমরা বউ নিয়ে রওনা দিলাম।

কনের বাড়ির লোকজন আমাদের লঞ্চ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছে। এক মেয়ের মৃত্যু আর এক মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বিদায় দিতে এসে কনের আত্মীয়-স্বজন সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ছে। হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আমাকে কোনও কিছুই স্পর্শ করছে না। নব বধূর পাশে বসে আমি কেমন ঘোরের মধ্যে আছি। সবকিছু আমার কাছে কোনও স্বপ্ন দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে।

ছয়

বউ নিয়ে বাড়িতে ঢোকার পর-পরই আমি আর মাহফুজ ভাইয়া আমাদের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একটা লম্বা ঘুম দিই। ঘুম থেকে উঠলাম সন্ধ্যা নাগাদ। অবশ্য দুপুরের দিকে একবার জেগে উঠে হায়দারকে ডেকে দুপুরের খাবার আমাদের রুমে আনিয়ে খেয়ে-দেয়ে আবার ঘুম দিই।

নতুন বউয়ের খবর কিছুই জানি না। বউ নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সাথে-সাথেই বাড়ির মেয়েদের বউ নিয়ে অনেক আহ্লাদী ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করতে দেখেছি। বাড়ির মেয়েরা বলতে আমার মা, বড় চাচী, ছোট চাচী, হেনা আপা, এনি, অনি আমাদের বাড়ির কাজের বুয়া বাবরের মা। মাহফুজ ভাইয়া আর আমি আমাদের রুমে যেতে-যেতে শুনেছি মা-চাচীরা বলছেন, 'ওমা, বউয়ের কী মিষ্টি চেহারা! কী সুন্দর টানাটানা চোখ! গায়ের রঙটাও কী ফর্সা! একেবারে দুধে-আলতা...'

আমি আমার বউয়ের চেহারা এখন পর্যন্ত দেখিনি। আমাদের মধ্যে কোনও কথাও এখন পর্যন্ত হয়নি। অথচ লঞ্চে আসার সময় সারাক্ষণ সে আমার পাশেই লম্বা ঘোমটা টেনে বসা ছিল। ইচ্ছে হলেই তখন তাকে দেখতে পারতাম বা কথা বলতে পারতাম। কিন্তু আমি ফিরেও তাকাইনি। আমি কিছুতেই নিজেকে ধাতস্থ করতে পারছি না। পুরো ব্যাপারটাই এখনও আমার কাছে দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে।

মাহফুজ ভাইয়া আর আমি ঘুম থেকে ওঠার পর হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ

BanglaBook.org

হয়ে হায়দারকে ডেকে আমাদের জন্য চা আনালাম। সারাটা দিন ঘুমিয়েও গত রাত জাগরণের ক্লান্তি পুরোপুরি দূর হয়নি। চা শেষ করে আমরা সিগারেট ধরালাম। আমি চিন্তিত ভঙ্গিতে সিগারেট টানছি আর মাহফুজ ভাইয়া আয়েশি ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে সে ঠোঁট গোল করে ধোঁয়ার রিং বানাচ্ছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই এক গাল হেসে বলে উঠল, 'আরে, তুই এত ভেঙে পড়েছিস কেন? তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই একটা মেয়েকে বউ করে আনিসনি, জঙ্গল থেকে একটা বাঘিনী ধরে এনেছিস। অবশ্য মেয়েরা বাঘিনীর চেয়ে কম যায় না। বাঘিনী শিকার ধরে খেয়ে হজম করে ফেলে, মেয়েরাও স্বামী শিকার করে পুরোপুরি গ্রাস করে হজম করতে না পেরে আবার বমি করে উগরে ফেলে।'

আমি রাগান্বিত স্বরে বলে উঠলাম, 'দেখ, এই মুহূর্তে আমার কারও 'বমি' হবার কথা ছিল না, বরং তোমার হবার কথা ছিল।'

মাহফুজ ভাইয়া সশব্দে হেসে উঠে বলল, 'সবই ভাগ্যের লিখন। তোর ভাগ্যের লেখা, কী আর করার!'

'আমি না হয় বড় চাচার ভয়ে কোনও প্রতিবাদ জানাতে পারিনি, তুমি তো বড় চাচাকে তেমন ভয় পাও না, তুমিও তো কোনও প্রতিবাদ করলে না। এটা কেমন হলো–তোমার বিয়েতে গিয়ে আমি বিয়ে করে ফিরলাম। বর সেজে গেলে তুমি আর বিয়ে করলাম আমি!'

'যা হয়েছে ভালই হয়েছে। বিয়ের দিন ধার্য হলে পরে প্রতিটা ছেলের যে কি টেনশানের ভিতর দিয়ে দিন কাটে সেটা তুই টের পেলি না। হুট করে তোর বিয়েটা হয়ে গেল।'

'তোমার কি কোনও টেনশান হচ্ছিল?'

'হচ্ছিল না আবার! যখন দেখলাম আমার ওপর থেকে টর্নেডোটা গিয়ে তোর ওপর পড়ল, অমনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

'তোমাকে দেখে তো মনে হয়নি তোমার কোনও টেনশান হচ্ছিল। লঞ্চে খালাসিদের সাথে মিশে দিব্যি গাঁজার কলকে টেনে বেড়াচ্ছিলে।'

'আরে, টেনশান কাটাবার জন্যই তো গাঁজার কলকে টেনেছি। ভাল কথা মনে করেছিস, খালাসিদের কাছ থেকে খানিকটা গাঁজা তো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ইস, খেয়ালই ছিল না! পাঞ্জাবীর পকেটে রয়েছে। আয়, তুই আর

BanglaBook.org

আমি মিলে দুইটা সিগারেটে ভরে খেয়ে ফেলি। আমাদের কাছে তো আর কলকে নেই যে কলকেতে সাজাব।'

'আমি তোমার ওই গাঁজা-ফাঁজা খাওয়ার মধ্যে নেই। এমনিতেই আমার মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা! কথা নাই বার্তা নাই একটা বিয়ে করে ফেলেছি!!'

'আরে, বোকা! লোকে গাঁজা খায় কেন বল? টেনশান কমানোর জন্যই তো। দুইটা টান দে দেখবি সবকিছু ভাল লাগছে। তোর বউ নাকি এমনিতেই খুব সুন্দরী, গাঁজা খেয়ে চোখে দেখবি হুর-পরী। তখন সব টেনশান আনন্দে রূপ নেবে।'

মাহফুজ ভাইয়া অনেক ধৈর্যের সঙ্গে তার আনাড়ি হাতে দুটো গাঁজা ভরা সিগারেট বানাল। একটা সিগারেট আমার হাতে দিয়ে অন্যটা নিজের ঠোঁটে ঝোলাল। সিগারেট ঠোঁটে ঝোলানো অবস্থায়ই বলল, 'আয়, বারান্দায় গিয়ে ধরাই।'

আমি আতঁকে উঠে বললাম, 'বাসার ভিতরে বসেই ধরাবে?! বড় চাচা টের পেলে খবর আছে!'

'টের পাবে কী করে?'

'গন্ধ পেতে পারে না?'

'আরে নাহ, উকিল সাহেব গাঁজার গন্ধ বুঝবে না। যারা সিগারেট খায় না তারা গাঁজার গন্ধ আর সিগারেটের গন্ধের পার্থক্য ধরতে পারে না।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাহফুজ ভাইয়া গাঁজা ভরা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। কষে টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধরাচ্ছিস না কেন?'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'আমি তো কোনও দিনও খাইনি।'

'আরে, ধরিয়ে জাস্ট সিগারেটের মত টানবি।'

গাঁজা ভরা সিগারেট টানার পর এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। এই এক ঘণ্টা যে কীভাবে কেটে গেছে টেরই পেলাম না। বিশেষ সিগারেটটা টেনে শেষ করার পর-পরই মনে হলো মাথাটা যেন কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মেজাজটা ফুরফুরে লাগছে। কথা বলতে ভাল লাগছে, কথা শুনতে ভাল

BanglaBook.org

লাগছে, সিগারেট টানতে ভাল লাগছে। গত এক ঘণ্টায় যে কয়টা সিগারেট টেনেছি তার কোনও হিসেব নেই। মাহফুজ ভাইয়ার অবস্থাও বোধহয় একই। সে-ও একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে আর অনর্গল কথা বলছে। তার লেখা দুটো কবিতাও আবৃত্তি করে শোনাল।

কথায়-কথায় আরও এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। এখন আমি কিছুটা স্বাভাবিক। হায়দার আমাদের রাতের খাবার খেতে যাওয়ার জন্য ডাকতে এল। মাহফুজ ভাইয়া বিকট স্বরে হায়দারকে একটা ধমক দিয়ে বলল, 'যা, হারামির বাচ্চা, আমাদের খাবার এই ঘরে নিয়ে আয়। নতুন বউয়ের সামনে গিয়ে আমরা খেতে পারব না।'

হায়দার চলে যাবার পর আমি বললাম, 'হায়দারকে ওভাবে ধমক দিলে কেন? এমনিতেই তো বলতে পারতে, খাবার আমাদের ঘরে নিয়ে আয়।'

'হারামিটা বিরাট পাজি! সকালে আমরা বাসায় ঢোকার পরই উকিল সাহেবকে মনে করিয়ে দেয়, "মামা, মাহফুজ ভাইজানরে কমোডের তিন গ্লাস পানি খাওয়াইবেন না?" '

হায়দার খানিক পরে আমাদের খাবার নিয়ে এল। নতুন বউয়ের উপলক্ষে খাবারের আইটেম বেশ। পোলাও, রোস্ট, গলদা চিংড়ির মালাই-কারি, খাসির রেজালা, কলিজা ভুনা, মুরগীর চামড়া-গিলা দিয়ে মুগ ডালের ঘণ্ট, সবশেষে ক্ষীর-পায়েস।

অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠলাম। প্রতিটা পদই খুব সুস্বাদু হয়েছে। মুখের রুচিও যেন আজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। বোধহয় গাঁজা খাওয়ার কারণে।

খাওয়া শেষ করে ওঠার পর মাহফুজ ভাইয়া আবার দুটো গাঁজা ভরা সিগারেট বানাল। এবারে আগের মত ততটা ফিলিংস হলো না। তবে একেবারে কমও নয়।

রাত এগারোটা বাজে। মাহফুজ ভাইয়া হাই চাপতে-চাপতে বলল, 'তোর তো এখন তোর বউয়ের কাছে যাওয়া উচিত।'

আমি বললাম, 'কী বলছ! আমি এখন বউয়ের কাছে ঘুমাতে যাব! অসম্ভব!! যাকে আমি চিনি না জানি না, তাকে পাশে নিয়ে ঘুমাব!'

'এটাই নিয়ম।'

BanglaBook.org

'নিয়মের কাঁথা পুড়ি!'

'তুই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর, শত হলেও সে এখন তোর বউ। মেয়েটা তার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে চলে এসেছে শুধু মাত্র বিয়ে নামের শর্তের খাতিরে। নতুন পরিবেশে মেয়েটার মনটা কত ছোট হয়ে আছে, বুঝিস! এ ছাড়া মেয়েটার বড় বোনটা মাত্র কাল মারা গেছে!'

'বড় বোনটা আত্মহত্যা করেই তো যত সমস্যার সৃষ্টি করেছে।'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন বাস্তবতা মেনে নে।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রুমের ভিতরে হুড়মুড় করে হেনা আপা, এনি-অনি এবং তাদের দুই বান্ধবী ঢুকল। তাদের পিছনে হায়দারকেও দেখা যাচ্ছে।

হেনা আপা তার আহ্লাদী কণ্ঠস্বর চড়া করে বলল, 'চল, তোর বউয়ের কাছে বাসরঘরে চল।'

এনি-অনি বলে উঠল, 'খোকন ভাইয়া, আজ সারাদিন ধরে তোমার বাসরঘরটা যে কত সুন্দর করে সাজিয়েছি ভাবতেও পারবে না!'

এনি-অনি আমার দুই দিক দিয়ে দু-হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইল। হেনা আপা বলল, 'নতুন বউকে ফেলে উনি কুনো ব্যাঙ হয়েছেন। আজ দুপুরে, রাতে খাবার খেতে ডাইনিংয়েও যায়নি।'

মাহফুজ ভাইয়া আধ-শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে বলল, 'আরে, এত তাড়া কীসের? ও যাবে না তা তো বলেনি। ওকে একটু রেডি হতে দাও। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে একটা পাঞ্জাবী পরে যাক।'

BanglaBook.org

সাত

বাসরঘরে আমি আমার বউয়ের সামনে বসে আছি। সে লম্বা ঘোমটা টানা। এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। এভাবে বসে আছি প্রায় দশ মিনিট ধরে। নিজেকে ঘোরাচ্ছন্ন লাগছে। গাঁজার নেশা এখনও বোধহয় পুরো মাত্রায় আছে। বলার মত

কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে নিচু শব্দে গলা খাঁকারি দিলাম। অমনি সে-ও আমার মত গলা খাঁকারি দিল।

খুক-খুক করে দু'বার কাশি দিলাম অমনি সেও খুক-খুক করে দু'বার কাশি দিল। মুখ টিপে-টিপে বোধহয় হাসছেও। তার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। লম্বা করে ঘোমটা টানা বলে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমি বেশ অবাক হচ্ছি, সে কি আমার সাথে ইয়ার্কি করার চেষ্টা করছে!

আমার ইচ্ছে হচ্ছে রুম থেকে বেরিয়ে যাই। এমনিতেই খুব নার্ভাস ফীল করছি তার ওপর সে ইয়ার্কি মেরে আমাকে আরও নার্ভাস করে দিচ্ছে।

নড়েচড়ে বসলাম। হাত-পা কেমন অসাড় লাগছে। কিছু একটা বলা উচিত। এভাবে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়।

প্রায় তোতলাতে-তোতলাতে কোনওরকমে বলেই ফেললাম, 'তোমার নাম কী?'

সে নিচু শব্দে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'নিজের বউয়ের নাম তুমি জানো না?'

'সরি!!! ও মনে পড়েছে, নাম হচ্ছে দিনা। তা তুমি কেমন আছ?'

এবারে সে প্রায় শব্দ করে হেসে উঠল। হাসির স্থায়িত্বও বেশি হলো। আমি থতমত খেয়ে বলে উঠলাম, 'না, মানে, আমাদের বাড়িতে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন?'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল, 'না, মানে, জীবনের প্রথম বিয়ে তো, তাই।'

সে আবার খিলখিল করে হাসতে লাগল। প্রাণবন্ত হাসি। আমি পুরোপুরি হতবাক। গ্রামের একটা মেয়ে, যে কিনা নতুন বউ, যার বড় বোন মাত্র কাল মারা গেছে, সে কীভাবে বাসররাতে স্বামীর সঙ্গে এমন নির্লজ্জের মত সহজ-সাবলীল আচরণ করছে!! সে আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন না করে 'তুমি' বলেই শুরু করেছে! শুনেছি নতুন বউদের 'আপনি' থেকে তুমি বলাতে নাকি ছয় মাস পর্যন্ত লেগে যায়।

সে মিহি গলায় বলে উঠল, 'হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ কেন, ঘোমটা

BanglaBook.org

তুলে আমাকে দেখবে না? রাত ফুরিয়ে যাবে যে।'

নতুন বউয়ের নির্লজ্জের মত কথা শুনে আমি হতভম্বের উপরে হতভম্ব হচ্ছি। কোনওক্রমে বললাম, 'না, মানে...'

'না, মানে কী! এভাবে লজ্জায় আর গুটিয়ে থেকো না তো। রাত ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে গেলে এই রাতটা আর কোনও দিনও পাওয়া যাবে না! হয়তো আমাকেই আর পাবে না।'

কাঁপা-কাঁপা হাতে আমি ঘোমটা তুললাম। অমনি বড়-বড় ভাসা-ভাসা দুটি চোখ মেলে আমার দিকে সে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আমার হৃদয়ে ঝড় উঠল। অপরূপ রূপবতী সে! সমস্ত মুখখানা একেবারে নিখুঁত। বাস্তবে এমন মিষ্টি চেহারার মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি! মাঝে-মাঝে হিন্দি সিরিয়ালে এমন চেহারার মেয়ে দেখা যায়। মাহফুজ ভাইয়ার কথা মত গাঁজার প্রভাবেও এমন লাগতে পারে। সত্যিই তাকে আমার হুর-পরী মনে হচ্ছে। তবে চেহারার সাথে তার বড় বোন মিনা, যার সঙ্গে মাহফুজ ভাইয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, সেই চেহারার অনেক মিল। অবশ্য মিনাকে সরাসরি দেখিনি, ফটো দেখেছিলাম। বোনে-বোনে চেহারায় মিল থাকতেই পারে!

তার রিনিঝিনি কণ্ঠ আবার বেজে উঠল, 'আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকবে? কিছু বলো। না হয় একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও।'

আমি লজ্জা পেয়ে থতমত খেয়ে বললাম, 'না, মানে...কবিতা!...আমি তো কোনও কবিতা জানি না!'

'কী বলছ! সারা দিন-রাত এক জন কবির সঙ্গে থেকেও কোনও কবিতা জানো না?'

আমতা-আমতা করে বললাম, 'আমার ঠিক কবিতা মুখস্থ হয় না।'

'একটি কবিতাও তোমার মুখস্থ নেই?!'

'আছে, মানে ছোট বেলায় যে সব কবিতা মুখস্থ করেছিলাম।'

'তা থেকেই একটা শোনাও।'

আমি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম–

'হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম

BanglaBook.org

তাদের খাড়া দুটো শিঙ
তারা হাট্টিমা টিম টিম।'

আমার কবিতা আবৃত্তি শুনে সে খলবল করে হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ে বলল, 'এটা তো কবিতা নয়, এটা একটা ছড়া।'

আমি গাল ফুলিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম। আমার গম্ভীর চেহারা দেখে সে আমার হাত চেপে ধরে মলিন স্বরে বলল, 'আমার বেহায়াপনা দেখে তোমার কি খুব রাগ লাগছে? প্লিজ, রাগ কোরো না! আমি অনেক আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, বাসর রাতে আমি আমার স্বামীকে এমন কিছু কথা বলব যাতে সে ভড়কে যায়।' কথাটা বলতে-বলতে তার দু-চোখের কোনা বেয়ে লোনা জল গড়িয়ে নামল।

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। এ কেমন রহস্যময়ী নারী! একটু আগেই যে হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল এখন তার চোখে জল।

সে তার হাত ভর্তি চুড়ির রুনুঝুনু শব্দ তুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে বলল, 'ভ্যাবদার মত আজ সারা রাত তুমি কি বসেই থাকবে? আজকের এই রাত ফুরিয়ে গেলে আর কোনও দিনও ফিরে পাওয়া যাবে না!' শেষের লাইনটা কেমন যেন হাহাকারের মত শোনাল।

আমি বোবা চোখ মেলে নিষ্পলক তাকিয়েই আছি। যতই তাকে দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে সে আমার হাত দুটো তার কাঁধে তুলে নিয়ে গাঢ় আবেশ মেশানো কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাকে তুমি আদর করবে না? রাত যে ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

আমার অবস্থা হতবিহ্বল। কোনও নারীর এতটা সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য এর আগে আমার আর কোনও দিনও হয়নি। তাই এমন মুহূর্তে কী করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যিই নিজেকে এখন ভ্যাবদাই মনে হচ্ছে।

নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ ধরে চোখে-চোখে তাকিয়ে থাকার পর আচমকা সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটের উপর তার নরম পেলব ঠোঁট দুটো রাখল। ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের উপর অস্থির হয়ে উঠল।

আর ভ্যাবদা হয়ে বসে থাকা যায় না! শত হলেও আমি একটা পুরুষ।

BanglaBook.org

সেই পুরুষ, যে পুরুষ জীবনে কোনওদিনও এমনভাবে কোনও নারীকে কাছে পায়নি!

আট

মোবাইল ফোনের রিংয়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ফোনটা বেড সাইড টেবিলের উপরে রাখা। ঘুম ভেঙে ধাতস্থ হয়ে কলটা রিসিভ করতে-করতে রিংয়ের শব্দ থেমে গেল। চোখ পড়ল দেয়াল ঘড়িতে। সকাল সাতটা বাজে। আরও কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারলে ভাল হত। বলতে গেলে গত রাতটা সারা রাতই না ঘুমিয়ে অচেনা সুখের আবেশে কেটেছে। বাসররাতে নতুন বউকে পাশে নিয়ে সারা রাত জেগে থাকাটাই তো স্বাভাবিক। রাতের কথা মনে পড়ে খুব লজ্জা লাগছে। আজ আমি বাড়ির কারও সামনে পড়ব না। বিশেষ করে মাহফুজ ভাইয়ার সামনে। খুব লজ্জা লাগছে আমার!

আশ্চর্য! বিছানায় আমার পাশে দিনা নেই। এই সাত-সকালে সে গেল কোথায়? রুমের দরজায় চোখ বোলালাম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু কান খাড়া করতেই রুমের সাথে লাগোয়া বাথরুমের ভিতরে কারও অস্তিত্ব টের পেলাম। দিনা তা হলে বাথরুমে। বোধহয় গোসল করছে। আমাকেও গোসল করতে হবে। ইস, কী লজ্জা! খুব লজ্জা লাগছে আমার!!

আবার ফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে বেড সাইড টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিলাম। কলটা রিসিভ করলাম।

বিনয়ী কণ্ঠে বললাম, 'হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম।'

ওপাশ থেকে দিনার বাবার কণ্ঠস্বর, 'কে, জামাই বাবা?'

লজ্জা ভরা কণ্ঠে বললাম, 'জি।'

'বাবা, তোমারা কেমন আছ?' কণ্ঠটা কেমন উদ্বিগ্ন মনে হলো।

'জি, আমরা ভাল আছি। দিনার সাথে কথা বলবেন? দিনা তো বাথরুমে। আমি ডেকে দিচ্ছি।'

'না!!! না!!!' কণ্ঠটা কেমন আতঙ্কিত। 'তোমার সাথেই বলব।'

BanglaBook.org

'জি, বলুন।'

'কথাটা যে কীভাবে বলব, ঠিক ভেবে পাচ্ছি না।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটার পর তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'দিনাকে নিয়ে তোমরা চলে যাবার পর আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের একটা দিন কেঁদে-কেটে মন খারাপ অবস্থায়ই চলে যায়। বুঝতেই তো পারছ আমাদের অবস্থা। বড় মেয়েটা মারা গেল সেই শোক সামলাতে না সামলাতে ছোট মেয়ে স্বামীর ঘরে গেল। তা যা-ই হোক, আশ্চর্য অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম আজ ভোর বেলা। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশে ধান-চালের একটা গুদাম ঘর আছে। সিজনে সেই গুদামে ধান-চাল মজুদ করা হয়। পরে প্রয়োজন মোতাবেক গুদাম ঘর থেকে ধান-চাল বের করে আড়তে নেয়া হয়। এ ছাড়া এমনিতে গুদাম ঘরটা সব সময় বড় বড় তালা লাগিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। আজ ভোর বেলা সেই বন্ধ গুদাম ঘরের ভিতর থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠের দুর্বল স্বরে কান্নার শব্দ শুনতে পাই। আমরা খুবই আশ্চর্য হয়ে যাই! বন্ধ গুদামের ভিতরে কে?!! তার চেয়েও আশ্চর্য লাগে দিনার কণ্ঠস্বর শুনে। অতিদ্রুত আমরা গুদাম ঘর খুলে ভিতরে ঢুকি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই দিনাকে! দিনা জরাগ্রস্তের মত পড়ে আছে। সে এতই দুর্বল যে ঠিকভাবে কাঁদতেও পারছে না। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে আসি। তক্ষুনি তাকে কোনওক্রমে স্যালাইন, ডাবের পানি, দুধ, ডিম পোচ খাওয়াই। কিছুটা ধাতস্ত হলে পরে সবার মনে যে প্রশ্নটা চাপা দিয়ে রেখেছি সেটা জিজ্ঞেস করি।

' "তুই বন্ধ গুদাম ঘরের ভিতরে কী করে গেলি? তার চেয়ে বড় কথা তোর তো এখানে থাকারই কথা না!!! তুই দেখি কাল ভোর শ্বশুর বাড়ি গেলি!!!"

'দিনা ভাঙা ভাঙা ভাবে যা বলল, তা হলো–বিয়ের রাতে যে মেয়েরা দিনাকে সাজাচ্ছিল, এক সময় তারা সবাই মিলে দল বেঁধে বর দেখার জন্য বাইরে যায়। দিনা একেবারে একা হয়ে পড়ে। দিনার কেমন ঘুম-ঘুম পায়। রাতও তো তখন অনেক হয়েছিল। এর পরে তার আর কিছুই মনে নেই। আজ ভোর বেলা ফজরের আযানের শব্দে তার চেতনা আবার ফিরে আসে। মাঝখানে একটা দিন আর একটা রাত যে চলে গেছে চেতনা ফিরে পেয়ে

BanglaBook.org

সে তা বুঝতেও পারে না। এমনকী সে কোথায় তাও বুঝতে পারে না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন সে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে। আমরা গিয়ে উদ্ধার করি। সে যে কীভাবে গুদাম ঘরের ভিতরে গেছে, কখন গেছে, সেই ব্যাপারে তার কোনও ধারণাই নেই। এখন প্রশ্ন হলো, তোমরা বউ করে কাকে সাথে নিয়ে গেলে?!!'

আমার হাত থেকে মোবাইল ফোনটা খসে পড়ল। এ কী বলছেন দিনার বাবা!!! আজ ভোরে দিনাকে যদি বন্ধ গুদাম ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়, তা হলে আমি কার সাথে বাসর রাত কাটালাম?!!

ঘোর লাগা মানুষের মত এলোমেলো পা ফেলে টলতে-টলতে কোনওক্রমে আমি বাথরুমের দরজার সামনে এলাম। ভেজানো দরজায় হাত ছোঁয়াতেই দরজাটা খুলে গেল। বাথরুমে কেউ নেই!!! শুধু সুগন্ধি সাবানের মিষ্টি সুবাস আর মেঝেতে কাল রাতে তার পরনের ভেজা শাড়ি-কাপড়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বৃক্ষ মানব

এক

ধূপখোলা বাজারে একটা কাঠ চেরাইয়ের মিল আছে। আশপাশের অন্তত দশ গ্রামের কাঠ চেরাই হয় সেই মিলে।

চণ্ডিপুরের রফিক বেপারী একটা কড়ই গাছ কাটিয়ে মজুরদের দিয়ে চেরাই করার জন্যে পাঠিয়েছেন মিলে। কড়ই গাছটার গুঁড়ির বারোটি টুকরোর এগারোটি টুকরোই নির্বিঘ্নে চেরাই হয়েছে। ঝামেলা বেধেছে গুঁড়ির গোড়ার টুকরোটা নিয়ে। গোড়ার টুকরোটা করাতে দেয়ার সাথে-সাথে বিকট শব্দ করে করাতটা টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে। করাত ছিটকে পড়ে মিলের এক শ্রমিক বেশ জখমও হয়েছে। মেশিনে অন্য একটা করাত লাগিয়ে আবার কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু সেই একই ঘটনা ঘটে—করাত ভেঙে ছিটকে পড়ে। বড় গাছের ভিতরের আঁশগুলো জট পাকানো হলে মাঝে মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে। তাই বলে দু-দুটো করাত ভেঙে যাবে! মিলের শ্রমিকরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ল।

খবর পেয়ে মিল মালিক সালাম তালুকদার এসে পৌঁছান। তিনি করাতের অবস্থা দেখে শ্রমিকদের গালমন্দ শুরু করেন।

'হারামজাদাগো মোটা গুঁড়ি হাত করাত দিয়ে মাঝখান থেকে চিরে মেশিনে দিতে বলেছি, তা না করে সরাসরি মেশিনে! ঘোড়া দেখে খোঁড়া। প্রত্যেকটার পাছায় কষে দুইটা করে লাথি দিতে হয়।'

শ্রমিকদের একজন ক্ষীণ গলায় বলে উঠল, 'মিয়া ভাই, এর চাইতে মোটা গুঁড়িও তো সরাসরি মেশিনে কত কেটেছি।'

'সব গাছই কি সমান! কোনও কোনও গাছের ভিতরে জট পড়ে। তোরা তো আমার চেয়ে ভাল বুঝিস। একটা করাত ভাঙার পর আবার আর একটা করাত ভাঙবি! যতসব অকর্মার দল।'

BanglaBook.org

সালাম তালুকদার কিছুক্ষণ রাগে গজগজ করে ক্লান্ত হয়ে মিলের অফিস ঘরে বসেছেন। তাঁর সামনে বেশি করে দুধ-চিনি দেওয়া মালাই চা দেয়া হয়েছে। দুই বছর হলো তাঁর ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর থেকে বাড়িতে সব সময় তাঁকে লিকার চা খেতে দেয়া হয়। তাই দুধ-চিনি দেওয়া চা পেলে তিনি খুব তৃপ্তি সহকারে খান। চা শেষ করে মুখে এক খিলি জর্দা দেওয়া পান পুরেছেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে চোখ বন্ধ করে পা নাচাচ্ছেন। মনে হচ্ছে–তাঁর মাথা কিছুটা শীতল হয়েছে।

এদিকে শ্রমিকদের দুই জন গেছে করাত দুটো ঝালাই করে জোড়া লাগানোর জন্যে। বাকিরা গাছের গোড়ার মোটা গুঁড়িটাকে হাত করাত দিয়ে মাঝখান থেকে চেরার চেষ্টা চালাচ্ছে।

চণ্ডিপুর থেকে আসা গাছের সাথের মজুররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, এই গুঁড়িটা নিয়ে আর কত ঝামেলা হবে তা আল্লাহ মাবুদই জানে! গোড়াটা কাটার সময় দুইটা কুড়াল ভাঙল, একটা হাত করাতের আলগুলো বাঁকা হয়ে গেল, সাদেকের হাত ভাঙল, মেশিনের দুইটা করাত ভাঙল। আর কত অঘটন ঘটবে আল্লাই জানে!

প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে শ্রমিকরা অনেক পরিশ্রম করে গুঁড়িটাকে চিরে দুই ভাগ করে ফেলল। চেরা খণ্ডের ভিতরটা দেখে আঁতকে উঠে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল শ্রমিকরা। চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে সালাম তালুকদারের তন্দ্রা ভাবটা ছুটে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আজকাল এই এক বদ অভ্যেস হয়েছে–রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, দিনের বেলা এখানে সেখানে বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন।

সালাম তালুকদার গুঁড়ির খণ্ডের ভিতরটা দেখে বড় ধরনের একটা হোঁচট খান। একী দেখছেন তিনি! স্বপ্ন নয় তো! বোধহয় তিনি স্বপ্নই দেখছেন। চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন।

গুঁড়ির চেরা দুই খণ্ডের এক খণ্ডের ভিতরে একটা খোঁড়ল। সেই খোঁড়লে একটা জীবন্ত মানব শিশু। শিশুটা সামান্য নড়াচড়াও করছে। চিঁ-চিঁ করে অদ্ভুত রকমের শব্দ করছে। গায়ের রং বরফের মত সাদা। গাঢ় নীল

BanglaBook.org

চোখের মণি। চোখের সাদা অংশটাও সাদা নয়–হালকা গোলাপি। ছোট্ট একটা ছেলে শিশু। তার সমস্ত শরীর থেকে সরু সরু শিকড় বেরিয়েছে। যে শিকড় মূল গাছের সাথে সম্পৃক্ত। হাত-পায়ের নখ দিয়ে শিকড় বেরিয়েছে। নাভীর ভিতর দিয়ে শিকড় বেরিয়েছে। মাথার বেগুনি রঙের চুলের ভিতর দিয়ে শিকড় বেরিয়েছে। এমনকী ছোট্ট শিশ্নটা দিয়েও শিকড় বেরিয়েছে। গুঁড়ি কেটে দুই খণ্ড করার সময় কিছু শিকড় কেটে গিয়েছে–সেগুলো দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বের হচ্ছে। লাল রঙের রক্ত! চিরচেনা মানুষের গায়ের লাল রক্ত।

খবরটা ঝড়ের গতিতে আশপাশে গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোকজন ছুটে আসে ধূপখোলা বাজারে। প্রত্যেকেই এক নজর দেখতে চায় অদ্ভুত শিশুটাকে। গাছের খোঁড়লে শিশুর জন্ম! এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী হতে পারে। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, ওই বাচ্চা জিন-পরীর। আবার কেউ বলেন, ওই বাচ্চা ওলি আওলিয়া। মানুষের মুখে মুখে চলতে থাকে হাজারও গুঞ্জন।

দুই

সন্ধ্যার পরে কাঠ চেরাইয়ের মিলে গাছের মালিক চণ্ডিপুরের রফিক বেপারী এসে পৌঁছান। বৃক্ষ শিশুকে দেখানোর পর রফিক বেপারীকে মিলের অফিস ঘরে বসানো হয়। শিশুটিকে দেখার পর অন্য সবার মত রফিক বেপারীর চোখে মুখেও বিস্ময়ের ছাপ। তাঁকে কিছুটা ভীতও দেখাচ্ছে।

সালাম তালুকদার রফিক বেপারীর কাছ থেকে কিছু তথ্য জানবেন গাছটা সম্পর্কে, এই জন্যেই অফিস ঘরের নির্বিবিলিতে এনে বসিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য একটা উদ্দেশ্যও ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মনে। সালাম তালুকদারের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা সন্তানের মুখ দেখা হলো না। ছেলে-পুলেহীন শূন্য ঘরটা খাঁ খাঁ করে। বৃক্ষ শিশুকে দেখে তিনি মায়ায় পড়ে গেছেন। কারও কোনও আপত্তি না থাকলে শিশুটিকে

BanglaBook.org

তিনি লালন-পালন করবেন। এরই মধ্যে গাছের খোঁড়লের ভিতর থেকে শিশুটিকে বের করা হয়েছে। নতুন ব্লেড দিয়ে গাছের সাথে সংযুক্ত শিকড়গুলো এক এক করে কাটা হয়েছে। শিকড়ের কাটা গোড়া দিয়ে প্রথমে রক্ত বেরুতে শুরু করেছিল। সালাম তালুকদারের মনে পড়ল–কোনও গাছের শিকড় কেটে গেলে, এভাবেই কাটা জায়গা দিয়ে কষ বের হয়। কাটা স্থানটায় শুকনো মাটির গুঁড়ো মাখিয়ে দিলে কষ পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশে শিশুর গা থেকে কাটা শিকড়ের গোড়ায়ও শুকনো মাটির গুঁড়ো মাখিয়ে দেয়ার পর রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিশুটি এখন সুস্থ স্বাভাবিকই আছে। সদ্য প্রসব করা অন্য শিশুদের মতই এখন সে ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘুম থেকে জেগে চিঁ-চিঁ করে কাঁদে। দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সম্ভব হয়নি।

সালাম তালুকদার কোনও ভণিতার মধ্যে না গিয়ে রফিক বেপারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'শুনলাম এই কড়ই গাছটা আপনার বাড়িতেই ছিল। আজই গাছটা কাটিয়ে চেরাইয়ের জন্য পাঠিয়েছেন মিলে। তা গাছটার কিছু ইতিহাস বলুন। যেমন–কে লাগিয়েছে? বাড়ির কোন্ জায়গায় ছিল? আনুমানিক কত বছর বয়স হয়েছে গাছটির?'

রফিক বেপারীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছুটা চিন্তিত। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। রুমাল বের করে ঘাম মুছে বলতে শুরু করেন:

'গাছ কে লাগিয়েছে বলতে পারব না। কারণ বাড়িটা আমি বিশ বছর আগে জব্বার মিয়া নামের এক লোকের কাছ থেকে কিনেছিলাম। তখন থেকেই গাছটা ছিল, তবে এত বড় ছিল না। জব্বার মিয়া পাগলা টাইপের লোক ছিল। লোকটার বউ পাঁচ মাসের পোয়াতি অবস্থায় মারা যাওয়ার পর থেকে লোকটার মধ্যে কেমন গোলমেলে ভাব দেখা যায়। বাড়ির ভিতরের কবরস্থানেই তাঁর বউকে কবর দেওয়া হয়েছিল। লোকটা সারাদিন সেই কবরের সাথে কান পেতে বসে থাকতেন আর ফিসফিস করে কী সব যেন বলতেন। দেখে মনে হত তিনি কবরের ভিতরের মানুষটার সাথে কথা বলছেন। লোক মুখে শুনেছি বউটাও পোয়াতি হওয়ার পর থেকে কেমন উল্টা-পাল্টা কথা বলত। বলত, আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে সেটা একটা গাছ। এ সন্তান গাছের সন্তান। পৃথিবীর প্রথম গাছ-মানুষ জন্ম নিতে

যাচ্ছে...বউটার আচরণেও উদ্ভট ভাব দেখা যায়। গভীর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানের পাশের এই গাছটাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত আর বিড়বিড় করে গাছটাকে বলত, "তোমার সন্তান আমার পেটে কেন? তোমার সন্তান তুমি নিয়ে নাও, আমাকে মুক্তি দাও, আমি আর পারছি না..."

'আমি আমার পাঁচ ছেলে-মেয়ে নিয়ে এ-বাড়িতে ওঠার পর নিরিবিলি বেশ স্বচ্ছন্দেই বাস করছিলাম। তবে মাঝে-মাঝে গভীর রাতে আমার স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ভীত গলায় বলত, "শুনছ... একটা বাচ্চা কাঁদছে!"

'আমি অবাক হয়ে বলতাম, "কোথায়?"

"আমাদের উঠানে। কান পেতে থাকো, শুনতে পাবে।"

'কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কান খাড়া রেখে সত্যিই একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেতাম। কিন্তু সে কান্নার শব্দ উঠান থেকে আসছে বলে মনে হত না। হাই চেপে বিরক্ত স্বরে বলতাম, "আশপাশের কোনও ঘরের বাচ্চা কাঁদছে। রাত বলে কাছে মনে হচ্ছে। অহেতুক ভয় না পেয়ে শুয়ে পড়ো।'...স্ত্রী প্রায় রাতেই ঘুম থেকে জাগিয়ে কান্নার শব্দ শোনাত। তার ভুল ভাঙার জন্যে উঠানে নিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে সমস্ত উঠান দেখাতাম। কোথাও কেউ নেই। এরপর ধীরে ধীরে স্ত্রী বোধহয় কান্নার শব্দে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে আর জ্বালাতন করত না।'

'কয়েক বছর পর প্রথম অঘটনটা ঘটে। আমার মেঝ ছেলেটা ছিল ডানপিটে স্বভাবের। সে একদিন উঠানের পাশের এই গাছে চড়ে, ডাল কাটার জন্যে। গাছের একটা ডালে কোপ বসাতেই সে ছিটকে পড়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন কী অবস্থা হয়েছিল। জখম অবস্থায় তিন দিন বেঁচে ছিল ছেলেটা। সেই অবস্থায় ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেছিল, কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

'ছেলেটার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী'র মধ্যে পাগলামি দেখা দেয়। বিভিন্ন সময় এমনকী মাঝ রাতেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেত গাছটার গোড়ায়। সে নাকি গাছটার আশপাশে তার মৃত ছেলেকে দেখতে পায়। খাওয়া নেই নাওয়া নেই গাছটার গোড়ায় বসে বসে সারাক্ষণ কাঁদে। এক দিন ভোরবেলা সেই গাছের গোড়ায়ই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

'আর নয় এই অশুভ গাছ। এবার গাছটাকে কেটে ফেলতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পরের দিন দেখি গাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে গোয়াল ঘরের উপরে পড়ে দুইটা দুধের গাভী মারা গেছে। অথচ সে রাতে কোনও ঝড় হয়নি, এমনকী দমকা হাওয়াও না। তা হলে ডালটা কীভাবে ভেঙে পড়ল!

'কী করি এই অভিশপ্ত গাছ নিয়ে! গ্রামের লোকজন বলাবলি শুরু করে–জিনে পাওয়া গাছ। ও গাছ কাটতে গেলে বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। ভয়ে গাছে হাত দেই না। এভাবেই চলছিল।

'গত বছর বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে। সে প্রথমবারের মত পোয়াতি হয়। গ্রামের মানুষদের একটা নিয়ম আছে তো জানেন–মেয়েদের প্রথম বাচ্চা জন্ম দিতে হয় বাপের বাড়ি বসে। মেয়েটা নায়রে আসে। গতকাল ভর দুপুরে ওই অশুভ গাছটার গোড়ায় আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। শুকনো খটখটে জায়গা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে হলেও না হয় বুঝতাম শেওলা জমা জায়গা, তাই আছাড় খেয়েছে। আছাড় খেয়ে পাঁচ মাসের পোয়াতি মেয়েটার গর্ভপাত হয়ে যায়। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেয়েকে ভর্তি করি। সিদ্ধান্ত নেই গাছটা এবারে কেটেই ফেলব। আজ সকালে মজুরদের দিয়ে গাছ কাটিয়ে আপনার মিলে পাঠাই।'

এই পর্যায়ে রফিক বেপারী মুখ থমথমে করে কথা থামিয়ে দেন। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলেন, 'আজ বিকেলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আমার মেয়েটা মারা গিয়েছে। ডাক্তাররা শত চেষ্টা করেও তার রক্ত ক্ষরণ থামাতে পারেনি।'

BanglaBook.org

তিন

এত কিছুর পরও সালাম তালুকদার তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বৃক্ষ শিশুটিকে তিনি নিজের সন্তান হিসেবেই লালন-পালন করবেন। শিশুটিকে তাঁর স্ত্রীর কোলে তুলে দেন। একটা সমস্যা বাধে–শিশু কিছুই

খেতে চাচ্ছে না। দুধ, মধু, চিনি গুলানো পানি কিছুই খাচ্ছে না। মুখে দিলে ফেলে দেয়। অথচ চিঁ-চিঁ করে সারাক্ষণ কাঁদছে–বোঝা যাচ্ছে ক্ষুধার কারণেই সে কাঁদছে।

কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় মনে হলো–শিশুটি টেলিপ্যাথির মাধ্যমে বলছে, তাকে মাটি খেতে দিতে। সালাম তালুকদার আর তাঁর স্ত্রী শুকনো মাটি গুঁড়ো করে, পানিতে গুলিয়ে, দুধের ফিডারে ভরে শিশুর মুখে দেন। শিশু তৃপ্তি সহকারে পুরো বোতল মাটি গোলা শেষ করে ফেলে। শিশু টেলিপ্যাথির মাধ্যমে জানায় সে গাছের কষ খাবে। সালাম তালুকদার বিভিন্ন গাছের ছাল সংগ্রহ করে পানিতে ভিজিয়ে রাখেন। ছাল ভেজানো পানিতে যে কষ বের হয় তা শিশুকে খেতে দেন। শিশু তৃপ্তি সহকারে খায়।

এভাবে শত চেষ্টার পরেও শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। সাত দিন পরে মারা গেল। সালাম তালুকদারের বাড়ির কবরস্থানেই কবর দেয়া হলো।

তিন মাস পর শিশুটির কবরের উপরে একটা অদ্ভুত গাছ জন্মাল। সম্পূর্ণ অপরিচিত গাছ। দেখতে কিছুটা ফণিমনসা গাছের মত। তবে গায়ের রং সবুজ নয়, বেগুনি। সারা গায়ে মোটা মোটা কাঁটা। সেই কাঁটার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট নীল রঙের ফুল। গভীর রাতে সেই ফুলগুলো থেকে তীব্র গন্ধ বের হয়। গন্ধের আকর্ষণে সালাম তালুকদার আর তাঁর স্ত্রী নিশুতি রাতে কবরস্থানের ভিতরের সেই গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তীব্র মিষ্টি গন্ধে তাঁদের মাথা ঝিম ঝিম করে। তবুও তাঁরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। পুব আকাশ ফর্সা হওয়ার আগ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট

সালাম তালুকদারের সুখের দিন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়স্কা স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এত দিন পর সৃষ্টিকর্তা তাঁদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তাঁদের শত সাধনা পূর্ণ হচ্ছে। তবে সালাম তালুকদারের স্ত্রী মাঝে মাঝে কেমন উল্টা-পাল্টা কথা বলেন। তিনি বলেন, তাঁর পেটের সন্তান মানব নয়, বৃক্ষ! বৃক্ষ মানব! তাঁর পেটে জন্ম নিচ্ছে এক বৃক্ষ মানব!!!

BanglaBook.org

প্রেতাত্মার ছায়া

এক

'আম্মায় কহনো ডরাইছেন। মেলা ডর। এমন ডর যে ডরের চোটে বুক ধড়াস-ধড়াস করতে করতে মনে হইছে বুক ফ্যাইটা...'

মাজেদা বেগম সরু চোখে তাঁর নতুন কাজের মেয়ে জরিনার দিকে তাকান। গত এক সপ্তাহ ধরে এই মেয়েটি তাঁর বাড়িতে। বয়স সতেরো-আঠারো হবে। ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রং কালো। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। উপরের পাটির উঁচু দাঁত সব সময় বেরিয়ে থাকে। জট পাকানো লালচে কোঁকড়ানো চুল। সব মিলিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই চেহারা। তবে কাজে-কর্মে খুবই ভাল। কোনও কিছু একবার বুঝিয়ে দিলেই সুন্দর ভাবে করতে পারে। এমনিতে খুবই কম কথা বলে, কিন্তু মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক আবোল-তাবোল কথা বলে ওঠে। সব ভয় বিষয়ক কথা!

জরিনা মাজেদা বেগমের পা টিপতে টিপতে ভীত স্বরে বলেই যাচ্ছে, '...ডর বড় খারাপ জিনিস। একবার ডর পাইলে হেই ডর আর পিছু ছাড়ে না। হের মরণ হয় ডরের চোটেই...'

মাজেদা বেগমের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বিধবা। ছেলে-মেয়েরা দূরে-দূরে থাকে। এক ছেলে থাকে অস্ট্রেলিয়া, আর এক ছেলে ইতালি। মেয়ে থাকে ঢাকায়। ঢাকায় মেয়ের স্বামী সন্তানাদি নিয়ে সুখের সংসার। ঈদে-কুরবানিতে বছরে একবার কি দু'বার ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে আসে। সারাটা বছর মাজেদা বেগমকে একা-একাই থাকতে হয়। ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই তাঁর নিজের কাছে মাজেদা বেগমকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু মাজেদা বেগম যাননি। স্বামীর স্মৃতি জড়িত নিজেদের এত বড় বাড়িটাকে ফেলে রেখে যেতে তাঁর মন সায় দেয়নি।

মাজেদা বেগমের হাঁটুতে ভীষণ বাতের ব্যথা। কেউ পা-হাঁটু টিপে

BanglaBook.org

দিলে একটু আরাম লাগে। তিনি কাজের মেয়েদের দিয়ে পা-হাঁটু টেপান। জরিনার আগে যে কাজের মেয়েটা ছিল সেই মেয়েটা খুব যত্ন নিয়ে টিপত। বেশ আরাম লাগত। এমনিতে অন্য কাজ-টাজ তেমন ভাল করত না। তবে পা-হাঁটু টেপায় ওস্তাদ ছিল। চেহারা-সুরতও ভাল ছিল। মাজেদা বেগম প্রায়ই বলত, 'তোকে একটা ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে, তোর স্বামী সহ আমার কাছেই রেখে দিব। তুই করবি ঘরের কাজ, তোর স্বামী করবে বাজার-সদাই, বাগান পরিচর্যার কাজ।' মাজেদা বেগমের কথা শুনে মেয়েটা মুখ টিপে টিপে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসত। একদিন মেয়েটা একজোড়া কানের দুল আর ডি.ভি.ডি. সেটটা নিয়ে পালিয়ে যায়।

সেই মেয়েটা পালিয়ে যাওয়ার পর মুন্সি মুদি দোকানের মালিক চানমুন্সি বর্তমানের জরিনাকে এনে দেয়। জরিনা চানমুন্সির গ্রামের মেয়ে। মা-বাবা মরা অসহায় একটা মেয়ে। এর বাড়িতে ওর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেই বড় হয়েছে।

জরিনার পা-হাঁটু টেপায় মাজেদা বেগমের কাছে আগের সেই মেয়েটার মত আরাম লাগে না, বরং ব্যথা লাগে। জরিনার হাত দুটো কেমন যেন ঠাণ্ডা, শক্ত আর খসখসে।

দুই

দুঃস্বপ্ন দেখে মাজেদা বেগমের ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ঙ্কর বীভৎস স্বপ্ন। তিনি এখনও হাঁপাচ্ছেন। এমন বীভৎস ভয়ানক স্বপ্ন এর আগে আর কোনওদিন তিনি দেখেননি।

স্বপ্নে দেখেন–তিনি যেন প্রাসাদ সমতুল্য একটা বাড়ির করিডোর ধরে হাঁটছেন। বাড়ির শ্যাওলা ধরা পুরানো দেয়াল। করিডোর ধরে কিছুটা এগোনোর পরপরই এক-একটা বিশাল দরজা। দরজাগুলোর রং কালো। বন্ধ দরজাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর পরই দরজাগুলো বিকট শব্দ তুলে আপনা-আপনি খুলে যাচ্ছে। তিনি এগিয়ে চলেছেন। আবার করিডোর,

BanglaBook.org

আবার দরজা। তিনি যতই এগিয়ে চলেছেন, ততই যেন অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। তিনি এগিয়ে চলেছেন তো চলেছেন। কী এক অমোঘ আকর্ষণের টানে তিনি এগিয়েই চলেছেন। শেষ দরজাটা খোলার পরে দেখেন–তিনি বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন। কেমন ছায়া-ছায়া কুয়াশা ঢাকা একটা খোলা জায়গা। নির্জন ধু-ধু চারদিক। চোখ সয়ে আসতেই তিনি লক্ষ করেন–খোলা মাঠটা জুড়ে শুধু সারি-সারি কবর। যতদূর চোখ যায় শুধু কবর আর কবর। লক্ষ-লক্ষ কবর যেন সেখানে! তাঁর গা ছমছম করে ওঠে। দুরু-দুরু বুকে আরও কিছুটা এগিয়ে যান। হঠাৎ তিনি দেখেন–কিছুটা দূরে ভয়ঙ্কর আজব চেহারার বিশাল-বিশাল প্রাণী। প্রাণীগুলোর শরীরের গঠন কিছুটা মানুষের মত। কিন্তু আকৃতিতে মানুষের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বড়। বিশাল ঝোলা পেট। কালো-কালো লোমে আবৃত শরীর। কিম্ভূতকিমাকার একটা মাথা। মুখটা যেন শিয়াল আর শূকরের আদলে তৈরি। সেই মুখে সূচালো তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। কপালের উপরে একটা মাত্র বিদঘুটে চোখ।

প্রাণীগুলো কবর থেকে লাশ তুলে-তুলে চপচপ করে চিবিয়ে-চিবিয়ে খাচ্ছে। প্রথমে লাশের হাত-পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দেয়, এর পরে শরীরের বাকি অংশ। পচা গলা লাশের, পচা কালচে রক্ত আর পুঁজের মত থিকথিকে ঘন তরল, প্রাণীগুলোর গায়ে-মুখে লেগে মাখামাখি হচ্ছে।

লাশ পচা প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। মাজেদা বেগমের গা ঘিনঘিন করে ওঠে। হঠাৎ প্রাণীগুলো লাশ থেকে চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে তাঁর দিকে ছুটে আসতে শুরু করে। তিনিও প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর পা যেন এগুচ্ছেই না। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কবরের উঁচু মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। অমনি প্রাণীগুলো এসে তাঁর গায়ের উপর হামলে পড়ে। এই মুহূর্তে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়।

মাজেদা বেগম কাঁপা গলায় 'জরিনা...জরিনা' বলে কয়েকবার ডাক দিলেন। কোনও সাড়াশব্দ নেই। জরিনা তাঁর কামরারই মেঝেতে পাটি বিছিয়ে ঘুমায়। আতঙ্কের মাঝেও মাজেদা বেগমের রাগ লাগল–মরার ঘুম ঘুমিয়েছে! পিপাসায় তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ। বিছানার পাশে হাতড়ে কোনও মতে বেড সুইচে টিপ দিয়ে আলো জ্বালান। ঘর আলোকিত হতেই চমকে

BanglaBook.org

উঠে দেখেন–জরিনা পানির গ্লাস হাতে তাঁর শিয়রের পাশে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর বিস্ফারিত চোখ দেখে নির্বিকার ভঙ্গিতে জরিনা বলে ওঠে, 'আম্মায় কি ডরাইছেন?'

মাজেদা বেগম জরিনার প্রশ্নের কোনও জবাব দেন না। তিনি জরিনার হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে পুরো গ্লাস পানি শেষ করেন আর অবাক হয়ে লক্ষ করেন–এখনও মৃদু ভাবে লাশ পচা গন্ধ পাচ্ছেন! ঘরের ভিতর থেকেই গন্ধটা পাচ্ছেন! আর একটু ভাল ভাবে খেয়াল করতেই তিনি বুঝতে পারেন, গন্ধটা আসছে জরিনার গা থেকে! হয়তো দুঃস্বপ্নের রেশটা এখনও আছে তাই তাঁর কাছে এমনটা মনে হচ্ছে।

তিন

মাজেদা বেগমের ছোট ভাই মোতালেব হোসেন তাঁর মেয়ে লুনাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। লুনা এখানকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেবে।

ভাই-ভাইয়ের মেয়ে বেড়াতে আসায় মাজেদা বেগম অনেক রান্না-বান্নার আয়োজন করেছেন। বাজার করিয়েছেন, চানমুন্সির দোকানের চব্বিশ-পঁচিশ বছরের খালেদ নামের ছেলেটাকে দিয়ে। চানমুন্সির মুদি দোকানটা বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায়, চানমুন্সির সাথে মাজেদা বেগমের খুব সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চানমুন্সি মাজেদা বেগমকে বড় বোনের মত সম্মান করেন। বিপদে-আপদে সবসময় চানমুন্সির সহযোগিতা পাওয়া যায়।

মোবাইল ফোনে চানমুন্সিকে জানান, মেহমান এসেছে, বাজার লাগবে, জানানোর পরই চানমুন্সি খালেদকে পাঠিয়ে দেয়। খালেদ খুবই নম্র-ভদ্র, বিনয়ী ছেলে। খালেদও চানমুন্সির গ্রামের ছেলে। গত তিন-চার বছর ধরে এই ছেলেটাকে দিয়েই মাজেদা বেগম বাজার-সদাই, ওষুধ আনা, বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল...বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করান।

আগের কাজের মেয়েটা থাকাকালীন সময়ে খালেদকে তলব না করতেও খালেদ এসে ঘুরঘুর করত। বিভিন্ন অজুহাত দেখাত। মাজেদা

BanglaBook.org

বেগমকে, খালা, আপনের কী লাগবে...এটা লাগবে...ওটা লাগবে... বলে অগ্রিম তাগাদা দিত।

মাজেদা বেগম খালেদের এই অতি উৎসাহের কারণ ঠিকই বুঝতে পারতেন। খালেদ আগের সেই কাজের মেয়েটাকে খুব পছন্দ করত। মাজেদা বেগম মনে-মনে ভাবতেন–খালেদের সাথে মেয়েটার বিয়ে হলে একেবারে মন্দ হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটা তো চুরি করে পালিয়ে গেল।

খালেদ আজকাল কাজের তলব ছাড়া আসেই না। এই তো আজও বাজার রেখেই চলে গিয়েছে। আগে খালেদ বাজার থেকে আসার পরও বিভিন্ন গল্প ফেঁদে বসত। তাজা ইলিশ মাছটা সে কী করে চিনল, কম বয়সী গরুর মাংস সে কী করে খুঁজে বের করল...

খালেদ মাজেদা বেগমের লিস্ট মতই সব বাজার থেকে এনেছে। বড় একটা রুই মাছ, গরুর মাংস, রোস্ট সাইজের মুরগি, পোলাওয়ের চাল, মুগ ডাল...

রান্না-বান্না সবই জরিনা করছে। মাজেদা বেগমের যে বয়স তাতে চুলোর পাশে গিয়ে তাঁর পক্ষে রান্না করা সম্ভব নয়। আগুনের পাশে বেশিক্ষণ থাকলে তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়। তিনি ভাই ও ভাইয়ের মেয়ের সাথে বসার ঘরে বসে গল্প করছেন। তবে মাঝে-মাঝে রান্নাঘরে গিয়ে জরিনাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেন কোন্‌টা কীভাবে রান্না করতে হবে। অবশ্য জরিনাকে না বুঝিয়ে দিলেও চলে, জরিনা এমনিতেই খুব ভাল রান্না করে।

জরিনার রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে। পোলাও বাদে সব কিছু রান্না হয়ে গিয়েছে। পোলাও এখনও চুলোয়। পোলাওটা ইচ্ছে করেই শেষে রাঁধছে, যাতে খাবার টেবিলে গরম-গরম পোলাও পরিবেশন করা যায়।

মাজেদা বেগম প্রত্যেকটা হাঁড়ির ঢাকনা তুলে তুলে দেখছেন। রোস্ট, ভাজা রুই মাছ, গরুর মাংস ভুনা। প্রত্যেকটা রান্নাই দেখে তিনি মুগ্ধ হচ্ছেন। যেমন সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতেও তেমন লোভনীয় সুস্বাদু মনে হচ্ছে মুড়িঘণ্টের হাঁড়ির ঢাকনা তুলে তিনি বিকট স্বরে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

BanglaBook.org

মাজেদা বেগমের চিৎকার শুনে বসার ঘর থেকে তাঁর ছোট ভাই মোতালেব হোসেন এবং ভাইয়ের মেয়ে লুনা ছুটে আসে।

অনেকক্ষণ ধরে চোখে-মুখে পানি ছিটানোর পরে মাজেদা বেগমের জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর তিনি কেমন আতঙ্কিত চোখে চারদিকে তাকান। তাই দেখে জরিনা নির্বিকার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'আম্মায় কি ডরাইছেন?'

মাজেদা বেগম সত্যিই ভয় পেয়েছেন। প্রচণ্ড রকমের ভয়। মুড়িঘণ্টের হাঁড়ির ঢাকনা তোলার পর তিনি দেখতে পান—একটা মানুষের কাটা মুণ্ডু দিয়ে মুড়িঘণ্ট রান্না করা হয়েছে। মুণ্ডুটার চুলের ফাঁকে-ফাঁকে, কানের ফাঁক-ফোকরে, নাকের ডগায়, ফুটোয়, কপালে, গালে, ঠোঁটে, চোখের উপরে-পল্লবে মুগ ডাল লেগে রয়েছে। ঢাকনা তোলার সাথে-সাথে সেই কাটা মুণ্ডুটার বোজানো চোখ দুটি মেলে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায়। তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

সবাই মিলে অভয় দিয়ে, মাজেদা বেগমকে মুড়িঘণ্টের হাঁড়ি আবার দেখানো হয়। সব ঠিকই আছে। রুই মাছের বড় মাথাটা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রান্না করা হয়েছে। কী সুন্দর লোভনীয় ঘ্রাণ বেরুচ্ছে!

চার

লুনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।

লুনার বাবা তাঁর বোনের বাড়িতে লুনাকে রেখে চলে গিয়েছেন। লুনার অবশ্য ইচ্ছে ছিল কলেজের হোস্টেলে ওঠার। তা শুনে লুনার ফুপু খুবই রাগ করেন। যার ফুপুর এত বড় বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে সে থাকবে হোস্টেলে! লুনার বাবাকেও লুনার ফুপু অনেক ধমকা-ধমকি করেন, 'আমার এত বড় বাড়ি থাকতে, এই শহরেই আমার ভাতিজি থাকবে হোস্টেলে! আমি কি তোদের পর!...বুঝেছি আমাকে তোরা পরই ভাবিস...বুড়ো মানুষ, একা-একা মরে পড়ে থাকি, সেটাই তোরা চাস...'

BanglaBook.org

অগত্যা লুনাকে ফুপুর বাড়িতেই থাকতে হয়। সব দিক দিয়েই ঠিক আছে, খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই লুনা এ বাড়িতে থাকছে। ফুপু খুবই যত্ন নেন, আদর করেন, খেয়াল রাখেন। এ ছাড়া কলেজের দূরত্বও বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। মাত্র পনেরো বিশ টাকা রিকশা ভাড়ায়ই যাওয়া-আসা করা যায়। শুধু এ বাড়িতে লুনার কেমন ভয়-ভয় লাগে! এত বড় বাড়ি! মাত্র তিনজন মানুষ! কত কামরা খালি পড়ে আছে! খালি কামরাগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় লুনার গা ছমছম করে ওঠে। ডাক্তারি পড়া ছাত্রীরা না-কি সাহসী হয়, কিন্তু লুনা মোটেই সাহসী নয়। লুনাদের বাড়িতে বসে লুনার সাথে রাতে তাঁর ছোট বোন ঘুমাত। এখানে লুনাকে একাই একটা কামরায় ঘুমাতে হয়। ফুপু থাকে পাশের কামরায়। কাজের মেয়ে জরিনাও ঘুমায় ফুপুর কামরায়। লুনার একা ঘুমাতে ভয় লাগে শুনে ফুপু অবশ্য বলেছিল, 'জরিনা গিয়ে তোর রুমে ঘুমাতে পারে।' তা শুনে লুনা একেবারে আঁতকে ওঠে। জরিনাকে তার আরও ভয় লাগে। জরিনা মেয়েটার মধ্যে কিছু রহস্যময়তা আছে। কেমন চুপচাপ স্বভাবের। বিড়ালের মত নিঃশব্দে হাঁটা-চলা করে। অন্ধকারের মাঝেও সে শব্দহীন হেঁটে বেড়ায়। কখন যে পিছনে এসে দাঁড়ায় তা টেরও পাওয়া যায় না। ঘাড়ের উপর তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে। সেই নিঃশ্বাস থেকে বিচ্ছিরি বোটকা গন্ধ বের হয়। মনে হয় মেয়েটা ভালভাবে দাঁত মাজে না। নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় চমকে উঠে পিছনে তাকালে, থমথমে স্বরে বলে ওঠে, 'আফায় কি ডরাইছেন?' লুনা অনেকবার বারণ করেছে ওভাবে নিঃশব্দে যেন তার পিছনে এসে না দাঁড়ায়। কিন্তু সে বারণ শোনেনি। জরিনাকে দেখে মনে হয় সে মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করে।

রাত পৌনে বারোটা। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ নেই। লুনা মোমের আলোতে পড়ছে। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এসেছে। পাশের ঘরে তাঁর ফুপু আর জরিনা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

লুনা রুমের সাথে লাগোয়া টয়লেট থেকে ফিরে এসে দেখতে পায়—তার বিছানার উপরে সাদা কাফন জড়ানো একটা লাশ। সে বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

লুনার চিৎকারের শব্দে পাশের ঘর থেকে ঘুম ভেঙে মাজেদা বেগম ও জরিনা ছুটে আসে। কিছুক্ষণ পরে লুনার জ্ঞান ফিরে আসে। সে 'লাশ...

BanglaBook.org

লাশ' বলে চিৎকার করতে করতে অস্থির হয়ে ওঠে।

'কোথায় লাশ...কোথায় লাশ...' বলে মাজেদা বেগম লুনাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

লুনা আঙুল তুলে বিছানার দিকে দেখায়।

মাজেদা বেগম লুনাকে অভয় দিয়ে বলেন, 'বিছানার দিকে চেয়ে দেখ, কোথায় লাশ! ওটা তো কোলবালিশ।'

লুনা কিছুটা শান্ত হয়ে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যিই কোনও লাশ নেই! পরিপাটি করা বিছানায় লম্বা করে রাখা একটা কোলবালিশ! তা হলে কি সে ঘুম-ঘুম চোখে বিভ্রম দেখেছে!

পাঁচ

মাজেদা বেগম কয়েক দিন ধরে অবাক হয়ে লক্ষ করছেন—বাড়ির চারপাশে বেশ কয়েকটা কুকুর ঘোরাঘুরি করে। রাতের বেলা কুকুরগুলোর পদচারণা আরও বেড়ে যায়। কুকুরগুলোর বুনো দৃষ্টির নজর বাড়ির দিকেই! রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর হয়তো। পাগলা কুকুরও হতে পারে। কুকুরগুলোর চাহনি দেখে ভয়-ভয় লাগে। লুনাও কুকুরগুলোকে খুব ভয় পাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে জরিনা। জরিনা তো আতঙ্কে তটস্থ হয়ে বলেই দিয়েছে, 'আম্মা, কুত্তাগুলানরে মেলা ডর লাগে... এহানে আর থাকুম না...চইল্যা যামু।'

মাজেদা বেগম খালেদকে ডেকে পাঠান।

খালেদকে দেখে মাজেদা বেগম অভিমানের সুরে বলেন, 'আজকাল তো তুই একেবারে আসিসই না...কী ব্যাপার বল তো! তুই কি কোনও কারণে রাগ করেছিস...'

খালেদ আমতা-আমতা করে বলে, 'না, মানে...ভয় লাগে।'

মাজেদা বেগম অবাক হয়ে বলেন, 'কীসের ভয়!'

খালেদ ভীত চোখে আশপাশে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলে, 'জরিনা!'

'জরিনাকে ভয় লাগে! কী বলছিস আবোল-তাবোল! মেনে নিলাম

BanglaBook.org

মেয়েটার চেহারাটা একটু বিদঘুটে। তাই বলে তুই একটা জোয়ান ছেলে হয়ে ভয় পাবি!'

খালেদ অস্বস্তি নিয়ে বলে, 'না...মানে...'

এমন সময় জরিনা চা-বিস্কিটের ট্রে হাতে ঘরে ঢোকে। জরিনাকে দেখে খালেদ আরও জড়সড় হয়ে চুপসে যায়।

মাজেদা বেগম বলেন, 'তোকে যে কারণে ডেকেছি তা শোন। কয়েক দিন ধরে দেখছি বাড়ির আশপাশে কতগুলো বেওয়ারিশ কুকুর ঘোরাঘুরি করে। তুই সিটি কর্পোরেশনে গিয়ে অভিযোগ করে আসবি। ইমিডিয়েট যেন কুকুরগুলো মারার ব্যবস্থা করে। আমার ভাতিজি মেডিকেল কলেজে পড়ে। ভয়ে সে দুই দিন যাবৎ বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি। তুই বাড়িতে ঢোকার সময় কুকুর দেখিসনি?'

'না, তা দেখিনি। তবে আজই গিয়ে সিটি কর্পোরেশনে অভিযোগ করে আসব। এখন উঠি।'

চলে যাওয়ার সময় খালেদকে দেখে মনে হয়েছে, এতক্ষণে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কেমন ভয়ে ভয়ে ছিল সারাক্ষণ। চা-বিস্কিট খাওয়া তো দূরের কথা, ছুঁয়েও দেখেনি।

সিটি কর্পোরেশনের লোকজন সারাদিন চেষ্টা করেও একটি কুকুরও মারতে পারেনি। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

সন্ধ্যার পর থেকে আকাশে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সামান্য বাতাসও বইছে না। প্রকৃতিতে কেমন থমথমে গুমোট ভাব। বেশ ভ্যাপসা গরমও পড়েছে। বোধহয় আজ রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে।

মাজেদা বেগম বারান্দায় বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে দেখছেন—বাড়ির চারপাশ ঘিরে কুকুরগুলো সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে বাড়ির ভিতরের কাউকে তারা পাহারা দিচ্ছে, যেন পালিয়ে যেতে না পারে। বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে কুকুরগুলোর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে মাজেদা বেগমের বুক ধুকধুক করতে থাকে।

মাঝ রাতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকার গুম গুম শব্দ।

BanglaBook.org

মাজেদা বেগম ঘুমাচ্ছিলেন। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে ঘুমানো জরিনার আর্তনাদের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। বিছানার পাশে হাতড়ে বেড সুইচটায় টিপ দেন। বিদ্যুৎ নেই। অন্ধকারের মাঝেও জানালা দিয়ে থেমে থেমে আসা বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে তিনি যা দেখতে পান, তাতে তাঁর বুক ধড়াস-ধড়াস করতে করতে বুক ফেটে যাওয়ার অবস্থা।

জরিনার আর্তনাদ শুনে পাশের ঘর থেকে লুনাও ছুটে আসে। এ ঘরের দৃশ্য দেখে লুনা বাকশক্তিহীন পাথরের মূর্তি হয়ে যায়।

বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করা সেই হিংস্র কুকুরগুলো এখন ঘরের ভিতরে। কুকুরগুলো জরিনাকে ঘিরে ধরেছে। জরিনা ভয়ে আর্তনাদ করেই যাচ্ছে।

আচমকা কুকুরগুলো জরিনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর্তনাদ, ধস্তাধস্তি, কুকুরের হিংস্র স্বরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ। ধস্তাধস্তির মাঝে জরিনার চেহারা-আকৃতি ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তন হয়ে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে।

মাজেদা বেগম আর লুনা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু তাদের চিৎকারের শব্দ ঝড়-বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে আশপাশের বাড়ির কারও কানে গিয়ে পৌঁছায় না।

কুকুরগুলো ভয়ঙ্কর বিচিত্র রূপের জরিনাকে আঁচড়ে-খুবলে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে মাজেদা বেগম তাঁর বুক খামচে ধরে ঢলে পড়ে যান। লুনা চেতনা হারায়।

পরিশিষ্ট

ভোর বেলা। লুনাকে অচেতন অবস্থায় আর মাজেদা বেগমকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মাজেদা বেগমের মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাকে। জরিনা বা কুকুরগুলোর কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি।

লুনাকে অনেকগুলো দিন কাটাতে হয় মানসিক হাসপাতালে। সে এখন পুরোপুরি সুস্থ। তবে ঝড়-বৃষ্টির রাতে এখনও সে বিচলিত হয়ে ওঠে।

চানমুন্সির দোকানের খালেদ নামের ছেলেটার কাছ থেকে রোমহর্ষক এক ঘটনা জানা যায়।

জরিনাকে খালেদ আগে থেকেই চিনত। খালেদের গ্রামেরই মেয়ে। পাঁচ

BanglaBook.org

বছর আগে জরিনা গ্রামের মজনু মাতব্বরের বাড়িতে কাজ করত। কী এক তুচ্ছ কারণে মজনু মাতব্বরের বাড়ির সবাই মিলে জরিনাকে একদিন বেধড়ক পিটায়। মাত্রাতিরিক্ত মারের ফলে জরিনার মৃত্যু ঘটে। জরিনার মৃত্যুকে ধামাচাপা দিতে মাতব্বর বাড়ির লোকজন জরিনার লাশটাকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের ভিতরে পুঁতে ফেলে। অনেকে বলে–না বুঝে জীবন্ত অবস্থায়ই জরিনাকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে মাটি চাপা দেয়ায় গর্ত তেমন গভীর করে খোঁড়া হয় না। তাই রাতের বেলা খুব সহজেই গ্রামের অভুক্ত কুকুরগুলো জরিনার লাশটাকে উঠিয়ে টেনে-হিঁচড়ে, ছিঁড়ে-ছুঁড়ে খেয়ে ফেলে। কুকুর যখন জরিনার লাশটাকে ছিঁড়ে খায়, তখন কয়েকবার জরিনার আর্তনাদের শব্দ শোনা যায়। এ থেকেই অনুমান করে কেউ কেউ বলছে, হয়তো জীবিত অবস্থায়ই জরিনাকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল।

সেই ঘটনার কয়েক মাস পর ঘটতে থাকে একের পর এক অঘটন। মজনু মাতব্বরের বাড়ির প্রত্যেকটা লোক এক এক করে অপঘাতে মারা য়ায়। কারও লাশ পাওয়া যায় পুকুরের মধ্যে, কারও লাশ পাওয়া যায় বড় গাছের মগ ডালের সাথে ঝোলানো, কেউ আবার বেত ঝোপের মাঝে কাঁটায় আটকানো, কেউ বা টয়লেটের ভিতরে মরে পড়ে থাকে। এমনকী লাশ খাওয়া কুকুরগুলোও এক এক করে মারা যায়।

খালেদের কথাবার্তায় আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়–জরিনার সাথে খালেদের প্রেম ছিল। অবশ্য তখন জরিনার এমন বিদঘুটে চেহারা ছিল না। তখন জরিনা ছিল শ্যামলা রঙের মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে। খালেদের প্রেমের টানেই হয়তো জরিনার প্রেতাত্মা এসে মাজেদা বেগমের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল।

গভীর রাত। খালেদের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন তার মাথায় পরম যত্নের সাথে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বরফ শীতল ঠাণ্ডা খসখসে একটা হাত। তার নিঃশ্বাস থেকে বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবুও খালেদ বুঝতে পারছে এ কার হাতের স্পর্শ!

BanglaBook.org

নীল নির্জন

প্রস্তাবনা

শফিক একা মানুষ। উত্তরায় চারতলার উপরে একটা ফ্ল্যাটে তার নিবাস। তার আপনজন বলতে তেমন কেউ নেই, এক বন্ধু ছাড়া। তিন বছর আগে তার মা মারা যাওয়ার পর থেকে সে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে।

শফিকের স্কুল শিক্ষিকা বিধবা মা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা সয়ে, তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে শফিককে মানুষের মত মানুষ করার সংগ্রামে মেতেছিলেন। তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল–একদিন ছেলে ভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে বড় একটা চাকরি পাবে। তাঁদের দুঃখের দিন শেষ হবে। বস্তির ছোট্ট খুপরির মত ঘর ছেড়ে একটা বড় বাসা নেবেন। ছেলের জন্য রাঙা টুকটুকে একটা বউ আনবেন...শফিকের জনম দুঃখিনি মায়ের কোনও ইচ্ছেই পূরণ হয়নি। শফিক যে বছর ঢাকা ভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরুল ঠিক তার তিন মাস আগে বিনা নোটিশে শফিকের মা হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান।

তবে মায়ের মৃত্যুর সাথে সাথে শফিককে নিয়ে মায়ের স্বপ্নগুলোর মৃত্যু হয়নি। ভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই মেধাবী শফিকের বড় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি হয়। অনেক টাকা বেতন, সাথে কোম্পানি থেকে একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট পায় সে। প্রতিদিন সকালে কোম্পানির গাড়ি তাকে বাসা থেকে অফিসে নিয়ে যায় আবার অফিস শেষে বাসায় পৌঁছে দেয়। সব মিলিয়ে বলতে হয় দারিদ্র্যের কষাঘাতে বড় হওয়া শফিকের জীবন এখন বদলে গেছে। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও শফিক খুব স্বস্তি খুঁজে পায় না। যখন ভাল কোনও খাবার সে খেতে বসে, তখন খাবারের দিকে তাকিয়ে তার বুকটা দুমড়ে-

BanglaBook.org

মুচড়ে যায়। অভাব-অনটনে জর্জরিত তার মায়ের শুকনো মুখখানা তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হায় রে! কত রাত মা অভুক্ত পেটে ঘুমিয়েছেন! মায়ের কথা মনে পড়ে শফিকের গলা দিয়ে সুস্বাদু খাবার আর নীচে নামতে চায় না।

সুসজ্জিত অভিজাত ফ্ল্যাটের ঠাণ্ডা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড রুমের নরম বিছানায় রাতে যখন শফিক ঘুমাতে যায়, তখনি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে–বস্তির ভিতরে ছোট্ট একটা ঘর। যে ঘরের মধ্যে তার ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মা মেঝেতে বিছানো ছিন্ন-জীর্ণ পাটির উপরে তেল চিটচিটে বালিশে শুয়ে তীব্র দাবদাহ থেকে একটু মুক্তির আশায় হাত পাখা নাড়তে নাড়তে কব্জি ফুলিয়ে ফেলছেন। আহা রে! সারাটা রাত মা গরমে কী কষ্টই না পেতেন! একটা ইলেকট্রিক ফ্যান কেনার সামর্থ্য তখন তাদের ছিল না। এসির ঠাণ্ডা বাতাস শফিকের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

রাস্তাঘাটে শফিক যখন কোনও সুন্দরী মেয়েকে দেখে তখনও বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। মায়ের কী ইচ্ছে ছিল নিজে পছন্দ করে তাঁর ছেলের জন্য একটা মিষ্টি বউ ঘরে আনবেন! মায়ের কোনও ইচ্ছেই পূরণ হলো না!

শফিকের বয়স ত্রিশ। লম্বা-চওড়া উজ্জ্বল শ্যামলা গায়ের রঙ। বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে চোখের মাঝে কবিদের মত উদাসীনতা। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। পুরুষালি মানানসই ঠোঁট। ঘনকালো ভুরু। উঁচু নাক।

প্রতিদিন সুট-টাই পরে শফিক যখন কোম্পানির গাড়িতে অফিসে যায় তখন রাস্তায় ধনীদের সুন্দরী দুলালিরাও একটি বারের জন্য হলেও তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায়। শফিক তখন চোখ ঘুরিয়ে ফেলে। তার মায়ের কথা মনে পড়ে। হায় রে! মায়ের কোনও ইচ্ছেই পূরণ হলো না।

শফিকের বন্ধু-বান্ধব বলতে শুধু তার ভার্সিটির ক্লাসমেট সাইফুল। সাইফুল সুযোগ পেলেই চেষ্টা করে তার বন্ধুর নিঃসঙ্গতা কিছুটা হলেও দূর করতে।

সাইফুল একটা নামকরা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার। বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম রিমি। সাইফুল বন্ধুর একাকিত্ব দূর করার জন্য প্রায়ই শফিকের ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক এসে আড্ডা দিয়ে যায়। আবার বিভিন্ন অজুহাতে শফিককেও নিমন্ত্রণ করে তাদের বাড়িতে।

BanglaBook.org

সাইফুল এবং সাইফুলের স্ত্রী রিমি ভাবি অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছে শফিককে বিয়ে করানোর জন্য। কিন্তু কিছুতেই শফিক রাজি হচ্ছে না। সে গোঁ ধরে বসে আছে। বিয়ের কথা তুললেই সে মায়ের কথা ভেবে মন খারাপ করে।

এমনকী মাঝে-মাঝে শফিক চাকরিটাও ছেড়ে দিতে চায়। এ রকম বড় একটা চাকরি করার মত যোগ্য বানানোর জন্য তিলে-তিলে যে নিজেকে শেষ করেছে, সেই মা-ই যখন আজ নেই তখন চাকরি করে কী লাভ?

চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বললে, বন্ধু সাইফুল এবং তার স্ত্রী রিমি ভাবি তাকে অনেক বোঝায়–চাকরিটা ছেড়ে দিলে তার চলবে কী করে? তাকে তো তখন না খেয়ে পথে পথে ঘুরতে হবে। তার মা কি তাকে এত কষ্ট করে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন সেই দেখার জন্য। মৃত মায়ের কথা মনে করে সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে কি মাকে ফেরত পাওয়া যাবে?

অনেক উপমা টেনে শফিককে বোঝায় সাইফুল ও রিমি ভাবি। তাতে কোনওই কাজ হয় না। চাকরি ছেড়ে দেবে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, কিন্তু তার বুকের ভিতরে মায়ের জন্য তীব্র কষ্টের যে ব্যাধি তা কিছুতেই সারে না।

বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সাইফুল ও রিমি ভাবি পরামর্শ দেয় শফিককে–কোনও দর্শনীয় জায়গা থেকে কিছু দিনের জন্য ঘুরে আসার। ঢাকা শহরের এই ব্যস্ততা, যানজট, কোলাহল, গাড়ির হর্ন, কালো ধোঁয়া মুক্ত কোনও নির্জন প্রকৃতির মাঝে গিয়ে মনের বিষাদ দূর করতে। দেশেরই বেশ কয়েকটা দর্শনীয় জায়গার গেস্ট হাউজ এবং ডাক বাংলোর ঠিকানাও যোগাড় করে দেয় সাইফুল।

কোথাও যাবে না যাবে না করেও সাইফুলের দেওয়া ঠিকানাগুলোর একটা ঠিকানা শফিকের মনে ধরে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের টিল্লামছড়ির একটা পাহাড়ের চারশ' ফুট উপরে নতুন একটা ডাকবাংলো হয়েছে। ডাকবাংলোটার নাম 'নীল নির্জন'। সেই ডাকবাংলোর পরিবেশ নাকি খুবই মনোরম। চারদিকে নীরব-নির্জনতার মাঝে পাখিদের কলকাকলি, বাতাসের ফিসফিসানি, সবুজ বনানীর ছায়া, পাহাড়ি বুনো ফুলের সৌরভ, স্বর্গীয়

BanglaBook.org

প্রকৃতি। বাংলোটা নতুন উঠেছে বলে এখন পর্যন্ত গেস্টদের আনাগোনা তেমন ভাবে শুরু হয়নি।

এক

জানুয়ারি মাসের দুই তারিখ। শফিক অফিস থেকে পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এসেছে। সে এখন টিল্লামছড়িতে। হারংকোট পাহাড়ের নীচে। বাস এখানেই তাকে নামিয়ে দিয়েছে। তার গন্তব্য এই পাহাড়েরই চারশ' ফুট উপরে 'নীল নির্জন' ডাকবাংলো। সে অপেক্ষা করছে পাহাড়ে উঠবে এমন একটা যানবাহনের।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শফিকের কাঁধে ছোট্ট একটা ট্রাভেল ব্যাগ। ব্যাগে চার দিন থাকার মত কাপড়-চোপড়, টুথব্রাশ-টুথপেস্ট আর শেভ করার সরঞ্জাম বাদে তেমন কিছুই নেই। এমন কী সে তার মোবাইল ফোনটাও সঙ্গে আনেনি। বন্ধু সাইফুলের নির্দেশ হচ্ছে–ভ্রমণে মোবাইল, ল্যাপটপ, কোনও কিছুই সঙ্গে নিতে হয় না। ভ্রমণের কয়টা দিন শুধু প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে হয়।

প্রায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও পাহাড়ে ওঠার মত কোনও যানবাহন পাওয়া গেল না। ওদিকে সন্ধ্যা মিলিয়ে রাত হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে জাঁকিয়ে শীত নেমেছে। আর অপেক্ষা না করে হেঁটেই রওনা দিল শফিক। প্রায় দুই-আড়াই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই নাকি ডাকবাংলোর দেখা পাওয়া যাবে।

পাহাড়ি পথে হাঁটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। কিছুদূর হাঁটার পরই শফিক একেবারে হাঁপিয়ে উঠল। সেই সাথে অভাব বোধ করল একটা টর্চ লাইটের। অচেনা এই পাহাড়ি পথে অন্ধকারে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। পাহাড়ি পথে অন্ধকারে হাঁটতে হতে পারে এই ভেবে সে একটা টর্চ লাইট ঠিকই সঙ্গে এনেছে। ব্যাগের ভিতরে টর্চটা আছে। কিন্তু ভুলে টর্চের ব্যাটারি কেনা হয়নি।

BanglaBook.org

শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে যেন কুয়াশা নেমেছে। সমস্ত পাহাড়টা যেন ধীরে ধীরে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে। দু'হাত দূরেও কুয়াশার কারণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শফিক মনে মনে বন্ধু সাইফুলের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগল। কারণ তার বুদ্ধিতেই এখানে আসা। এমন সময় শফিককে অবাক করে দিয়ে তার পাশে এসে একটা রিকশা ভ্যান থামল। রিকশা ভ্যানটার সামনে একটা লণ্ঠন ঝুলছে।

চালক ভ্যান থেকে নেমে আগ্রহী গলায় বলল, 'সাহেব, কোথায় যাবেন?'

ভ্যান চালকের গায়ে ধবধবে সাদা ওভার কোটের মত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পোশাক। শীত থেকে রক্ষার জন্যই বোধহয় এই পোশাক। অন্ধকারে ভ্যান চালকের চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তার পরেও ভ্যানের সামনে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে লোকটার চেহারায় কেমন দরবেশ-দরবেশ ভাব আছে। গায়ের রঙ শ্বেতি রোগীদের মত সাদা। প্রশস্ত কপালের প্রান্তভাগ থেকে উল্টিয়ে আঁচড়ানো ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। আঁখিপল্লব মেয়েদের মত ঘন কালো দীর্ঘ। ওসামা বিন লাদেনের মত লম্বা নাক, লম্বা মুখমণ্ডল।

ভ্যান চালকের প্রশ্নে শফিক যেন সম্বিত ফিরে পেল। এই অন্ধকার কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ি পথ তাকে দিশেহারা করে তুলছিল। এতক্ষণ তো মনে হচ্ছিল সারা রাত তাকে এই নির্জন পথেই কাটাতে হবে। ভ্যান চালককে পেয়ে তার মনে আলো জ্বলে উঠল।

শফিক পা ঝুলিয়ে ভ্যানে বসল। ভ্যান পাহাড়ের উপরের দিকে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে ভ্যানের গতি যেন বাড়ছে।

ভ্যান চালকের গা থেকে আতরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গন্ধটা তীব্র। কেমন যেন অদ্ভুত রকমের উগ্র গন্ধ। গন্ধে শফিকের মাথা ঝিম ঝিম করছে।

সারাদিনের যাত্রায় পথক্লান্তি আর আতরের মাথা ঝিমঝিম করা গন্ধে এক পর্যায়ে শফিক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আধোঘুম-আধোজাগরণে তার কাছে মনে হচ্ছে ভ্যানটা যেন শূন্যে ভর করে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছে।

শফিকের ঘুম ভাঙল ভ্যান চালকের সুমধুর গলার স্বরে, 'সাহেব, আমরা

BanglaBook.org

পৌঁছে গেছি।'

শফিক চোখ মেলে দেখল তারা 'নীল নির্জন' বাংলোর সামনে। ছোট্ট একটা বাংলো। বন্ধু সাইফুল বলেছিল–একেবারে সদ্য বানানো বাংলো। সাইফুলের দেওয়া তথ্য সঠিক নয়। বাংলোর বাইরের দেয়ালের রং-পলেস্তারা দেখে মোটেই নতুন বানানো বাংলো বলে মনে হচ্ছে না। কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরানো বাংলো।

শফিক ভ্যান থেকে নেমে, ভ্যান চালকের ভাড়া মিটিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ভ্যান চালক ভাড়া নিল না। সে স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বলল, 'সাহেব, আপনি যেদিন চলে যাবেন সেদিন এক সাথে ভাড়ার টাকা নেব।'

কথা শেষ করেই ভ্যান চালক, ভ্যান ঘুরিয়ে চলে গেল। শফিক অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটাকে যথেষ্টই অদ্ভুত লাগল শফিকের কাছে।

ভ্যান চালক চলে যেতেই শফিক ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাত ঘষতে ঘষতে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল। কিছুটা এগোনোর পরই বাংলো থেকে জিন্স ও লেদার জ্যাকেট পরা বিশ-একুশ বছর বয়সের একটা ছেলে এগিয়ে এল। শফিক ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এক্সকিউজ মি, এই বাংলোর কেয়ারটেকার কোথায় বলতে পারেন?'

ছেলেটা বিগলিত গলায় বলল, 'স্যর, আমিই কেয়ারটেকার। আমার নাম রকি। ঢাকা থেকে কি আপনারই আসার কথা ছিল?'

শফিক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

শফিকের জানামতে সাধারণত বাংলো-টাংলোর কেয়ারটেকার হয় বয়স্ক ধরনের লোক। এ তো একেবারে ইয়ং একটা ছেলে। ছেলেটা ফাজলামি করছে নাকি? চেহারায় ফাজিল ভাব স্পষ্ট। চুলের কাটিং বখাটেদের মত। মাথার চারপাশ ন্যাড়াদের মত করে চুল কামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মাথার উপরে, ঠিক মাঝ বরাবর ছোট করে ছাঁটা সজারুর গায়ের মত খাড়া খাড়া চুল। সমস্ত গাল শেভ করা, কিন্তু থুতনিতে ত্রিভুজ আকৃতি সামান্য দাড়ি। ভুরু-কানে রিং পরা।

ছেলেটা শফিকের কাছে এসে, শফিকের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'স্যর, চলুন আপনাকে রুমগুলো দেখিয়ে দিই।'

BanglaBook.org

কেয়ারটেকার রকির সাথে বাংলোর ভিতরে ঢুকল শফিক। রকি এক এক করে বাংলোর ড্রইংরুম, বেডরুম, ডাইনিং স্পেস, বাথরুম সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল।

বাইরে থেকে বাংলোটা দেখে যতটা জীর্ণ দশা মনে হয়েছে, ভিতরে একদমই তেমন নয়। ভিতরটা অত্যাধুনিক সাজে সজ্জিত। বাথরুমে অত্যাধুনিক বিদেশি ফিটিংস। বেডরুমের বালব হাতে তালি দিলে জ্বলে ওঠে আবার আর একটা তালি দিলে বালব নিভে যায়। দেয়ালের রঙও নাকি সুইচ টিপে ইচ্ছে মত পরিবর্তন করা যায়। রিমোটে দরজা খোলা যায়। ইচ্ছে মত রুমের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আরও আরও কী সব যেন হড়বড় করে বলল কেয়ারটেকার ছেলেটা। কেয়ারটেকারের সব কথা বুঝতেও পারল না শফিক।

বাংলোর ভিতরের সব কিছু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো শেষে রকি বলল, 'স্যর, আজ রাতে কী খাবেন?'

শফিক বলল, 'ভাত খাব। ভাতের সাথে আলু ভর্তা-ডাল যা হোক হলেই চলবে। খাওয়া নিয়ে আমার কোনও বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ নেই।'

রকি অবাক হয়ে বলল, 'স্যর, বাংলোর গেস্টদের মধ্যে অনেক দিন পর আপনিই বললেন ভাত-আলুভর্তা হলেও চলবে। আজকাল তো লোকে এসব খাবারের কথা প্রায় ভুলেই গেছে।'

কেয়ারটেকার রকির কথা শুনে শফিক বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাল। আর মনে মনে বলল, 'সজারুর মত মাথায় চুল নিয়ে কী বলছে ছাগলটা? ভাত, আলুভর্তা, ডাল...এসব খাবারের কথা নাকি লোকে ভুলতে বসেছে!'

শফিক রাতের খাওয়া শেষ করল।

সারা দিনের পথযাত্রায় সে খুবই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত ছিল। ধোঁয়া ওঠা চিকন চালের ভাতের সাথে শুকনো মরিচ দিয়ে বানানো লালচে রঙের আলুভর্তা আর ঝোল ঝোল করে রান্না করা মুরগির মাংস ও ডাল চচ্চড়ি দিয়ে সে খুবই তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছে। খুব বেশি ক্ষুধার্ত থাকায় আজ খাওয়ার সময় মায়ের কথা মনে না পড়ায়, অনেক দিন পর আজ সে খুব আরাম

BanglaBook.org

করে খেয়েছে।

খাওয়া শেষ হতেই শফিকের গা ছেড়ে দিল। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য ভর করল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেতে চাইল।

শফিক বেডরুমে ঢুকে মিষ্টি গন্ধযুক্ত নরম লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রিমোটে চাপ দিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দিল। রিমোটের আর একটা বাটনে চাপ দিয়ে সমস্ত রুম বেলি ফুলের হালকা সৌরভে ভরিয়ে তুলল। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আলতো ভাবে হাতে তালি দিয়ে রুমের আলো নিভিয়ে দিল।

দুই

পাখি ডাকা ভোরে শফিকের ঘুম ভাঙল। রাতে খুব ভাল ঘুম হয়েছে। এক ঘুমে রাত কাবার। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। বেডরুমের সাথে লাগোয়া ছোট্ট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। সূর্য উঠি উঠি করছে। ভোরের প্রথম সূর্যের সোনালি আভায় স্নানরত সবুজ বনানী। রাতের সেই ঘন কুয়াশার লেশমাত্র নেই।

শফিক মুগ্ধ হয়ে চারদিক দেখতে লাগল। আচমকা তার চোখ পড়ল বাংলো থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে। সেখানে একতলা একটা বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি...রঙ-বেরঙের ফুলে-ফুলে ভরা বাগানটি। হালকা নীল রঙের পোশাক পরা এক তরুণী সেই বাগান থেকে ফুল তুলছে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে শফিক মুগ্ধ হয়ে গেল।

শফিক মন্ত্রমুগ্ধের মত বাংলো থেকে বের হয়ে ফিতের মত আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ ধরে পায়ে পায়ে সেই ফুলের বাগানের দিকে এগোতে লাগল।

শফিককে আসতে দেখে তরুণী থমকে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তরুণীর চেহারা পরীর মত সুন্দর। দুধে-আলতা গায়ের রং। টানা-

BanglaBook.org

টানা কাজল কালো চোখ। প্রজাপতির ডানার মত আঁখি পল্লব। পাতলা চিকন ভুরু। প্রশস্ত কপাল ছুঁয়ে নেমেছে ঘনকালো মেঘের মত এক রাশ চুল। শিশির ভেজা গোলাপের পাপড়ির মত জোড়া অধর।

শফিকের কাছে মনে হচ্ছে সে যেন আকাশ থেকে নেমে আসা একটা পরীকে দেখছে। আকাশ থেকে নেমে এসে পরীটা ফুলের বাগানে ফুল তুলছে। ইট-কংক্রিটের ঢাকা শহরে প্রতিনিয়তই কত সুন্দরী তরুণীর মুখোমুখি হয়েছে সে, কিন্তু এমন অদ্ভুত সুন্দর জীবনে আর কাউকে লাগেনি। কী স্নিগ্ধ! কী কোমল! কী মায়াময়! কী নিষ্পাপ চেহারা! যেন প্রকৃতির কন্যা!

শফিকের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার চোখ ছলছল করে উঠল। মা যদি এমন একটা মেয়েকে দেখত, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে উঠত–এই মেয়েকেই তাঁর ছেলের বউ করার জন্য।

তরুণী রঙ-বেরঙের একগুচ্ছ ফুল হাতে থমকে দাঁড়িয়েই রইল। শফিক কাছাকাছি পৌঁছে গেলে ভীত গলায় বলে উঠল, 'কে আপনি?'

তরুণীর গলার স্বরও অত্যন্ত মিষ্টি।

শফিক তার ভুল বুঝতে পারল। অপরিচিতা এক তরুণীর দিকে এমন পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে, মেয়েটা যে কিছুটা হলেও অস্বস্তিবোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটা অস্বস্তির সাথে বেশ ভয়ও পেয়েছে। ঢাকা শহরের কোনও আধুনিকা হলে হয়তো এমন ভয় পেত না। নির্জন পাহাড়ে বাস করা সহজ-সরল মেয়ে বলেই...

শফিক থতমত খাওয়া গলায় বলে উঠল, 'আমি শফিক আহমেদ। ঢাকা থেকে এসেছি।' আঙুল তুলে বাংলোটা দেখিয়ে, 'ওই বাংলোতে উঠেছি।'

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে এক বয়স্ক লোক বেরিয়ে এলেন। লোকটা কিছুটা দূর থেকেই উঁচু গলায় বলতে লাগলেন, 'কে-রে, মা? তুই কার সাথে কথা বলছিস?'

লোকটার বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি। চেহারায় সৌম্য-শান্ত ভাল মানুষি ছাপ। তরুণীর মতই উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। নাক, চোখ, চেহারায়ও মেয়েটির সাথে যথেষ্ট মিল। মাথা ভর্তি মেহেদি দেওয়া পাকা চুল। মুখ ভর্তি চাপ দাড়িতেও মেহেদির রং।

BanglaBook.org

ভদ্রলোক কাছাকাছি পৌঁছাতেই তরুণী বলল, 'বাবা, উনি শফিক আহমেদ। ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছেন।'

শফিক ভদ্রলোককে সালাম দিল।

ভদ্রলোক সালামের উত্তর দিয়ে কোমল গলায় বললেন, 'বাবা, আমি আসাদ খান। এই বাড়ি আমাদের। এখানে আমি আর আমার মেয়ে থাকি। আপনি কি কোনও প্রয়োজনে আমাদের কাছে এসেছেন?'

শফিক লজ্জিত গলায় বলল, 'না, আংকেল, আমি বিশেষ কোনও প্রয়োজনে আসিনি। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনাদের এই বাড়ি আর বাড়ির সামনের এই ফুলের বাগান দেখে এত ভাল লেগেছে, তাই কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে চলে এসেছি।'

আসাদ খান প্রসন্ন হাসি দিয়ে বললেন, 'ফুলের বাগানটার জন্যই বাড়ির সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।' আসাদ খান তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে, 'ও-ই এই বাগানটা করেছে। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় জন্মানো বিভিন্ন বুনো ফুল গাছ সংগ্রহ করে এই বাগান করেছে। দেখছেন না, শুধু মাত্র কাঠ গোলাপ আর ক্যামেলিয়া ফুল ছাড়া বাগানের অন্যান্য সব ফুলই প্রায় অচেনা।'

শফিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার প্রচেষ্টায় আজ পাহাড়ের বুকে একটা স্বর্গীয় দৃশ্য ফুটে উঠেছে। স্বর্গেও বোধহয় এত সুন্দর দৃশ্য থাকবে না।'

তরুণী মিষ্টি কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার ফুলের বাগানের প্রশংসা করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনি ঢাকা শহরের বাসিন্দা। প্রথম-প্রথম আপনার কাছে এখানকার সব কিছুই স্বর্গীয় মনে হবে।'

শফিক মোলায়েম হাসি দিয়ে বলল, 'তা একেবারে মন্দ বলেননি।' আর মনে মনে বলল, 'আপনাকেও আমার স্বর্গের অপ্সরীর মত লাগছে।'

আসাদ খান বললেন, 'চলুন, আমাদের এই বাড়ি দেখে আপনি যখন এতই মুগ্ধ হয়েছেন, বাড়ির ভিতরে বসে অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যান।'

শফিকের কিছুটা সংকোচ লাগল এই ভেবে, অপরিচিত একটা লোকের বাড়িতে হুট করে চা খেতে ঢুকে পড়াটা কী শোভন হবে? আবার এটাও ভাবল, বাবার বয়সী একটা লোকের আমন্ত্রণ কী করে উপেক্ষা করবে?

BanglaBook.org

অবশ্য মনের গভীরে এ ভাবনাও আছে, যতক্ষণ এখানে থাকা যাবে ততক্ষণ স্বর্গের অপ্সরীকেও দেখা যাবে।

আসাদ খান শফিককে নিয়ে বাড়ির বারান্দায় বসলেন। বেশ প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় পাহাড়ি বেতের বানানো গদি আঁটা বাহারি সোফা। সোফার সামনে রাখা টি টেবিলও বেতের।

আসাদ খান আর শফিক মুখোমুখি সোফায় বসেছে। তাদের গায়ে সকালের নরম রোদ এসে পড়েছে। আসাদ খানের মেয়ে গিয়েছে নাস্তা বানাতে।

আসাদ খান গলায় উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'লোকালয়হীন এই পাহাড়ে আমাদের বসবাস বলে, লোকজনের সাথে বলতে গেলে তেমন মেশাই হয় না। আপনার মত মাঝে-মাঝে বাংলোতে শিক্ষিত-ভদ্র লোকজন বেড়াতে এলে, তাদের সাথে মিশতে, কথা বলতে খুব ভাল লাগে।'

শফিক বলল, 'আংকেল, আপনি আমার বাবার বয়সী লোক, আপনি আমাকে "আপনি" বলে সম্বোধন করছেন, এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে। আপনি আমাকে "তুমি" করে বললে খুব খুশি হতাম।'

আসাদ খান খুশি খুশি গলায় বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, এখন থেকে আমি তোমাকে "তুমি" করেই বলব।'

শফিক বলল, 'আংকেল, আপনি এই পাহাড়ে কবে থেকে?'

প্রশ্নটা শোনার পর আসাদ খান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বাবা, সে এক লম্বা কাহিনি, তোমার শোনার ধৈর্য হবে না।'

শফিক আগ্রহী কণ্ঠে বলল, 'আংকেল, আপনি বলুন, আমি শুনব।'

আসাদ খান বলতে শুরু করলেন: 'আমার বয়স তখন দশ-এগারো। এরও দুই-তিন বছর আগেই আমি বাবা-মাকে হারিয়ে এতিম হয়েছি। আমি গ্রাম সম্পর্কের এক চাচার সাথে থাকি। আমি ডাকতাম তাঁকে হাসু চাচা বলে। তাঁর প্রকৃত নাম হাসেম মিয়া। হাসু চাচাও আমার মত একা মানুষ ছিলেন। এক ঝড়ের রাতে তাঁর ঘরের উপরে মস্ত এক গাছ ভেঙে পড়ে তাঁর বউ, ছেলে-মেয়ে সবাই মারা গিয়েছে। স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে তিনি আমাকে আগলে জীবন-যাপন করতে লাগলেন। নিজ সন্তানের মত আদর করতেন

BanglaBook.org

তিনি আমাকে।

'হাসু চাচা এর-ওর বাড়িতে কামলার কাজ করতেন। কাজ জুটলে আমাদের খাবার জুটত, না হয় না খেয়ে থাকতে হত।

'ও ভাল কথা, আমাদের গ্রামের নাম তো বলা হয়নি। আমাদের গ্রামের নাম হরিন্দাপুর। চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা গ্রাম।

'হঠাৎ হাসু চাচা এক পুলিশ সুপারের সুপারিশে একটা চাকরি পান। একটা নতুন ওঠা ডাক বাংলোর কেয়ারটেকারের চাকরি।'

আসাদ খান 'নীল নির্জন' বাংলোর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'এই সেই বাংলো। হাসু চাচা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলোতে কেয়ারটেকারের চাকরি করতে এলেন। বাংলোটা তখন নতুন ছিল বলে গেস্টদের তেমন আনাগোনা হত না। মাঝে-মধ্যে দুই-চারজন যারা আসত তাতেই আমাদের চলে যেত। বাংলোতে গেস্ট এলে আমাদের খুব খুশি লাগত। এর কারণ—বাংলোতে গেস্ট এলে, গেস্টদের জন্য ভাল-ভাল রান্না করা হত। গেস্টরা খাওয়ার পরে যে খাবার বাড়তি থেকে যেত তা আমি আর হাসু চাচা খেতাম। এ ছাড়া বাংলোতে আসা অধিকাংশ গেস্টরাই—আমার বাবা-মা নেই, এতিম, এই জেনে এবং আমার সুন্দর চেহারা দেখে, আমাকে খুব স্নেহ করত। তাদের বিভিন্ন ফুট-ফরমাস শুনতাম, বিনিময়ে বাংলো ছেড়ে চলে যাবার সময় বকশিশ দিয়ে যেত। সব গেস্ট যে এমন ছিল তা নয়, কিছু কিছু গেস্ট এর উল্টোটাও হত। একটু ভুল-টুল করলেই চড়-থাপ্পড় বসিয়ে দিত। একবার এক মাতাল গেস্ট এসে উঠল। সে সারাক্ষণ শুধু মদ খেত। একদিন আমাকে তার জুতো পরিষ্কার করে দিতে বলে। আমি ছোট মানুষ, না বুঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে জুতো মুছে দিতে লাগলাম, অমনি লোকটা কষে একটা লাথি মারল আমাকে। আমি ছিটকে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়লাম। এর পরে তিন দিনে আমি আর কোমর তুলে দাঁড়াতে পারিনি।

'তার পরেও সব মিলিয়ে বলতে হয় বাংলোতে আমাদের দিনগুলো খুব সুন্দর ভাবেই কাটতে লাগল। দিনে দিনে আমি যুবক হলাম আর হাসু চাচা বৃদ্ধ হলেন।

'হাসু চাচা আর আগের মত কাজ-টাজ করতে পারেন না। বলতে গেলে

BanglaBook.org

তখন বাংলোর সমস্ত দায়িত্বই আমার কাঁধে। এমন সময়ে বিশাল এক ধনী ব্যবসায়ী বাংলোতে বেড়াতে এলেন। অত্যন্ত উদার মনের লোক ছিলেন তিনি। কী মনে করে যেন তিনি আমাকে খুব পছন্দ করলেন। একদিন আমাকে নিয়ে তিনি সারা পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে একটা প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। তা হলো, তিনি পাহাড়ি গাছের কাঠের ব্যবসা করবেন। আমাদের এখানের আশপাশের বিভিন্ন পাহাড় থেকে গাছ সংগ্রহ করে, চেরাই করে কাঠ বানিয়ে, সারা দেশে সেই কাঠ সরবরাহ করবেন। পাহাড়ি গাছের কাঠের ডিমাণ্ড নাকি খুব বেশি। কিন্তু এ কাজে অনেক ঝামেলাও আছে। সরকারি টেণ্ডারের মাধ্যমে গাছ কাটার অধিকার গ্রহণ করতে হয়। পাহাড়ি গাছের কাঠ ব্যবসায়ের সমস্ত দায়িত্ব আমার। তিনি শুধু মূলধন দিবেন। লাভ অর্ধেক অর্ধেক।

'আমি কাঠ ব্যবসায়ের সাথে জড়িয়ে পড়লাম। আমার সুদিন এল। অনেক টাকা হাতে আসতে লাগল। ভাবলাম–এবার একটা বাড়ি বানাব। বিয়ে করব। হাসু চাচাকে সঙ্গে নিয়ে সুখের জীবন শুরু করব। বাসর ঘরেই বউকে বলে দেব–হাসু চাচা আমার শুধু চাচা নন, বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি। তিনিই আমাকে বাবার আদর এবং মায়ের ভালবাসা দিয়ে বড় করেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর যেন সেবা-যত্নের একটুও কমতি না হয়।

'পাহাড়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের প্রতি মায়া জন্মে গেছে। তাই পাহাড়ের উপরেই এই বাড়ি বানাতে শুরু করলাম। বাড়ি কমপ্লিট হওয়ার আগেই হাসু চাচা মারা গেলেন।'

বলা শেষ করে আসাদ খান হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছলেন।

শফিক নরম গলায় বলল, 'আংকেল, আপনার জীবনের সাথে আমার জীবনেরও অনেকটাই মিল আছে। শুনবেন আমার কাহিনি?'

আসাদ খান ভেজা গলায় বললেন, 'বল বাবা, শুনব।'

শফিক তার জীবনের কাহিনি শুরু করল। তার বিধবা মা তাকে কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন। ভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরুবার তিন মাস আগে মায়ের মৃত্যু। মায়ের স্বপ্নগুলো। মায়ের কথা মনে করে তার বুকের হাহাকার...এক এক করে সব বলল শফিক। বলতে বলতে শফিকের কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

আসাদ খান আর শফিকের কথাবার্তার কোনও এক পর্যায়ে, আসাদ খানের মেয়ে নাস্তার ট্রে হাতে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শফিকের বলা শেষ হতেই মেয়েটি পিছন থেকে ধরা গলায় বলে উঠল, 'আপনি তো তবু সাতাশ-আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত আপনার মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন। যারা জন্মের সময়ই মাকে হারায় তাদের অবস্থা কখনও ভেবে দেখেছেন? আপনার কাছে তো তবু মায়ের স্মৃতিগুলো জমা আছে, তাদের কাছে কী আছে?'

শফিক ঘাড় ঘুরিয়ে অপ্সরীর দিকে তাকিয়ে দেখল–অপ্সরীর মায়াভরা চোখ দুটো ছলছল করছে।

আসাদ খান বলে উঠলেন, 'আমার এই মেয়েটাও খুব দুঃখিনী। ওর জন্মের সময়ই ওর মা মারা যায়।'

মেয়েটি গলায় কৃত্রিম ঝলমলে ভাব এনে বলল, 'বাবা, আর কথা নয়, এখনই নাস্তা সেরে নাও। সব কিছু গরম আছে, দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন খেতে আর ভাল লাগবে না।'

নাস্তার ব্যাপক আয়োজন। পরোটা, কলিজাভুনা, ডিম পোচ, মাখন লাগানো পাউরুটি, কলা, কমলার জুস আর চা।

নাস্তা শেষ করে শফিক চলে আসার জন্য উঠে পড়ল। আসাদ খান কয়েকবার শফিককে বললেন, 'বাবা, তুমি এখানে যত দিন আছ, যখনই ইচ্ছে করবে আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে চলে আসবে।'

শফিক আসাদ খানের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তাঁর মেয়ের রূপের মোহে প্রায় পাগল। এ ছাড়া আসাদ খান এবং আসাদ খানের মেয়ের মাঝে সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। তাদের তিনজনের জীবনই যেন এক সুতোয় গাঁথা।

শফিককে এগিয়ে দিতে এল আসাদ খানের মেয়ে। শফিক বাড়ির বাইরে বের হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এতটা সময় আপনাদের বাড়িতে কাটালাম, কিন্তু আপনার নামটা তো জানা হলো না।'

মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'সরি! আমার নাম মুনা।'

BanglaBook.org

তিন

পড়ন্ত বিকেল। শীতের হিমেল হাওয়া বইছে।

শফিক পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথ ধরে একা একা আনমনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশপাশের কোনও কিছুই তাকে আকর্ষণ করছে না। তার মাথার ভিতরে ঘুরছে শুধু একটা নাম, একটা মিষ্টি মুখ।

এক দিনের পরিচয়েই আসাদ খানের মেয়ে মুনা শফিকের সমস্ত হৃদয় জুড়ে নিয়েছে। ভালবাসা বুঝি এমন করেই হয়! প্রথম দেখাতেই ভালবাসা। কিন্তু কীভাবে জানানো যায় তার সেই ভালবাসার কথা। কিছুই মাথায় আসছে না শফিকের।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় শফিক নিজেকে আবিষ্কার করল মুনাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে। কলিং বেল টিপল। মুনা দরজা খুলল। তার পরনে গোলাপী রঙের সোয়েটার। লাল রঙের ওড়না। খোলা চুল। সকালের থেকেও এখন তাকে আরও সুন্দর লাগছে।

মুনা শফিককে দেখে অবাক হওয়া গলায় বলল, 'ও, আপনি! বাবা তো বাসায় নেই। বাবা গেছে চট্টগ্রাম। কী এক ব্যবসায়ীক কাজে। ফিরতে রাত হবে।'

শফিক আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি ঠিক আপনার বাবার কাছে আসিনি। এসেছি-আপনার কাছে।'

মুনা এক রাশ বিস্ময় নিয়ে শফিকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শফিক মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগল—আমাকে বলতে হবে...আমার ভালবাসার কথা আমাকে জানাতে হবে...এত অল্প পরিচয়ে কোনও মেয়েকে ভালবাসার কথা জানানো হয়তো অশোভন...কিন্তু এর পরেও আমাকে জানাতে হবে...আমি আর পারছি না...প্রেমে এবং যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু থাকে না...

শফিক নাটকীয় ভঙ্গিতে মুনাকে প্রেম নিবেদন করে বসল। সে এখন

BanglaBook.org

সম্পূর্ণ ঘোরের ভিতরে। সে কী করছে না করছে সেদিকে তার কোনও খেয়ালই নেই।

শফিক মুনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, হাত জোড় করে, চোখ বন্ধ অবস্থায়, ধরা গলায় বলল, 'আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি...ভীষণ ভাবে...খুউব বেশি...প্রচণ্ড ভালবাসি আমি তোমাকে...'

মুনা কিছুই বলল না। সে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রচণ্ড চমকে গিয়েছে। চট করে সে শফিকের সামনে থেকে ঘরের ভিতরে আড়ালে চলে গেল।

মুনা চলে যাওয়ার পরও শফিক কিছুক্ষণ একই অবস্থায় রইল। মুনার কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে এক সময় চোখ খুলে দেখে তার সামনে মুনা নেই।

উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা নিয়ে শফিক বাংলোতে ফিরে এল। সন্ধ্যা মিলিয়ে রাত হয়েছে।

সারা রাত শফিক ঘর অন্ধকার করে নির্জীব হয়ে বিছানায় পড়ে রইল। রাতে কিছু খাওয়াও হলো না। শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এল।

খুব ভোরে দরজায় মৃদু টোকার শব্দে শফিকের ঘুম ভাঙল। শফিক বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই রিমোট টিপে দরজা খুলল। দরজা সম্পূর্ণ খোলার পর সে হতভম্ব হয়ে গেল। দরজার সামনে মুনা দাঁড়ানো। তার হাতে একটা টকটকে লাল রঙের ক্যামেলিয়া ফুল।

শফিক তৎক্ষণাৎ শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল। মুনা ঘরের ভিতরে ঢুকে ক্যামেলিয়া ফুলটা আর একটা চিরকুট রেখেই ছুটে পালাল।

চিরকুটে লেখা: সারা রাত আমি এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। শুধু ছটফট করেছি। আমার হৃদয় মন্দিরের দরজায়, এই প্রথম কেউ টোকা দিয়েছে। এই পৃথিবীতে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বাবার অনুমতি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না।

শফিক ক্যামেলিয়া ফুলটা এবং চিরকুটটা হাতে নিয়ে সারা দিন স্থবিরের মত বসে রইল। সারা দিনে চিরকুটটা অন্তত একশ'বার পড়া হলো। চিরকুটের ভাবার্থ বের করতে বিকেল হয়ে গেল। চিরকুটে লেখা কথার মানে বোঝার পর সে সযত্নে ফুলটা এবং চিরকুটটা তার ব্যাগের সাইড

BanglaBook.org

পকেটের ভিতরে রাখল।

শফিক বাংলোর কেয়ারটেকার রকিকে ডেকে টাকা দিল দুটো ব্যাটারি কিনে আনার জন্য। তার কাছে যে ব্যাটারিবিহীন টর্চটা আছে সেটায় ব্যাটারি লাগিয়ে, আজ সন্ধ্যার পরে সে মুনাদের বাড়িতে যাবে। পাহাড়ি পথে আলোবিহীন হাঁটতে অনেক বেগ পেতে হয়।

শফিক শেভ করে অনেকক্ষণ ধরে ভাল ভাবে গোসল সেরে, ফ্রেশ হয়ে নিল। শেষ বিকেলে গোসল করায় তার খুব শীত লাগতে লাগল। গরম পোশাক পরে, কেয়ারটেকার রকির ব্যাটারি নিয়ে ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল।

রকি ব্যাটারি নামক যে জিনিস এনে শফিকের হাতে দিল, তা এর আগে শফিক জীবনেও দেখেনি। দেয়াশলাইয়ের বাক্সের মত ছোট্ট দুটো জিনিস। শফিক অবাক হয়ে বলল, 'এ কেমন ব্যাটারি?'

রকি বলল, 'স্যর, এই ধরনের ব্যাটারিই তো সবাই আজকাল ব্যবহার করে।'

শফিক তার টর্চটা দেখিয়ে বলল, 'আমি, এই টর্চটার ব্যাটারি আনতে বলেছিলাম।'

রকি টর্চটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বলল, স্যর, এই টর্চ আপনি পেয়েছেন কোথায়? এ-ধরনের টর্চের চল তো অনেক আগেই উঠে গিয়েছে। বাপ-দাদাদের কাছে শুনেছি তারা নাকি এমন টর্চ ব্যবহার করত। এ-ধরনের টর্চের ব্যাটারিও এখন আর মার্কেটে পাওয়া যায় না।'

রকির কথা শুনে শফিকের খুব রাগ লাগল। এ-ধরনের টর্চের চল নাকি উঠে গিয়েছে! ওর বাপ-দাদারা নাকি এমন টর্চ ব্যবহার করত! বলে কী ছাগলটা!

টর্চ নিয়ে ভাববার সময় শফিকের নেই। তার মাথার ভিতরে ঘুরছে শুধু মুনা। এই মুহূর্তে মুনাকে ছাড়া সে কোনও কিছু নিয়েই ভাবতে চায় না। মুনাকে তার জয় করতেই হবে।

শফিককে দেখে আসাদ খান খুব খুশি হলেন।

বসার ঘরে আসাদ খান আর শফিক মুখোমুখি বসে, অনেক কথাবার্তা

BanglaBook.org

শেষে এক পর্যায়ে শফিক গলায় অনেকখানি সংকোচ নিয়ে বলল, 'আংকেল, আপনাকে আমার একটা বিশেষ কথা বলার ছিল।'

আসাদ খান বললেন, 'দ্বিধা করছ কেন? যা বলতে চাও বলে ফেল। আমি কিছু মনে করব না।'

'আংকেল, আপনাকে তো আমার সম্পর্কে সব কিছুই জানিয়েছি। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন কেউই নেই। তাই আমাকেই এ কথাটা বলতে হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর শফিক আড়ষ্ট গলায় বলল, 'আপনার মেয়েকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

আসাদ খান আমোদিত গলায় বললেন, 'এ-তো খুব ভাল কথা। সেই ছেলেবেলা থেকে বাংলোতে কত লোক আসতে-যেতে দেখেছি–লোক চেনার ক্ষমতা আমার হয়েছে। তোমাকে দেখেই বুঝেছি, তুমি যে খুব ভাল ছেলে। আমার পক্ষ থেকে কোনও আপত্তি নেই। মুনা রাজি থাকলেই হলো। কিছুদিন ধরে আমি এমনিতেও ভাবছিলাম–মেয়েটাকে একটা সুপাত্রের হাতে পাত্রস্থ করা দরকার। বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কবে যেন হুট করে মরে যাই। তখন মেয়েটাকে কে দেখবে।'

আসাদ খান এবং শফিকের মাঝের কথাবার্তা দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনল মুনা। তার বাবা শফিকের সাথে তাকে বিয়ে দিতে রাজি আছে, শুনে তার মন আনন্দে নেচে উঠল। অচেনা এক অনুভূতিতে বুকের ভিতরে ধুকপুকানি হতে লাগল।

আসাদ খান শফিককে রাতে না খাইয়ে ছাড়লেন না। খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশনের সময় মুনা আড় চোখে সারাক্ষণ শফিকের দিকে লক্ষ রেখেছে। শফিকের চোখে চোখ পড়লেই তার বুক ধকধক করে উঠেছে।

খাওয়া শেষে শফিককে বিদায় দিতে এল মুনা। আসাদ খান হয়তো ইচ্ছে করেই তাদেরকে একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন।

মুনা নিচু গলায় বলল, 'রান্না কেমন হয়েছে?'

শফিক উৎসাহিত গলায়, 'অসাধারণ! বিশেষ করে সর্ষে ইলিশ আর কাঁঠালের বিচি দিয়ে খাসির মাংসের রান্নাটা। আমি আমার জীবনে এত ভাল

BanglaBook.org

রান্না আগে খাইনি।'

মুনা বলল, 'পাহাড়ে বেড়াতে এলে মুখের স্বাদ বেড়ে যায়। কী জন্যে বলুন তো? কারণ পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথে হাঁটাহাঁটি করলে খুব খিদে লাগে।'

শফিক কিছু না বলে মুগ্ধ চোখে মুনার দিকে তাকিয়ে রইল। মুনার গায়ে এখন একটা কালো রঙের চাদর। কালো চাদরের মাঝে তার ফর্সা মুখটা চাঁদের মত জ্বলজ্বল করছে।

মুনা আবার বলল, 'আপনি কি কোনও কিছু রাঁধতে পারেন?'

শফিক আগ্রহী গলায় বলল, 'ভাত, আলুভর্তা, ডিম ভাজি আর চা রাঁধতে পারি। একা মানুষ তো, প্রায়ই এসব রেঁধে খেতে হয়।'

মুনা বলল, 'তাতেই চলবে।'

'কী চলবে?'

মুনা লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'আমার অসুখ করলে আপনাকেই তো রান্না করতে হবে।'

মুনার কথা শুনে শফিক হেসে ফেলল।

'সত্যিই আপনি খুব সাদাসিধা একটা মেয়ে। এ যুগের মেয়েরা এতটা সহজ-সরল সাদাসিধা হয় না।'

মুনা গলায় কপট রাগ এনে বলল,' আপনি আমাকে "আপনি-আপনি" করছেন কেন? কাল তো হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে, বেশ তো "তুমি-তুমি" করে বলেছিলেন।'

'তুমিও তো আমাকে "আপনি" বলছ।'

'আমি সারা জীবনই আপনাকে "আপনি-আপনি" করে বলব। কখনোই "তুমি-তুমি" করে বলতে পারব না। তা হলে লজ্জায়ই আমি মরে যাব।'

শফিক বাংলোতে ফিরে আগামী দিনগুলোর রঙিন স্বপ্ন বুনতে-বুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হবার আগেই শফিকের বেড রুমের দরজায় টোকার শব্দ শোনা গেল। শফিক ঘুম জড়ানো গলায় বিরক্ত কণ্ঠে, 'এ...ত... সকা...লে...কে? বলতে বলতে রিমোট টিপে দরজা খুলে দিল। দরজার সামনে মুনা দাঁড়ানো।

BanglaBook.org

শফিক মুনাকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিছানায় বসল। অবাক হওয়া গলায় বলল, 'এত ভোরে তুমি?'

মুনা শফিকের হাতে একটা ক্যামেলিয়া ফুল গুঁজে দিয়ে বলল, 'জলদি চলুন, আপনাকে পাহাড়ের চূড়ায় বসে সূর্য ওঠা দেখাব।'

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দু'জন সূর্য ওঠা দেখছে। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। আশপাশের বড় বড় পাহাড়গুলোর চূড়ায় সোনালি সূর্যের আভা এসে প্রথমে পড়ল। সোনালি আভাটা পাহাড়গুলোর চূড়া বেয়ে বেয়ে নীচে নামতে লাগল। এক সময় সোনালি রশ্মিতে ছেয়ে গেল চারপাশ। উঁচু উঁচু গাছগুলোর মাথায় যেন সোনালি আগুন লেগেছে। ধীরে ধীরে সোনালি আগুন পৌঁছে গেল নীচে দুই পাহাড়ের মাঝের সবুজ ঘাসের সমতল ভূমিতে।

মুনা শফিককে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। ঝরনা, অচেনা প্রাচীন গাছ, জানা-অজানা বিভিন্ন পাখি, রং-বেরঙের প্রজাপতির পাহাড়ি বুনো ফুলে ঘুরে বেড়ানো...এসব কিছু দেখে শফিক যতটা মুগ্ধ হয়, তার চেয়ে মুগ্ধ হয় মুনাকে দেখে দেখে। মুনার সিগ্ধ হাসি, মায়াকাড়া চোখের চাহনি, ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস, চিত্রল হরিণীর মত চপলতা...প্রতি মুহূর্তে তাকে মুগ্ধ করে দেয়। মুগ্ধতার আবেশে কেটে গেল তার দিবস-রজনী।

BanglaBook.org

চার

মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেল। শফিককে ঢাকা ফিরে যেতে হবে। সে অফিস থেকে পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল, সাত দিন কেটে গিয়েছে। আর থাকা সম্ভব নয়।

মুনার বাবা আসাদ খানের সাথে শফিকের পাকা কথা হয়ে গিয়েছে। শফিক দুই-তিন দিন পরই আবার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে, বন্ধু সাইফুলকে

সাথে করে আসবে। তখন বন্ধু সাইফুলের উপস্থিতিতে তার আর মুনার বিয়েটা হবে।

শফিকের যাবার কথা শুনে মুনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মুনাকে কাঁদতে দেখে শফিক আদুরে গলায় বলল, 'এই বোকা মেয়ে, কাঁদছ কেন?'

মুনা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'আমার মন বলছে, আপনি আর কোনওদিনই আসবেন না।'

'ছিঃ! এসব তুমি কী বলছ! আমি যতক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলব, তুমি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে থাকবে। জীবনের বাকি পথটুকু তোমাকে সঙ্গে নিয়েই পাড়ি দেব। তোমাকে পেয়ে মাকে হারানোর কষ্ট ভুলে গিয়েছি, এ জীবন থাকতে তোমাকে আর হারাব না। তুমিই তো আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন এখন।'

মুনা ফোঁপাতেই থাকে। তার চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে বাঁধ ভাঙা অশ্রু।

শফিক মুনার হাত দুটো তার দু-হাতের মাঝে শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'তোমার এই হাত আমি ছেড়ে দেয়ার জন্য ধরিনি। আমি যদি কোনওদিন তোমাকে ভুলে যাই, সেদিন বুঝবে আমি নিজেকেই ভুলে গিয়েছি।'

কোনও ভাবেই মুনাকে সামলানো যায় না। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে।

'আরে, বোকা মেয়ে, আমি তো দু'দিন পরেই ফিরে আসছি। তখন একেবারে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি যেখানে থাকব তুমিও সেখানে থাকবে। জীবনে কোনওদিন আর আমরা আলাদা হব না।'

মুনা যেমন প্রতিদিন একটা টকটকে লাল ক্যামেলিয়া ফুল শফিককে দেয়, আজও দিল। আর চোখের পানি মুছতে মুছতে ভাঙা গলায় বলল, 'আপনি যত দিন না ফিরবেন, ততদিন আমি সকাল থেকে রাত অবধি একটা ক্যামেলিয়া ফুল হাতে নিয়ে, পথের দিকে তাকিয়ে, আপনার ফেরার অপেক্ষা করব।'

শফিক ক্যামেলিয়া ফুলটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকে। পিছনে দাঁড়ানো তার সহজ-সরল অবুঝ প্রেয়সী চোখের পানি ফেলতে

BanglaBook.org

থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপে শফিকের বুকটাও ভেঙেচুরে যায়। প্রেয়সীর চোখের জলকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়াটা কম কষ্টের নয়। এর পরেও যেতে হয়। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

ভোর পাঁচটায় শফিক রওনা দিল।

সকাল সাড়ে আটটায় একটা ট্রেন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাবে। ঢাকা থেকেই শফিক ট্রেন ছাড়ার এই সময় সূচি জেনে এসেছে। সকাল সাড়ে আটটার সেই ট্রেন ধরতে হলে এখান থেকে রওনা দিতে হবে ভোর পাঁচটায়। এক ঘণ্টায় পৌঁছাতে হবে পাহাড়ের নীচে টিল্লামছড়ি। সেখান থেকে বাসে আবার দুই-আড়াই ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ট্রেন স্টেশনে।

রকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শফিক ব্যাগ কাঁধে বাংলো থেকে বের হয়ে পড়ল। এখন পর্যন্ত ভোরের ছোঁয়াও লাগেনি প্রকৃতিতে। রাতের রাজত্বই চলছে চারদিকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেই সাথে ঘন কুয়াশা।

আশ্চর্য! সেই ভ্যান চালক ভ্যান নিয়ে বাংলোর সামনে দাঁড়ানো। যে রহস্যময় ভ্যান চালক আসার দিন শফিককে এই বাংলোতে পৌঁছে দিয়েছিল।

ভ্যান চালককে দেখে শফিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সে কিছুটা শঙ্কিত ছিল এই ভেবে–এই ভোর রাতে টিল্লামছড়ি পৌঁছাবার জন্য কোনও যানবাহনই পাওয়া যাবে না, সারা পথ হেঁটেই যেতে হবে।

শফিক ভ্যানের পিছনে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন। আধো ঘুম আধো জাগরণে ভ্যান ছুটে চলছে। ভ্যান চালকের গা থেকে আতরের কড়া গন্ধ আসছে।

শফিকের ঘুম ভাঙল বাসের হর্নের শব্দে। সে পথের পাশে বসে গাছের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। কোথায় ভ্যান চালক? কোথায় ভ্যান? ভ্যান চালক কি আজও তার ভাড়ার টাকা না নিয়ে চলে গিয়েছে? এত কিছু ভাববার সময় নেই শফিকের। বাসের হেলপার বাসের গায়ে থাবড়াতে-থাবড়াতে অবিরাম বলছে, 'এই ডায়রেক্ট চট্টগ্রাম...চট্টগ্রাম...উঠেন... জলদি উঠেন...'

BanglaBook.org

পাঁচ

ঢাকায় উত্তরার ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে শফিকের বেলা তিনটা বাজল।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে শফিক প্রথমে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ভালভাবে গোসল করল। গোসলের পর খাওয়া-দাওয়া করে একটা ঘুম দিল। ঘুম ভাঙল মাগরিবের আযানের শব্দে। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা বানাল। চা খেতে খেতেই মোবাইল ফোনটা অন করে, বন্ধু সাইফুলকে ফোন করল।

'সাইফুল, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আজ দুপুরে ফিরলাম।'

ফোনের ওপাশ থেকে সাইফুলের অবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর, 'তুই কি আমার সাথে ঠাট্টা করছিস? পরশু দিন তোর সাথে কথা হলো, মধ্যে গতকাল থেকে আজ সারা দিনে তোর সাথে কথা হয়নি, এখন তুই বলছিস পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এসেছিস! আমাকে কি গাধা পেয়েছিস?'

'কী বলছিস আবোল-তাবোল! সাত-সাতটা দিন ওখানে কাটিয়ে এলাম আর তুই বলছিস পরশু দিনও তোর সাথে কথা হয়েছে!'

'আমি তোর কথার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝছি না। এক তারিখ রাতে তুই ফোন করে বলেছিস, "কাল সকাল সাড়ে দশটার ট্রেন ধরে চট্টগ্রাম যাচ্ছি।" অর্থাৎ দুই তারিখ তোর রওনা দেবার কথা। একথাও বলেছিস–দুই তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিস। চারদিন ওখানে থেকে ফিরে আসবি। আজ হচ্ছে তিন তারিখ। এখন সন্ধ্যা ছ'টা দশ। তুই বলছিস পার্বত্য চট্টগ্রামে সাত দিন কাটিয়ে এসেছিস! বেশ-টেশা করেছিস নাকি!'

শফিক কিছুটা রাগান্বিত গলায় বলল, 'আজ তিন তারিখ হতে যাবে কোন্ দুঃখে। তোর মাথাটা গেছে। তা যাই হোক, কাল অফিস শেষে তোর বাসায় আসছি। জরুরি কথা আছে। উল্টাপাল্টা বকে তুই আমার মেজাজটাই গরম করে দিয়েছিস।'

আশ্চর্য! সাইফুলের সাথে কথা বলা শেষ করে, শফিক মোবাইল

BanglaBook.org

ফোনের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে দেখল–সত্যিই আজ তিন তারিখ। অথচ শফিকের হিসেবে আজ নয় তারিখ হবার কথা।

পরদিন সকালে শফিক অফিসে ফোন করে তার পি.এ-কে বলল, 'কাল আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছি। আজ অফিসে যাব। গাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

ফোনের ওপাশ থেকে শফিকের পি.এ-র অবাক হওয়া গলার স্বর, 'স্যর, আপনি না সাত তারিখ পর্যন্ত ছুটি নিয়েছেন! আর এরই মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম গিয়ে আবার ফিরেও এসেছেন!'

শফিক বিরক্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি অফিসে যাব না।'

শফিকের মাথার ভিতরে তালগোল পাকিয়ে গেল। হচ্ছেটা কী এসব! তার হিসেব মত আজ দশ তারিখ হবার কথা, কিন্তু আজ চার তারিখ। গতকাল সাইফুল যখন বলেছে, আজ তিন তারিখ, শফিক মনে করেছে–সাইফুল বোধহয় ওর সাথে মজা করছে, গুল মারছে। মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেতে তিন তারিখ দেখে ধারণা করেছে–কোনও কারণে মোবাইল ফোন সেটটা উল্টোপাল্টা তারিখ দেখাচ্ছে। বাস্তবে সবাই ঠিক আছে শফিকই ভুল করছে। কাল তিন তারিখই ছিল। আজ চার তারিখ। শফিক এ রহস্যের কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছে না।

শফিক তার বন্ধু সাইফুলকে ফোন করল। থমথমে গলায় বলল, 'সাইফুল, আমি অফিসে যাইনি। যত জলদি সম্ভব তুই আমার ফ্ল্যাটে চলে আয়। তোর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

বিকেল নাগাদ সাইফুল অফিস থেকে সরাসরি শফিকের ফ্ল্যাটে এল। শফিকের চেহারা বিধ্বস্ত। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুবই চিন্তিত এবং উত্তেজিত।

শফিক চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পথের ট্রেনের টিকিটটা বের করে সাইফুলকে দেখাল।

সাইফুল টিকিটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, টিকিটে তো তিন তারিখ লেখা আছে। কাল যে তুই চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছিস এটা মিথ্যে নয়, এখন তা বুঝতে পারছি। বেড়াতে গিয়ে এক রাত থেকেই চলে এলি এটা

BanglaBook.org

কেমন কথা?'

শফিক গলায় অনেকখানি জোর দিয়ে বলল, 'না, আমি এক রাত থেকে চলে আসিনি। আমি সাত-সাতটা দিন কাটিয়ে এসেছি।'

সাইফুল গলায় বিস্ময় নিয়ে বলল, 'তা কী করে সম্ভব!'

'আমিও তো আজ সারা দিন ধরে ভেবে ভেবে এই রহস্যের কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না।'

শফিক পার্বত্য চট্টগ্রাম যাওয়ার দিন থেকে শুরু করে সাত দিন কাটিয়ে ফেরা পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে, সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলল সাইফুলকে। সব শোনার পর সাইফুলকেও বেশ উত্তেজিত এবং চিন্তিত মনে হলো।

আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে দুই বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিল—আগামীকাল সকালের ট্রেন ধরে তারা দু'জন পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেবে। সেখানে গিয়েই সব রহস্যের জট খুলবে।

ছয়

এবারে 'নীল নির্জন' বাংলোটা দেখে শফিক প্রচণ্ড রকমের একটা ধাক্কা খেল। সেই আগের বাংলোটাই, কিন্তু আগের মত নয়। বাংলোর দেয়ালের রং-পলেস্তারা দেখে মনে হচ্ছে একেবারে নতুন বাংলো। অথচ আগেরবার দেখে মনে হয়েছিল—চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরানো বাংলো। বাংলোর কেয়ারটেকারও আগের বারের সেই রকি নামের ইয়ং ছেলেটা নয়। এবারের কেয়ারটেকার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী এক লোক। লোকটার সাথে দশ-এগারো বছর বয়সী একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে। তাকে দেখে শফিকের পরিচিত-পরিচিত লাগল।

সমস্ত পাহাড়টাই যেন বদলে গেছে। একই পাহাড়, সব কিছুই এক, কিন্তু আগেরবার পাহাড়ের গাছগুলো আরও অনেক প্রাচীন আর বড় ছিল। আবার কিছু কিছু গাছ আগেরবার ছিল এবারে নেই। সব কিছুই কেমন অন্যরকম।

BanglaBook.org

শফিক তার বন্ধু সাইফুলকে নিয়ে ছুটে গেল বাংলোর দক্ষিণ দিকে, যেখানে মুনাদের বাড়িটা। ওটা যেখানে ছিল সেখানে পৌঁছে শফিক স্থবিরের মত মাটিতে বসে পড়ল। কারণ সেখানে বাড়িটা নেই। কোথায় সেই ফুলের বাগান আর কোথায় সেই বাড়ি! ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে ভরা একটা জংলা জায়গা।

শফিক ফ্যাকাসে চেহারায় সাইফুলকে বলল, 'এটা কেমন করে হলো! দু'দিন আগেও যেখানে বাড়িটা ছিল, সে জায়গাটা এখন শূন্য। বাড়িটা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!'

শফিককে পাগলের মত আচরণ করতে দেখে বাংলোর বর্তমান কেয়ারটেকার মধ্য বয়স্ক লোকটা এবং তার সাথে থাকা ছোট্ট ছেলেটা এসে বলল, 'স্যর, আপনারা কী খুঁজছেন?'

শফিক বলল, 'এখানে আসাদ খানের বাড়িটা কোথায়?'

মধ্য বয়স্ক লোকটা বলল, 'স্যর, এখানে আসাদ খান নামে তো কেউ নেই।'

'সত্যি বলছেন আসাদ খান নামে কেউ নেই?'

মধ্য বয়স্ক লোকটা আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল, 'স্যর, মিথ্যে কথা কেন বলব?' লোকটার পাশে থাকা ছোট্ট ছেলেটাকে সামনে এনে বলল, 'তবে স্যর, ওর নাম আসাদ।'

শফিক ছোট্ট ছেলেটার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। খুবই পরিচিত চেহারা। সেই চোখ! সেই ঠোঁট! সেই নাক! সেই পরিচিত মুখের আদল! হায় খোদা! এ-কে?

শফিক কাঁপা গলায় বলল, 'এই ছেলের বংশের নাম কী?'

লোকটা বলল, 'স্যর, ওদের বংশের নাম খান।'

শফিক উত্তেজিত গলায় বলল, 'এই ছেলেটা তো এতিম?'

'জি, স্যর, ওর বাবা-মা দু'জনই মারা গেছে। আমার সাথে থাকে।'

'আপনি ওর গ্রাম সম্পর্কের চাচা। আপনার নাম হাসেম মিয়া? ও ডাকে হাসু চাচা বলে?'

'জি, স্যর।'

'এক রাতে ঝড়ে আপনার ঘরের উপর গাছ ভেঙে পড়ে, আপনার বউ-

BanglaBook.org

ছেলে-মেয়ে সবাই মারা গিয়েছে?'

'জি, স্যর।'

'আপনাদের দেশের বাড়ি চট্টগ্রামের হরিন্দাপুরে?'

'জি, স্যর! কিন্তু, স্যর, আপনি আমাদের সম্পর্কে এত কিছু জানলেন কী করে?'

মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা হলো শফিকের। তার আগেই সাইফুল আর কেয়ারটেকার লোকটা তাকে দু-পাশ থেকে ধরে বাংলোর ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

বাংলোর ভিতরের রুমগুলো আগের বারের মতই। কিন্তু আগের বারের মত অত্যাধুনিক কোনও প্রযুক্তি নেই। যেমন–আগেরবারের মত রিমোটে দরজা খোলার কোনও সিস্টেম নেই। হাতে তালি দিয়ে বেডরুমের বালব জ্বালানো বা নিভানো যায় না। বাথরুমের ফিটিংসও খুব সাধারণ।

সাইফুল শফিককে বলল, 'তুই বোধহয় আগেরবার এই বাংলো পর্যন্ত পৌঁছতেই পারিসনি। পাহাড়ের নীচে টিল্লামছড়ি থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দেবার পর পাহাড়ের অন্ধকার পথে, পথ গুলিয়ে ফেলে সারারাত পথের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। এবং সাত দিনের যে-যে ঘটনা বলেছিস, ভ্যান চালক, কেয়ারটেকার রকি, আসাদ খান, মুনা সবই তুই স্বপ্নে দেখেছিস। সারা রাত গাছের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে সকালে উঠে বাসে চড়ে চট্টগ্রাম গিয়ে ট্রেন ধরে ঢাকা ফিরেছিস।'

শফিক রাগান্বিত চোখে সাইফুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে এবারে আমি কীভাবে বাংলোটা দেখেই চিনে ফেললাম? বাংলোর বর্তমান কেয়ারটেকার লোকটার এবং ছোট্ট ছেলেটার নাম-ধাম কীভাবে গড়গড় করে বলে ফেললাম। এসব কিছু তো আমি জেনেছিলাম আসাদ খানের কাছ থেকে। আসাদ খান কে এখনও তা বুঝতে পারছিস না? আসাদ নামের ছোট্ট ছেলেটাই সেই আসাদ খান।'

সাইফুল বলল, 'তুই যা দেখেছিস, জেনেছিস সবই স্বপ্নে। তোর স্বপ্নের সাথে কীভাবে যেন কিছুটা সত্য মিলে গিয়েছে। এটা হয়, এটা অসম্ভব কিছু নয়। মানুষের মস্তিষ্কের অনেক ক্ষমতা। মস্তিষ্ক মাঝে-মাঝে অজানা বিষয় সম্পর্কেও অনেক তথ্য দিয়ে থাকে। তোর মস্তিষ্কও তোকে ঘুমের মধ্যে

BanglaBook.org

তথ্য দিয়েছে।'

শফিক বলল, 'তুই যে সমাধান দিচ্ছিস তা মোটেই ঠিক নয়। কোনও এক অদ্ভুত কারণে হয়তো আমি প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ করে, পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতে চলে গিয়েছিলাম। বা এমনটাও হতে পারে আমি প্যারালাল কোনও ইউনিভার্সে চলে গিয়েছিলাম। যেখানে আমাদের এই পৃথিবীর চেয়ে সময় পঞ্চাশ বছর এগোনো। সেখানে আজকের এই আসাদ নামের ছোট্ট ছেলেটা আসাদ খান আর তাঁর মেয়ের নাম মুনা। পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতে বা সেই প্যারালাল ইউনিভার্সের সময় প্রবাহের সাথেও বর্তমান পৃথিবীর সময় প্রবাহের অনেক তফাৎ রয়েছে। সেখানে আমার সাত দিন কেটেছে কিন্তু পৃথিবীতে মাত্র একটা রাত পার হয়েছে।'

সাইফুল আর শফিক চট্টগ্রাম থেকে বাসে ঢাকা ফিরে যাচ্ছে। শফিক বাসের জানালার পাশে বসেছে। বাস ছুটে চলছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা শফিকের চোখে-মুখে আছড়ে পড়ছে।

শফিক তার ব্যাগের সাইড পকেট-হাতড়ে পাঁচটা শুকনো ক্যামেলিয়া ফুল বের করল। এই ফুলগুলো তার পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতের প্রেয়সী মুনা তাকে দিয়েছিল। শুকনো মিয়ানো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে শফিকের চোখ ঝাপসা হয়ে এল এই ভেবে—পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতে তার প্রেয়সী প্রতিদিন একটা টকটকে লাল ক্যামেলিয়া ফুল হাতে তার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে।

বাসের ভিতরে গান বাজছে:

'দূরে কোথাও আছি বসে,
হাত দুটো দাও বাড়িয়ে।
বিরহ ছুঁতে চায় মনের দুয়ার
দু-চোখ নির্বাক, আসো না ছুটে...'

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG